হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.

আদাবুল মুআশারাত

[সামাজিক আচার-আচরণ]

অনুবাদ
মুফতি আশেক হাসান কাসেমী

আদাবুল মুআশারাত

[সামাজিক আচার-আচরণ]

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত

হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

মুফতি আশেক হাসান কাসেমী

পরিচালক: মা'হাদুল বুহুছিল ইসলামী বাংলাদেশ।
মীরহাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মাকতাবাতুল হিজায

অর্পণ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও আসাতিযায়ে কেরামের
দীর্ঘ ও সুস্থ নেক হায়াত কামনায়

-মুহাম্মদ আশেক হাসান

লেখকের বাণী

হামদ ও সালাতের পর আরয এ যে, আমি দীর্ঘদিন থেকে মাদরাসায়ে আরাবিয়্যাহ ইমদাদুল ইসলাম মুজাফফরনগর- এ দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত আছি। অত্র মাদরাসায় প্রথম বর্ষে ফারসি কিতাবাদি যেমন নেসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো; তেমনিভাবে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ.- এর অনেক উর্দূ কিতাবও নেসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। থানভী (রহ) এর যে সকল কিতাব নেসাবের আওতায় ছিলো তার কয়েকটি হলো—

تعليم الدين، حيواة المسلمين، حقوق الاسلام، جزاء الاعمال، إغلاط العوام، اداب المعاشرت

যাতে করে প্রতিটি ত্বালেবে ইলমের আক্বিদা-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, আমলের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়। উর্দূ ভাষা তাদের জন্য সহজ হয় এবং লেন-দেন, মুআমালাত ও মুআশারাত এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা আসে। সে সাথে সেগুলো নিজে বোঝে অন্যকে বোঝানোর যোগ্যতা তৈরী হয়। ছোট বাচ্চারা এ কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যেন দ্বীনের দায়ী ও ইসলামের সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

থানভী (রহ) এর এসব গ্রন্থের মাঝে গুরুত্বের সাথে যে কিতাবটি পড়ানো হয় সেটি হলো- أداب المعاشرت (আদাবুল মুআশারাত)।

আদাবুল মুআশারাত কিতাবটি অধ্যয়ন করে যেন লেদ-দেন, মুআমালাত, মুআশারাত ও সামাজিক বিষয়গুলোর বাস্তব প্রশিক্ষণ হয়ে যায় এবং নিজেদের জীবনে এর বাস্তবায়ন হয়ে ওঠে। এ কিতাবটি কয়েক বছর পড়ানোর পর আমি বিস্তারিতভাবে তা লেখার প্রয়োজন বোধ করি। আমার ইচ্ছার কথা হযরতের নিকট উপস্থাপন করলে হযরত অত্যন্ত খুশি হলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার উৎসাহ জন্য প্রদান করলেন।

সে দিনই আমি আমার এ ইচ্ছা ও আকাঙ্খার কথা জামিয়া আরাবিয়া মিফতাহুল উলূম জালালাবাদের সম্মানীত মুফতি ও মুহাদ্দিস মাওলানা নাসির আহমদ সাহেব (দাঃ বা) এর নিকট উপস্থাপন করলাম। তিনিও আমাকে এ ব্যাপারে আরো অনেক সাহস যোগালেন এবং

মেনে চলতে হয় কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা, যাকে বলা হয় মু'আশারাত বা সামাজিক আচার-আচরণ। এ বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের বিশাল এক অংশ বিস্তৃত; কিন্তু ইবাদাত আর মুআমালাতের তুলনায় মুআশারাতের এ বিষয়টাকে মানুষ আজ ইসলামের ঐচ্ছিক বিষয় বলে পেছনে ফেলে রেখেছে। ধার ধারে না ইসলামের বর্ণনা দেয়া এই সুন্দর সামাজিক শৃঙ্খলা ও আদর্শগুলোর।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাদের হাদিস গ্রন্থে মুআশারাত বা সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ এর আওতায় অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। কারণ পরিপূর্ণ ইসলামিক আদর্শে চলার জন্য সামাজিক আচার-আচরণে শিষ্টাচার অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। কারণ যার মাঝে শিষ্টাচার নেই, সে একজন অসহায় ও এতিমের চেয়ে অভাবী। আর যার কাছে আদাব বা শিষ্টাচার রয়েছে এতিম হলেও সে অভাবী নয়। তাইতো কবি যথার্থ বলেছেন-

ليس اليتيم يتيم الوالد* ولكن اليتيم يتيم العلم والأدب

পিতৃহীন ব্যক্তি প্রকৃত এতিম নয়; এতিম সে যে জ্ঞান ও শিষ্টাচারশূণ্য হয়।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা প্রতি একশত বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন যিনি মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্তি থেকে ইসলামের আলো ও সঠিক আদর্শের উপর পরিচালিত করেন। তাই ১৪ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে মানা হয় হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. কে। যিনি তৎকালীন সময়ে ইসলামের সঠিক আদর্শ থেকে সরে যাওয়া মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, অমনোযোগী হৃদয়গুলোকে মনোযোগী করে তুলেছেন। ইসলামের অন্যান্য ফারায়েও ও ওয়াজিবের পাশাপাশি এই মহান মুজাদ্দিদ মানুষের আত্মিক ও সামাজিক সংস্করণের কাজ করেছেন অতুলনীয়। যার পুরোটা জীবনেই রয়েছে বিশুদ্ধ সমাজ গড়ার মেহনতের অভাবনীয় শ্রম। বিশেষ করে মানুষের মু'আমালাত ও মু'শারাত পরিশুদ্ধকরণে তিনি ছিলেন এক মহান নায়ক। যিনি মাহফিল, মজলিস আর বয়ান ও খুতুবাতের পাশাপাশি সমাজ সংস্করণে অনেক গ্রন্থও লিখেছেন, যার কয়েকটি হলো—

১. আদাবুল মু'আশারাত।

২. ইসলাহে ইনক্বিলাব।

৩. হায়াতুল মুসলিমীন।

৪. সিয়ানাতুল মুসলিমীন।

৫. ইসলাহুল মুসলিমীন।

৬. দাওয়াতে হায়াত।

৭. আগলাতুল আওয়াম সহ আরো অনেক গ্রন্থ।

এর মাঝে আদাবুল মু'আশারাত অনেক উপকারী একটি গ্রন্থ যা সকল শ্রেণির মানুষের জন্য একটি পাথেয়। যার অলোকে গড়তে পারবে আলোকিত সমাজ। গড়ে ওঠবে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব। গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সর্বমহলে সাড়াজাগানো স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষাভাষিদের খেদমতে গ্রন্থটি উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমি এর বাংলা অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে নির্ভুল উপস্থাপনের, এপরেও ভুলের দায় এড়াতে পারবো না বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয় তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য গ্রন্থটিকে নাজাতের উসিলা করুন। আমীন!

—মুহাম্মদ আশেক হাসান

২৭ জুলাই ২০১৮ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এবং তার সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবার-পরিজনের উপর।

রোজে আযল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আত্মা, জন্ম-মৃত্যু আর ইহকাল-পরকাল মিলেই মানুষের জীবন। এই জীবনকে সুন্দর ও সফল করাই মানুষের বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই জীবনটাই পরকালীন জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ। পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও সফল করতে হলে ইহকালীন জীবনকে সুন্দর ও সফল করা আবশ্যক। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে ইসলামের দেয়া নিয়ম নীতি। সুন্নাহর বর্ণিত আদর্শ মতে লালন করতে নিজের ছোট্ট পরিসরটাকে। মেনে চলতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু আদব ও শিষ্টাচার।

শ্রেণিভেদে মানুষ বিভিন্নভাবে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন করে। কেউ ইসলামের কতেক ভিত্তিমূল আদর্শকে পালন করে, আবার কেউ একটু বেড়ে কিছু ফারায়েযও আদায় করে, আবার কেউ সে সাথে কিছু সুন্নাহর আদর্শেও নিজের জীবনটা পরিচালনা করে, আরেকটু বেড়ে কতেক সফল মানুষ সে সাথে উত্তম ও মুস্তাহাব বিষয়গুলো পালন করতে স্বচেষ্ট থাকে। বর্ণিত সবগুলোই হলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে, কিন্তু ইবাদাতের পাশাপাশি ইসলামের আরো দুটি পরিসর রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো মুআমালাত বা লেন-দেন। জীবন চলার পথে মানুষের সাথে মানুষের ওঠা বসা একান্ত আবশ্যক। জীবন চলার পথে নিতে হয় একে অপরের সাহায্য, করতে হয় কিছু অর্থের আদান-প্রদান, পরস্পরে করতে হয় লেন-দেন। সেক্ষেত্রে মানুষকে পালন করতে হয় লেন-দেনের ইসলামী নিয়ম-নীতি; কিন্তু ক'জনই বা সে দিকে লক্ষ্য রাখে। কজন'ই পালন করে ইসলামের দেয়া সুশীতল নিয়ম শৃঙ্খলা।

ইবাদাত আর মু'আমালাতের পাশাপাশি তৃতীয় আরেকটি পরিমণ্ডল হলো মুআশারাত বা সামাজিক আচার-আচরণ। মানুষের সাথে মানুষের বসবাস বলেই এর নাম জীবন। ওঠা বসা করতে হয় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে। তাই মানুষ ভেদে মানুষের সাথে

দ্রুত সম্পাদন করার প্ররামর্শ দিলেন। আমি শায়েখদের নির্দেশ ও উৎসাহ পেয়ে সে দিনেই মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে তিন দিনের মাঝেই অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করি। অতঃপর পুনরায় মুআশারাত সংক্রান্ত হাদিস, ফেকহী মাসআলা ও থানভী (রহ) এর মালফুযাত বা বাণীসমূহ প্রত্যেক অধ্যায় অনুযায়ী একত্র করলে তার উপকারীতা আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। আর তা সকলের জন্য উপকৃত হওয়ার সহজসাধ্য উপায় হয়ে যায়। সে জন্য সর্বাগ্রে সালাম সংক্রান্ত বিষয়গুলো দিয়ে শুরু করলাম। তারপর বরকতের জন্য তা হযরত থানভী (রহ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলাম।

আশরাফ আলী থানভী (রহ) দেখে অনেক আনন্দিত হয়ে বললেন, অনেক সুন্দর হয়েছে। তারতীবও অনেক চমৎকার হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং সহজ করে দিন। সে সাথে এ বলে আরো উৎসাহ দিলেন যে, যদি কোনো হাদিস কিংবা ফেকহী মাসআলার তাহকীক জানার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে মাওলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব অথবা যাকে উপযুক্ত মনে করেন তার থেকে সহযোগীতা নিতে পারেন। তারপর থানভী (রহ) দোয়া করে বললেন, আল্লাহ আপনার এ কাজকে কবুল করুন এবং উম্মতের জন্য তাকে উপকারী করুন।

এভাবে অধ্যায়গুলো তারতীব দেয়ার কাজ শেষ হলো, কিন্তু মুআশারাত সংক্রান্ত হাদিস, ফেকহী মাসায়েল ও থানভী (রহ) এর মালফুজাতগুলো ভিন্ন কিতাবে একত্র করার কথা বিবেচনায় রাখলাম। অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করার কাজ সম্পন্ন হলো, তাতে যে ভুল-ত্রুটি আছে, সেগুলো সংশোধন করার জন্য পুরো পাণ্ডুলিপিটি মুফতি নাসিরুদ্দীন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মুফতি নাসিরুদ্দীন সাহেব অনেক সময় দিয়ে তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেন এবং সংশোধন করলেন। সে সাথে সংযোজন-বিয়োজনও করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন। তার দ্বারা উম্মতকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীখ দান করুন।

এ ক্ষেত্রে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, মাওলানা আব্দুর রহিম সাহে দাঃ বাঃ এর। আল্লাহ তায়ালা তাকে অদৃশ্য সাহায্য করুন এবং উত্তম

বিনিময় দান করুন। তিনি গ্রন্থটি প্রকাশনায় আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। পাঠক মহলে গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে উপস্থানে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

আদবুল মুআশারাত গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে যেসব ভাইয়েরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের তরে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উপকারী ইলম দান করুন এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য তাদেরকে কবুল করুন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই বিষয় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, সে ক্ষেত্রে মনে রাখবেন, ওই অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণেই বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

মনে রাখবেন, সংযোজিত ইবারতগুলো আশরাফ আলী থানভী (রহ) এর رحمة المتعلمين নামক কিতাবের ইবারত ব্যতীত। তবে ওই কিতাবটিও পরোক্ষভাবে থানভী (রহ)-এর। যা সে কিতাবে থানভী (রহ) এর অভিমত থেকে বোঝা যায়। আমি কিতাবটি বিন্যস্ত ও টিকা লিখা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ করিনি।

আমার একনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ ও পাঠকের পরামর্শের জন্য সর্বদা মুখাপেক্ষী, আপনারা সর্বদা আপনাদের পরামর্শ দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। কোথায়ও ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুল পরিলক্ষিত হলে অবহিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমার এ ছোট খেদমতকে কবুল করুন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দান করুন।

—আহকর মেহরবান আলী বরুতুবী
শিক্ষক: মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইমদাদুল ইসলাম
হারসুলি, মুজাফফরনগর।

সূচীপত্র

* * *

ভূমিকা

হামদ-সালাতের পর আরয এ যে, সাধারণ মানুষ শুধু আকায়েদ ও ইবাদতকে দ্বীনের অংশ বলে মনে করে। আর উলামায়ে কিরাম মুআমালাত বা লেন-দেনকেও দ্বীনের অংশ বলে মনে করে। আর মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীন আখলাকে বাতেনী বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করাকেও দ্বীনের একটি অংশ বলে মনে করেন; কিন্তু দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম আরেকটি বিষয় রয়েছে, তা হলো আদাবুল মু'আশারাত বা সামাজিক আচার-আচরণ পরিশুদ্ধকরণ।

এ তিন দলের মধ্য হতে সকলেই অথবা অধিকাংশ, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তারা ছাড়া উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনের এ অংশকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে দ্বীন থেকে বাইরে রেখেছেন। ফলে দ্বীনের এ বিষয় তথা আদাবুল মুআশারাত ছাড়া অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কম-বেশি মাহফিল-মজলিসের মাঝে আলোচনা হয় এবং শিক্ষা দেয়া হয়। তবে এ অংশ তথা আদাবুল মুআশারাতের বিষয়টি নিয়ে কখনো মাহফিল-মজলিসে পর্যালোচনা হয় না, এমনকি তার নামও মানুষ মুখে উচ্চারণ করে না।

ফলে তা মানুষের জ্ঞান বা ইলম ও আমল থেকে একেবারে নিঃশেষ হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে। আমি তো মনে করি আমাদের পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা-ভালোবাসা না থাকার বড় কারণ এটাই যে, আমাদের পরস্পরের আচার-আচরণ, মুআমালাত-মুআশারাত ঠিক না থাকা। মোটকথা আমাদের মাঝে সামাজিকতার বড় অভাব। অসামাজিকতার কারণেই মানুষ একে অন্যের কাছ থেকে সংকুচিত হয়ে যায়, একজন অন্যজনের মাধ্যমে কষ্ট পায়। যার কারণে আমাদের পরস্পরের মাঝে মহব্বত, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় না। আর এটা তো কুরআন-হাদীসের আলোকেও নিষিদ্ধ। এমনিভাবে যারা আলেম উলামা ও দ্বীনের ধারক-বাহক তাদের কাছেও তা গর্হিত ও মন্দ। এ সমস্ত গর্হিত মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে চলে যাও, তখন তোমরা চলে যাবে। (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করো না, যদিও তাতে কোনো পুরুষ অবস্থান করুক না কেন। অথবা তা নির্জন কক্ষ হোক না কেন? (সূরা নূর: ২৭)

চিন্তা করে দেখুন কুরআনের এ বিধানের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার আরাম আয়েশের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রেখেছেন। যাতে করে একজন অন্যজনের কারণে সামান্যতমও কষ্ট না পায়। এমনিভাবে রাসূলে আকরাম সা. ইরশাদ করেন: যখন তোমরা একসাথে খাবার খেতে বসবে, তখন সাথীর অনুমতি ছাড়া দুটি খেজুর একসাথে উঠাবে না।

একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন যে, আল্লাহর রাসূল সা. ছোট থেকে ছোট একটি বিষয়ের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রেখেছেন এবং তা থেকে উম্মতকে এ কারণে নিষেধ করেছেন যে, এ কাজটি অন্যের কাছে অভদ্রতার পরিচায়ক এবং দৃষ্টিকটু। রাসূল সা. এ সাধারণ একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যাতে করে একজন আরেকজনের মাধ্যমে নূন্যতম কষ্টও না পায়।

অন্য হাদিসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন: মেহমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে মেজবানের বাড়িতে এত দীর্ঘদিন অবস্থান করবে, যা মেজবানের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই হাদীসে রাসূল সা. এমন এক বিষয়ে নিষেধ করেছেন যা দ্বারা অন্যের অন্তর ব্যথিত হয়।

রাসূল (সা) অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ যখন কয়েকজন একসাথে খাওয়ার জন্য বসবে, তখন একজনের খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও ততক্ষণ পর্যন্ত খাবারের পাত্র হতে ওঠবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সকলেই খাবার শেষ না করে। কেননা হতে পারে এখনো অন্যের খাবারের চাহিদা রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এমন কোনো কাজ করা আমার জন্য বৈধ নয়, যার দ্বারা অন্যজন লজ্জিত হয়।

কিছু মানুষ এমন হয়, যারা মজলিসে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাইতে অথবা কোনো কিছু সুওয়াল করতে লজ্জাবোধ করে। এমনিভাবে যদি তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয়, তাহলে হাজারো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তা না দিতে পারে অথবা এর উপর কোনো আপত্তি করতে লজ্জাবোধ করে। প্রথম অবস্থায় তার মনের আগ্রহ থাকে দেয়ার, আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার মনের আগ্রহ থাকে না দেয়ার, এমন অবস্থায় মজলিসে তাকে কোনো কিছু না দেয়া এবং তার কাছ থেকে কোনো কিছু সুওয়াল না করা। কেননা সে উভয় অবস্থায় সংকুচিত হয়ে যায় এবং লজ্জিত হয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা জাবির রা. রাসূল সা.-এর বাড়িতে এসে তাঁর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ালেন। রাসূল সা. ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে? হযরত জাবির রা. উত্তর দিলেন, আমি। রাসূল সা. হযরত জাবির রা. এ জওয়াব অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেনঃ আমি, আমি, আমি কে? এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, কাউকে কোনো কথা বললে এমনভাবে বলা, যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তার বুঝতে যেন কোনোরূপ অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ, এমনভাবে কথা না বলা যা বুঝতে অন্যের সমস্যা হয়, অথবা সন্দেহের উদ্রেক ঘটে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর নিকটে পৃথিবীতে রাসূল সা.-এর থেকে আর কোনো কিছু অধিক প্রিয় ছিলো না, এতদসত্ত্বেও তারা রাসূল সা.-এর আগমনে দাঁড়িয়ে যেতেন না, এজন্য যে, রাসূল সা. তার আগমনের কারণে অন্যের দাঁড়ানো অপছন্দ করতেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে

যে, যদি কোনো বিশেষ আদব, সম্মান অথবা কোনো খেদমত কারো চাহিদার পরিপন্থী হয় তাহলে তা না করা। যদিও সে এ খিদমত করতে আগ্রহী হোক না কেন? এজন্য যে, অন্যের চাওয়া-পাওয়াকে নিজের চাওয়া-পাওয়া ও আরাম-আয়েশের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

অনেক লোক এমন আছে যারা কোনো বুযুর্গের খিদমতের জন্য পীড়া-পীড়ি শুরু করে দেয়। পরিশেষে দেখা যায়, সেটা আরম-আয়েশ বা খিদমাত তো হই না; বরং উল্টো কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কাজগুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা এবং এ জাতীয় খিদমত থেকে নিজেকে দূরে রাখা চাই।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, এমন দুই ব্যক্তির মাঝে গিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা জায়েয নেই, যারা পরস্পরে কথা-বার্তায় লিপ্ত। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এমন কোনো কাজ করা বৈধ হবে না, যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়, অথবা সে কাজ তার অপছন্দ হয়।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূল সা. হাঁচি দিতেন তখন তিনি মুখ হাত দিয়ে অথবা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতেন এবং আওয়াজ যথাসম্ভব নিচু করার চেষ্ট করতেন। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, রাসূল সা. সাথী-সঙ্গীদের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখতেন। তিনি এতটুকু কাজের প্রতিও খেয়াল রেখেছেন, যাতে করে অস্বভাবিক আওয়াজের কারণে সাথী-সঙ্গীর কষ্ট না হয়।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন: যখন আমরা নবী কারীম সা.-এর নিকট আসতাম, তখন যে যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই বসে যেতাম। অর্থাৎ মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে, অথবা সরিয়ে সরিয়ে মানুষকে কষ্ট দিয়ে সামনে গিয়ে বসার চেষ্টা করতাম না। কেননা এর দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়।

এ হাদীস দ্বারা মজলিসের আদব প্রমাণিত হয়, পাশাপাশি মানুষ যেন আমার দ্বারা নূন্যতম কষ্টও না পায়, সেদিকে গভীরভাবে দৃষ্টি রাখার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে মওকুফ সূত্রে এবং হযরত আনাস রা. থেকে মারফু সূত্রে এবং হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রা. থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তারা সকলেই বর্ণনা করেন: যখন

তোমাদের কেউ অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষার জন্য যায়, তখন সেখানে গিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না, বরং অল্প সময় বসে সেখান থেকে চলে আসবে। এ হাদীসে রাসূল সা. সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রেখেছেন, যাতে করে একে অপরের জন্য কষ্টের কারণ না হয়।

কেননা অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কারো বসে থাকার কারণে, পার্শ্ব পরিবর্তন করতে অথবা পা ছড়িয়ে দিতে, অথবা উপবিষ্ট ব্যক্তির কথাবার্তার কারণে দ্বিগুণ কষ্ট হয়। এক তো তার অসুস্থতার কষ্ট, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির বসে থাকার কষ্ট। তবে যার বসে থাকার কারণে রোগীর কষ্ট হয় না তার ব্যাপার ভিন্ন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. জুমআর দিনে গোসল আবশ্যক হওয়ার একটি কারণ বর্ণনা করেন যে, ইসলামের সূচনালগ্নে অধিকাংশ মানুষ ছিলো দরিদ্র। আর তাদের রুজি রোজগারের একমাত্র মাধ্যম ছিল মজুরি বা শ্রম। ঠিকমতো তাদের খাবারই জুটত না আর কাপড় কোথায় পাবে। কাপড়ের স্বল্পতার কারণে ময়লাযুক্ত কাপড় নিয়ে মসজিদে চলে যেত, তাদের শরীরের ঘাম ও ময়লা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত, যার দ্বারা অন্য ব্যক্তি কষ্ট পেত। এজন্যই জুমআর গোসল ওয়াজিব করা হয়, পরবর্তীতে এ সমস্যা না থাকায় গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারাও এ কথা বুঝা যায় যে, কারো সাধারণ কাজের মাধ্যমেও যেন অন্যজন কষ্ট না পায় এ বিষয়টির প্রতি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

সুনানে নাসাঈতে আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত- বরাতের রজনীতে রাসূল সা. বিছানা থেকে খুব আস্তে আস্তে উঠলেন এ খেয়াল করে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. পাশের বিছানায় ঘুমে রয়েছেন, যাতে করে বিছানা থেকে উঠার আওয়াজে তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। জুতা মুবারক আস্তে পরিধান করলেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা খুললেন এবং সতর্কতার সাথে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

এ হাদীসে রাসূল সা. একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির কিরূপ খেয়াল করেছেন যে, তিনি বিছানা থেকে খুব সতর্কতার সাথে উঠে নিঃশব্দে জুতা পরিধান করলেন, আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে আসলেন, যাতে করে দরজার শব্দে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে অস্থির হয়ে না পড়ে।

সহীহ মুসলিমে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমিসহ আরো কয়েকজন সাহাবী রাসূল সা. এর বাড়িতে মেহমান হয়েছিলাম। আমরা কয়েকদিন যাবৎ সেখানে অবস্থান করছিলাম। এশার নামাযান্তে আমরা ঘুমিয়ে যেতাম। রাসূল সা. নামাযের পর কিছু দেরিতে আসতেন (তিনি যখন আসতেন তখন আমাদের অনেকে ঘুমিয়ে পড়তো, আবার অনেকে জাগ্রতও থাকতো)। যখন তিনি আগমণ করতেন তখন তিনি আমাদেরকে সালাম করতেন, তবে সালাম করার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমন আওয়াজে সালাম করতেন, যাতে জাগ্রত ব্যক্তিরা সালামের আওয়াজ শুনতে পায়, আর ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুম ভেঙে না যায়। এই হাদীস দ্বারাও ঐ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যে বিষয়ের প্রতি প্রথম হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূল সা. থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ফিকহের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে, ফকীহগণ ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিতে বারণ করেছেন, যে ব্যক্তি পানাহার অথবা দরস তাদরীসে ব্যস্ত রয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোনো ব্যস্ত মানুষের অন্তর বিক্ষিপ্ত করা অথবা অন্যমনস্ক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও গর্হিত কাজ।

এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামের ঐক্যমত ফতাওয়া হলো, যে ব্যক্তি মুখের দুর্গন্ধ রোগে আক্রান্ত, তার জন্য মসজিদে না আসা। এজন্য যে, যদি সে মসজিদে আসে তাহলে তার দ্বারা অন্যের কষ্ট হবে। যার দ্বারা স্পষ্ট এ কথা বুঝে আসে যে, মানুষের কষ্ট হয় এমন উপায় উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহ ও প্রমাণাদির মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, শরীয়তের বিধি বিধান নামায, রোযা, ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি মুআমলাত-মুআশারাত ও সুন্দর আচার আচরণের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে করে কারো কোনো কাজ অথবা আচার আচরণ অন্যের জন্য ন্যূনতম অসুবিধা, কষ্ট, মানবিক চাপ, ঘৃণা, সংকোচ, পেরেশানি ও ব্যাকুলতার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। শরীয়তের বিবি–বিধানের প্রবর্তক হযরত রাসূলে আকরাম সা. মুআমালাত-মুআশারাত এর বিষয়গুলো শুধু কথা ও কাজের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং নিজ ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও সেবক যাদের মাঝেই তিনি এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা দেখেছেন সকলকেই সে বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক করেছেন এবং সঠিকভাবে সে কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন, এমনিভাবে তার সঠিক পদ্ধতি কি হবে এবং তা কিভাবে সম্পাদন করতে হবে সেগুলোও হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ, একবার এক সাহাবী কোনো কিছু হাদিয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূল সা.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে রাসূল সা.-এর অনুমতি ছাড়াই তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাসূল সা. তাকে ডেকে আবার ঘরের বাইরে গিয়ে সালাম দিয়ে, অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ করলেন।

আবার বাস্তবতায়ও দেখা গেছে মানুষের সাথে সদাচারণ ও ভালো ব্যবহারে মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, সে নিজে কাউকে কষ্ট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ফেলবে না এবং কারো জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণও হবে না। পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান এবং অনুপম আদর্শের মাপকাঠি হযরত রাসূল সা.। সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে সেই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

অর্থঃ প্রকৃত মুসলমান সেই, যার হাত ও জবান থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে।

যে কাজ ও অবস্থার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়, বাহ্যিকভাবে সেটি আর্থিক সেবা হোক বা দৈহিক সেবা হোক, অথবা তা আদব ও সম্মানের বিষয় হোক এবং জনসাধারণের কাছে সেটা উত্তম চরিত্র বলে বিবেচিত হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সেটি নিকৃষ্ট ও মন্দ চরিত্র, উত্তম চরিত্র নয়। আর তার সে কাজ ও সেবাকে মন্দ ও বেয়াদবি বলা হবে। কেননা আরাম-আয়েশের মূল বিষয় হলো, সুন্দর নম্র ও ভদ্র আচার-আচরণ। আর এটি সেবার উপর অগ্রগণ্য। সুতরাং যার আচার-আচরণ নম্র ও ভদ্র হবে এবং তার কাজ অন্যের আরাম-আয়েশের মাধ্যম হবে, সেই কাজকে খিদমত বলা হবে, আর যার আচার-আচরণ অশুভ ও রূঢ় হবে এবং অন্যের কষ্টের কারণ হবে তা কখনোই খিদমত হতে পারে না।

তার উদাহরণ হলো মগজবিহীন খোসার মতো, যেমনিভাবে মগজবিহীন খোসা কোনো কাজে আসে না, ঠিক তেমনিভাবে অশুভ আচার-আচরণ ও মন্দ চরিত্রের কারণে তার অন্যান্য ভালো কাজগুলোও কাজে আসে না। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্য হতে মু'আমালাত-মু'আশারাতের স্থান যদিও আকায়েদ ও ইবাদাতের পরে, তবে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে মুআমালাত-মুআশারাতের স্থান সেগুলো তথা ইবাদত, আকায়েদের পূর্বে। কেননা আকায়েদ ইবাদাতের ত্রুটির কারণে যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা নিজ পর্যন্ত-ই সীমাবদ্ধ থাকে, আর মু'আমালাত-মু'আশারাত অর্থাৎ সামাজিকতা, আচার-আচরণের মাধ্যমে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা শুধু নিজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তার কারণে অন্যজনও কষ্ট পায়।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অন্যের ক্ষতিসাধন নিজের ক্ষতির তুলনায় আরো মারাত্মক অপরাধ। এ দিক বিবেচনায়, মুআমালাত-মুআশারাতের বিষয়গুলো আকায়েদ ইবাদতের উপর অগ্রগণ্য।

এছাড়াও আরো সুক্ষ্য কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা সামাজিক বিষয়ের আয়াতগুলো আকায়েদ ও ইবাদতের আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করেছেন, কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

অর্থ: আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো তারাই যারা পৃথিবীতে নম্র ও ভদ্রভাবে চলাফেরা করে, আর যখন তাদেরকে সাধারণ মানুষেরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রতিউত্তরে বলে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে মানুষের সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা মূলত মুআমালাত-মুআশারাতের প্রাণ। পাশাপাশি তিনি এই মুআমালাত-মুআশারাত বিষয়ক আয়াতটি আকায়েদ ইবাদত সংক্রান্ত আয়াতের পূর্বে এনেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এমন কিছু সূক্ষ্ম দিক রয়েছে যার কারণে মু'আমালাত-মু'আশারাতের স্থান আকায়েদ ও ইবাদতের পূর্বে, যদিও অন্য জায়গায় আলোচনা করতে গিয়ে আকায়েদ ও ইবাদতকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক তাওহীদ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত অর্থাৎ যেগুলো ফরজ ইবদাত ও আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়, কিছু দিকে বিবেচনায় যদিও সেগুলোর পূর্বে মুআমালাত-মুআশারাতের স্থান, কিন্তু নফল ইবাদতের পূর্বে তার স্থান সর্বদিক থেকে।

এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে কারীম সা.-এর সামনে দু'জন নারীর আলোচনা করা হলো। তাদের একজন অধিক পরিমাণ নামায, রোযা করে, পাশাপাশি নফল ইবাদতেও অগ্রগণ্য। তবে সে সাথী-সঙ্গী ও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। আর দ্বিতীয়জন নামায, রোযা ও নফল ইবাদতসমূহ প্রথম জনের তুলনায় তো কম করে, অর্থাৎ ফরজ ইবাদতগুলো পরিপূর্ণ করে, নফল ইবদাত তুলনামূলকভাবে কম করে। তাবে সাথী-সঙ্গী ও প্রতিবেশীকে কখনো কষ্ট দেয় না, তাদের আরাম আয়েশের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। রাসূল সা. বললেন প্রথম জন জাহান্নামী আর দ্বিতীয়জন জান্নাতি।

মু'আমালাত তথা লেনদেন এবং মু'আশারাত তথা সামাজিকতা। এ দুটি বিষয়ও আলাদা আলাদাভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেরূপভাবে মু'আমালাতের ত্রুটির কারণে অন্যের কষ্ট হয়, ঠিক তেমনিভাবে মু'আশারাতের ত্রুটির কারণেও অন্যের কষ্ট হয়। তবে কিছু দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মু'আশারাতটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তার স্থান মু'আমালাতের পূর্বে।

আর তা এভাবে যে, মুআমালাত বা লেনদেনের বিষয়কে তো সাধারণ ও বিশেষ উভয় শ্রেণির লোক দ্বীনের বিষয় বলে মনে করে থাকে। পক্ষান্তরে মুআশারত তথা সামাজিকতার বিষয়কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক ছাড়া, বিশেষ শ্রেণির লোকেরাও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তবে তার স্থান মুআমালাতের পরে মনে করে। আর এজন্য বাস্তবতায়ও তারা মুআশারাতের ব্যাপারে অনেক উদাসীন। তবে স্মরণ রাখা দরকার যেমনিভাবে ইসলাহে বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা ফরজ ইবাদতের মতো আবশ্যক, ঠিক তেমনিভাব মুআশারাতকেও সংশোধন করা আবশ্যক। আর পাশাপাশি মুআশারাতের স্থান আকায়েদ ও ইবাদতের পূর্বে হওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মু'আশারাতটি মু'আমালাতের উপর অগ্রগণ্য হওয়ার ক্ষেত্রেও সেগুলো কারণ এখানে প্রযোজ্য।

মোটকথা দ্বীনের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে মু'আশারাতের স্থান সবগুলোর উপরে। কিছু বিষয়ের উপর মুআশারাতের স্থান বিশেষ দিক বিবেচনায়, আর কিছু বিষয়ের উপর তার স্থান সর্বাধিক বিবেচনায়। তবে সাধারণ জনগণ এবং বিশিষ্ট লোকদের একটি বড় অংশের কাছে এ বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা ব্যাপক। আবার আরেকটি দল এমন আছে যারা নিজেরা খুব গুরুত্বের সাথে এ বিষয়টির উপর আমল করে। তবে অন্যদেরকে চাই তারা আপন লোক হোক অথবা অপরজন এবং নিজ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ছেলে-মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ করা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে না।

এ কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ মুআমালাত-মুআশারাত সংক্রান্ত এমন কিছু আদব লেখার প্রয়োজন অনুভব করি, যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং যারা আমার সাথে মহব্বত রাখে তাদেরকে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সবসময় মৌখিক সতর্ক করে আসছিলাম, তা করতে গিয়ে অনেক সময় মুখ থেকে কঠোর শব্দও বেরিয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করি। এ বিষয়গুলো যেন তাদের আমলে আসে এজন্য আল্লাহর নিকট দুআ করছি। এ বিষয়গুলোর শিক্ষা ও তালীম বিভিন্ন মজলিস এবং বক্তৃতায়ও দিয়েছি। তারপরে মনে পড়ল যে, লিখিত আকারে একত্রিত থাকলে এর উপকার সর্বদা এবং সবসময়ের জন্য হবে। কেননা আরবিতে প্রবাদ বাক্য রয়েছে-

اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ

অর্থঃ জ্ঞান হলো শিকার আর লেখা হলো পিঞ্জিরার মাঝে আবদ্ধ করা।

এজন্য যে, যখন বিষয়গুলো লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকবে, তখন প্রয়োজনের মুহূর্তে সকলেই তা থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে, আর মজলিসে যেগুলো বলা হয়েছে, সেগুলোর উপকার তো সীমাবদ্ধ। যারা মজলিসে ছিল, তারা তা থেকে উপকৃত হবে, আবার এদের মধ্য হতে অনেকেই অনেক প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ভুলেও যাবে। লেখার এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ ছিল, কিন্তু বিভিন্ন

ব্যস্ততার এবং আল্লাহ তাআলার ইলমে এ কাজের জন্য যে সময় নির্ধারিত ছিল তার শুভাগমন না হওয়ায় কাজটি বিলম্বিত হয়ে যায়।

পরিশেষে আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি লেখার সুযোগ করে দিলেন। প্রতিটি শিক্ষাতে আমি 'আদব' শব্দে চিহ্নিত করেছি এবং তাৎক্ষণিক লিপিবদ্ধ করেছি। যদি এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি ছোট বড় সকলকে পড়ানো যায়, তাহলে দুনিয়াতে জান্নাতের মজা, আরাম-আয়েশ অনুভব করা যাবে। যে অনন্ত স্থায়ী আরাম-আয়েশের ব্যাপারে কবি বলেন-

بہشت انجاکہ ازارا ے نباشد * کسے را باکسے کارے نباشد

অর্থঃ বেহেশত এমন এক অসীম আরাম-আয়েশের স্থান যেখানে কোনো ধরনের কষ্ট নেই। আর একজন অন্যজনের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগও করবে না।

* * *

অধ্যায়-১

সালামের আদবসমূহ

আদব : যখন মজলিসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে, তখন নব আগন্তুক ব্যক্তি এসে সালাম দেবে না। কারণ এতে তাদের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যক হলো সকলের দৃষ্টির বাইরে এসে চুপ চাপ বসে পড়বে। পরবর্তীতে সুযোগ হলে সালাম-মুসাফাহা করবে।

সালামের আরো কিছু আদব

১. এমনভাবে সালাম বিনিময় করবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ, (আসসালামু আলাইকুম) আর সালামের উত্তরে বলবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (ওয়ালাইকুমুস সালাম)।

২. যদি কেউ অপরের পক্ষ থেকে সালাম নিয়ে আগমন করে, তাহলে তার উত্তরে বলবে عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ এটাই উত্তম পদ্ধতি। যদি কেউ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। উত্তর আদায় হয়ে যাবে।

৩. যদি কয়েকজনের মাঝে একজন সালাম দিয়ে দেয় তাহলে সকলের পক্ষ থেকে সালাম আদায় হয়ে যাবে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সালাম দেয়ার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলেই সকলের পক্ষ থেকে সালামের উত্তর আদায় হয়ে যাবে। সকলের পৃথক পৃথক উত্তর দিতে হবে না।

৪. যে আগে সালাম দেবে সে পরে সালাম দানকারীর তুলনায় অনেক গুণ বেশী সাওয়াব লাভ করবে।

সালামের উত্তর দেয়ার পদ্ধতি

৫. যখন আগন্তুক ব্যক্তি সালাম দেবে তখন উত্তরদাতার কর্তব্য হলো, সালামের উত্তর সুন্দর করে মৌখিকভাবে দেবে। মাথা নেড়ে অথবা হাত দ্বারা ইশারা করে সালামের উত্তর দেয়া যথেষ্ট নয়। যদি কেউ কারো ওপর অনুগ্রহ করে, তাহলে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত হলো, প্রতিদানস্বরূপ অনুগ্রহদাতাকে আরো উত্তম অনুগ্রহ করা। অর্থাৎ, যখন কেউ কাউকে সালাম দেবে তখন সে তার জন্য শান্তি ও রহমতের দোয়া করে, আর এটা তার ওপর এক বড় অনুগ্রহ। এখন

উত্তরদাতা সালামের উত্তর আরো বাড়িয়ে সুন্দরভাবে দেবে। যদি সালামদাতা বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ তাহলে উত্তরদাতা বলবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ আর যদি সালামদাতা وَبَرَكَاتُه বাড়িয়ে বলে তাহলে উত্তরদাতা আরো ভালো কিছু বাড়িয়ে উত্তর দেবে।[১]

চিঠিতে লেখা সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব

৬. চিঠিতে যে সালাম দেয়া থাকে তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব, চাই তা পুনরায় চিঠিতে লিখে হোক কিংবা মৌখিকভাবে হোক।[২]

চিঠিতে লেখা সালামের উত্তর দেয়ার নিয়ম

৭. যদি চিঠিতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ লিখা থাকে, তাহলে তার উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ ইমামগণ বলেন যে, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বা اَلسَّلَامُ উভয়ভাবেই দিতে পারবে।[৩]

ছোটদের চিঠিতে সালাম ও দোয়ার পদ্ধতি

৮. আমি ছোটদের চিঠিতে তাদের মনের প্রশান্তির লক্ষ্যে সালামের পর দোয়াও লিখে দিয়ে থাকি। কেননা সালাম দেয়া সুন্নাত তাই সালাম লেখি, আর তাদের মনের প্রশান্তির লক্ষ্যে দোয়াও লিখে দেই। লেখার পদ্ধতি এরূপ 'আসসালামু আলাইকুম' এরপর দোয়াবা'দ তারপর চিঠির বাকি কথাগুলো।[৪]

৯. অনেকে ছোটদের চিঠির সালামের উত্তরে সাধারণত দোয়া লিখে দেয়। আমার মতে এর দ্বারা সালামের উত্তর আদায় হয় না। এজন্য আমি উত্তর এবং দোয়া উভয়টাই লিখি। তবে এক্ষত্রে প্রথমে সালামের উত্তর লিখি। এরপর দোয়া লিখি।[৫]

১০. যদি চিঠির সালাম শিশু নিজে না লিখে; বরং তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ লিখে দেয়, তাহলে ওই সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়।[৬]

---

[১]। মাজালিসুল হিকমাহ: পৃ: ২৩১
[২]। কামালাতে আশরাফিয়া: খ-৪ পৃ-১২
[৩]। আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: পৃ: ১৪৪
[৪]। কামালাতে আশারাফিয়া: খ: ২ পৃ: ১২
[৫]। ইফাযাত: পৃ: ১৪৪
[৬]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: পৃ: ১৪৪

সালামের পরিবর্তে আদব লিখা বা বলা বিদআত

আদবঃ যেখানে সালামের স্থান সেখানে সালাম-ই দিতে হবে এবং সালাম-ই লিখতে হবে। সালামের স্থানে আদব বলা অথবা লেখা বিদআত। কেননা এর দ্বারা শরিয়তের বিকৃতি হয়। তবে হ্যাঁ, সালাম দেয়ার পর আদব লিখে দেয়া অথবা আদব বলাতে কোনো অসুবিধা নেই।[৭]

ব্যস্ততার সময় সালাম না দেয়া চাই

যখন কেউ জরুরি কথাবার্তা বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে তখন সালাম না দিয়ে চুপ করে বসে পড়বে, সালাম দিয়ে অথবা মুসাফাহা করে অন্যের কাজে বিঘ্নতা ঘটাবে না। এটা আদব পরিপন্থ্ ও অপরের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৮]

একজন শিক্ষিত লোক মজলিসে এসে অনেক সময় সালাম না দিয়ে চুপচাপ বসে যেতো। একদিন মজলিসের অন্য এক লোক তাকে ডেকে নিয়ে বললো, এটা অভদ্রতা যে, তুমি মজলিসে এসে সালাম দেয়া ছাড়াই চুপচাপ বসে যাও। উত্তরে আগন্তুক ব্যক্তি বললো, অভদ্র আমি নই; বরং অভদ্র তুমি, কারণ একজন কাজে ব্যস্ত লোককে সালাম দিয়ে তুমি তার কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চাও। এরপর সে আরো বললো, এর তাৎপর্য ফুকাহায়ে কেরামগণই বুঝেছেন। যার কারণে তারা ব্যস্ত মানুষকে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন। দুই পক্ষের যুক্তিই সঠিক এবং উভয় দল-ই তাদের চিন্তা-চেতনায় বিজ্ঞ, একদল সুফিয়ায়ে কেরাম আর অন্যদল ফুকাহায়ে কেরাম।

আদবঃ যে ব্যক্তি তার স্বভাবজাত অথবা ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত, তাকে সালাম দেয়া মাকরূহ। যেমন- খাবারের সময় সালাম দেয়া। তবে কথা-বার্তা বলার অনুমতি রয়েছে।[৯]

মাথা ঝুকিয়ে সালাম জানানো নিষেধ

আদবঃ একটি চিঠির উত্তরে হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, কোনো এক ধনী ব্যক্তির কর্মচারী চিঠির মাধ্যমে আমার কাছে জানতে চাইলো যে, মাথা ঝুকিয়ে মনিবকে সালাম করা যাবে কি? আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, যদি লিখি, বৈধ-তাহলে তা সঠিক হবে না। আর যদি লিখি যে, বৈধ নয়, আর মনিব্ এ কথা জানতে পারে, তাহলে বলবে যে, মৌলভী সাহেব আমার কর্মচারীকে বে-আদব বানিয়েছে। এজন্য আমি প্রশ্ন করে লিখলাম যে, মাথা ঝুকিয়ে সালাম

---

[৭]। কামালাতে আশরাফিয়াঃ পৃঃ ১৪৪
[৮]। কামালাতে আশরাফিয়া) খঃ ৪, পৃঃ ১৫০
[৯]। হুসনুল আজিজঃ খ-১ পৃঃ১০৭

না দিলে তোমার মনিব কি অসন্তুষ্ট হয়? এখন যদি সে লিখে, মাথা ঝুকিয়ে সালাম না করলে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে আমি উত্তরে লিখবো যে, মাথা ঝুকিয়ে সালাম করা বৈধ নয়।[১০]

সালামের শব্দে কোনো পরিবর্তন করবে না

শরীয়ত কাউকে কষ্ট দেয়া ও বিরক্ত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করেছে। এ কারণে কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারে খুব জোর তাগিদ করেছে। অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে কিংবা নির্জন কক্ষে প্রবেশ করবে না, কারণ এতে করে সে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে।

কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে তার নিকট থেকে অনুমতি নেওয়ার পদ্ধতি এ যে, প্রথমে বাহির থেকে সালাম দেবে, সালামের উত্তর পেলে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবে, চাই তা যে কোনো ভাষায় কিংবা মৌখিক বা লিখিতভাবে হোক না কেন? তবে এমন শব্দ হওয়া চাই, যা উদ্দেশ্যিত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যে, আগন্তুক ব্যক্তি তার কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তবে এদিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সালামের শব্দাবলিতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। শরীয়তের পক্ষ থেকে সালামের জন্য যেসব শব্দাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব শব্দের মাধ্যমেই সালাম দিতে হবে।

ইস্তেঞ্জার সময় সালাম বা সালামের উত্তর না দেয়া

প্রশ্ন: ইস্তেঞ্জার সময় কাউকে সালাম দেয়া বা কারো সালামের উত্তর দেয়া বৈধ হবে কি? হাদিস শরিফে এসেছে إذا يبول অর্থাৎ, রাসূল (সা) কে যখন সালাম দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি প্রসাবরত ছিলেন এজন্য তিনি সালামের উত্তর দেননি। তাছাড়া মানুষেরা কেন ইস্তিঞ্জার সময় সালামের উত্তর দেয় না? এটা কি তাদের ভুল ধারণা-নাকি শরীয়তে এর কোনো রহস্য আছে? আবার হাদিসে একথাও আছে যে, ঋতুবর্তীকালীন সময়ে ঋতুবর্তী নারী সালাম দিতে পারবে এবং সালামের উত্তরও দিতে পারবে।

উত্তর: দুররে মুখতার নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যে সকল স্থানে সালাম দেয়া মাকরূহ, সেখানে ইস্তিঞ্জার সময় সালাম দেয়া বা সালামের উত্তর দেয়া মাকরূহ। এ কথা বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঋতুবর্তীকালীন সময়ে ঋতুবর্তী নারীর কথা উল্লেখ করা হয়নি। আর গভীরভাবে চিন্তা করলে হাদিসের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া

---

[১০]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ-২ পৃ: ২৭৩

আর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণও বুঝে আসে না। সুতরাং কোনো কারণ অনুসন্ধানে না পড়ে হাদিসের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা মেনে নিতে হবে।[১১]

অঙ্গীকার করলে সালাম পৌঁছানো ওয়াজিব

যদি কেউ কারো কাছে অঙ্গীকার করে যে, আমি তোমার সালাম অমুকের কাছে পৌঁছাবো, তাহলে তার জন্য সালাম পৌঁছিয়ে দেয়া ওয়াজিব। আর যদি অঙ্গীকার না করে তাহলে সালাম পৌঁছানো ওয়াজিব নয়।[১২]

প্রথমে সালাম করার ফযিলত

সর্বপ্রথমে সালামকারী ব্যক্তি অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে।[১৩]

সালামের স্বর কেমন হবে?

শরীয়তের পক্ষ থেকে সালামের শব্দ তথা- -اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এর মাঝে ছোট-বড়-এর কোনো ভেদাভেদ নেই। ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলেই একই শব্দে সালাম দেবে। তবে হ্যাঁ সালাম বলার সময় স্বরের মাঝে কিছুটা তারতম্য হবে। শরীয়ত আমাদেরকে একথা শিক্ষা দিয়েছে যে, ছোটরা বড়কে সালাম দেয়া উত্তম। আর সম্মানের অংশ এটিও যে, ছোটরা বড়দের সালাম দেয়ার সময় নিচু স্বরে সালাম করবে। এ শিক্ষা শুধু সালামের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সর্বপ্রকার কথা-বার্তার সময়েও তা খেয়াল রাখতে হবে।

১. ছোটরা বড়দেরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ শব্দেই সালাম করবে। তবে হ্যাঁ পার্থক্য শুধু এখানেই যে, ছোটরা বড়কে নিম্নস্বরে সালাম করবে আর বড়রা সেটাকে তুচ্ছ করে দেখবে না।

২. ছেলে পিতাকে এমন স্বরে সালাম দেবে যে, সালামের দ্বারাই বুঝে আসে যে, সালামকারী ও উত্তরদাতার মাঝে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এভাবে সালাম করতে লজ্জার কিছুই নেই।[১৪]

৩. অনেক সময় দেখা যায় যে, শুধু সালামের মাধ্যমেই অপরিচিত দুই মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। অনেকে সালাম এমনভাবে দেয় যে, তার সালামের মাঝে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার বহিপ্রকাশ ঘটে।[১৫]

---

[১১]। ইমদাদুল ফাতওয়া: খ-৪ পৃ: ২৬৪

[১২]। কালিমাতুল হক: পৃ: ১১৫

[১৩]। তালীমুদ্দীন: পৃ: ৮৬

[১৪]। আল ইফাযাত: খ: ৫ পৃ: ৩৮৪

[১৫]। হুসনুল আজিজ: খ: ১ পৃ: ৩৭৪

অধ্যায়-২
মুসাফাহার আদবসমূহ

আদব: কারো সাথে এমন সময় মুসাফাহা করবে না, যখন তার দু'হাত অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে এবং তা থেকে অবসর হওয়া তার জন্য অসুবিধা হয়; বরং সে ক্ষেত্রে সালামের ওপরই ক্ষান্ত করবে। এমনিভাবে ব্যস্ততার সময় বসার জন্য তার অনুমতির অপেক্ষা করবে না; বরং অনুমতি ছাড়াই বসে যাবে।

আদব: যদি কেউ রাস্তা দিয়ে অনেক দ্রুত চলতে থাকে তাহলে তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য তাকে দাঁড় করানো উচিত নয়, এতে করে তার সমস্যা হতে পারে । এমতবস্থায় তার সাথে কথা বলার জন্য তাঁকে দাঁড় করানোও ঠিক নয়।

আদব: অনেকে এমন আছে, যারা মজলিসে উপস্থিত হয়ে সকলের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মুসাফাহা করতে থাকে। হতে পারে মজলিসের সকলে তার পরিচিত নয়। এমনটা করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় এবং তার অপেক্ষায় মজলিসের সকলেই পেরেশানী এবং বিরক্তি বোধ করে। এক্ষেত্রে করণীয় হলো যার সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছে তার সাথে মুসাফাহা করেই ক্ষান্ত হবে। তবে হ্যাঁ, অন্য সকলেই যদি তার পরিচিত হয়, তাহলে অবসর হলে মুসাফাহা করতে পারে।

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ছাড়া মুসাফাহা অনর্থক

১. আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, অনেক মানুষ এমন আছে, যারা মুসাফাহাকে মীমাংসা এবং সংশোধনের মাধ্যম মনে করে। অর্থাৎ, যেখানে দুজনের মাঝে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ হয় সেখানে উভয় পক্ষের পরস্পরে মুসাফাহাকে মীমাংসার অন্যতম মাধ্যম মনে করে। যদিও উভয়ের অন্তরে ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

তবে আমি কখনোই এরূপ করি না; বরং মনে করি সর্বপ্রথম তাদের উভয়ের মু'আমালা পরিশুদ্ধ করা এবং অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ দূর করা, তারপর মুসাফাহা করা। তা না হলে মুসাফাহা অনর্থক। কারণ শুধু মুসাফাহার দ্বারা

মনের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না। বাদী-বিবাদীর অন্তরের ক্রোধ দূর হয় না। ফলে মুসাফাহার পরেও হানাহানি লেগেই থাকে।[১৬]

মুসাফাহা সাক্ষাতে নাকি বিদায়ের সময়?

২. জনৈক ব্যক্তি দু'দিন থেকে খানকায় অবস্থান করছে, কোনো একসময় মজলিসে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই মুসাফাহা শুরু করলো। থানভী রহ. তাকে বললেন, আমি তো তোমাকে দু'দিন যাবৎ খানকায় অবস্থান করতে দেখছি, এখন আবার কেন মুসাফাহা করছো? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ আমি দু'দিন যাবৎ অবস্থান করছি।

থানভী রহ. বললেন, তাহলে মুসাফাহার কারণ কি? তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, আগমনের সময় মুসাফাহা করতে হয়, না-কি যাওয়ার সময়? থানভী রহ. বললেন, আগমনের সময় তো মুসাফাহা করেছো, এখন আবার কোথায় যাচ্ছো? সে বললো এখন তো কোথাও যাচ্ছি না। থানভী রহ. বললেন, তাহলে মুসাফাহা কেন করছো? লোকটি বললো, এখন তো অনেকেই মুসাফাহা করছে সে কারণে আমিও মুসাফাহা করলাম।

থানভী রহ. বললেন, তারা তো এ মাত্র আগমন করেছে, যার কারণে তারা মুসাফাহা করছে, আর তুমি তো দু'দিন থেকেই খানকায় আছো তারপরেও কেন নিজেকে তাদের সাথে অনুমান করছো। অনেকে তো মুসাফাহা করেওনি। এর দ্বারা তোমার নিজের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দরকার ছিলো যে, অনেকে কেন করছে না? যদি নিজে না জানতে তাহলে অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে। আল্লাহ তায়ালা বুঝ-বুদ্ধি ও সঠিক জ্ঞান তাকেই দান করেন যার কাছ থেকে তিনি কাজ নিতে চান।[১৭]

মুসাফাহা খালি হাতে হওয়া চাই

৩. আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, অনেক লোক এমন আছে, যারা মুসাফাহা করার সময় মেহমানের হাতে হাদিয়া হিসেবে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে, এটা একেবারেই অপছন্দনীয় ও মন্দ কাজ। কেননা, মুসাফাহ হলো সুন্নাত, আর সুন্নাত ও ইবাদাতকে এমন কোনো কাজের সাথে মেলোনো জায়েয নেই, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে।[১৮]

---

[১৬]। কামালাতে আশরাফিয়াঃ খঃ ১ পৃঃ ১২৯

[১৭]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ৮ পৃঃ ২৬৮

[১৮]। মাকালাতে হিকমাতঃ পৃঃ ৩৬

মুসাফাহার আশা করবে না

৪. একদা শীতকালে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. মোটা কাপড় পরে বসা ছিলেন, আর তার ডান ও বাম পাশে ছিলো হযরত ইয়াকুব নানুতবী রহ. ও হাকীম জিয়াউদ্দীন রহ.। এক ব্যক্তি তার সাক্ষাতে এসে দু'পাশের ব্যক্তিদের সাথে মুসাফাহা করলো, আর হযরত গাঙ্গুহী রহ. কে সাধারণ মানুষ মনে করে মাঝখানে বসে থাকার পরেও মুসাফাহা করলো না।

এ অবস্থা দেখে ইয়াকুব নানুতুবী রহ. মুচকি হাসতে লাগলেন। গাঙ্গুহী রহ. ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ আকাঙ্খা নেই যে, মানুষ আমার সাথে মুসাফাহা করুক।[১৯]

ফায়েদা: উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেলো যে, কারো কাছ থেকে মুসাফাহার আশা করা উচিত নয়।

মুসাফাহার পর হাতে চুমু না খাওয়া

৫. থানভী রহ. বলেন, মুসাফাহার পর হাতে চুমু খাওয়ার রীতি পরিত্যজ্য ও বর্জনীয়। কারণ সুন্নত হলো শুধু মুসাফাহা করা। হাতে চুমু খাওয়া যদিও জায়েয; কিন্তু তা তো সুন্নত নয়। হাতে চুমু খাওয়া ভালোবাসা ও হৃদ্যতার উপর নির্ভর করে। যদি হৃদ্যতা ও ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই।

এটা স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত বিষয়, কখনো হৃদ্যতা পরিপূর্ণ থাকে আবার কখনো তা পরিপূর্ণ থাকে না। যদি হৃদ্যতা পরিপূর্ণভাবে না থাকার পরেও হাতে চুমু খায় তাহলে সেটা হবে লৌকিকতা। আর বড়দের জন্য লৌকিকতা অন্তত মন্দ ও গর্হিত কাজ। মুসাফাহার পরে হাতে চুমু খাওয়ার একটি সুক্ষ্ম তথ্য এ যে, যাদের স্বভাবে সুন্নতের ভালোবাসা বেশি এবং বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর তারা এ কাজকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন। আমার স্বভাব এ যে, আমি যখন বুযুর্গদের হাতে চুমু খাই, তখন দেখা যায়, অনেক সময় হৃদ্যতা ও ভালোবাসা প্রবল থাকে আবার অনেক সময় তা কমে যায়।

তবে অধিকাংশ সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, দর্শনকারীরা যাতে একথা বুঝে না নেয় যে, বড়দের সাথে আমার আস্থা-হৃদ্যতা ভালো নয়। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া! বুযুর্গদের সাথে আমার আস্থা ও ভালোবাসা তো পরিপূর্ণ, তবে আগ্রহ কখনো কম থাকে আবার কখনো বেশি।[২০]

---

[১৯]। মালফুযাত: পৃ: ৮৭
[২০]। কামালাতে আশরাফিয়া: পৃ: ১২৩

রাসূল সা. এর সাথে অবস্থানকালে আবু বকর রা.-এর সাথে মদ্বীনাবাসীর মুসাফাহা

৬. থানভী রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. কি পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছলেন। হিজরতের সময় হয়রত আবু বকর রা. রাসূল সা. এর সাথে মদ্বীনায় পৌঁছলেন, তখন আনসার সাহাবীগণ অধির আগ্রহে রাসূল সা. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য দলে দলে আগমন করতে লাগলো। যেহেতু আবু বকর রা. বয়সে রাসূল এর চেয়ে সামান্য বড় ছিলেন, তাই তারা সকলেই হযরত আবু বকর রা. কে রাসূল মনে করে তার সাথে মুসাফাহা করতে আরম্ভ করলেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. পূর্ণ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানালেন না; বরং একে একে সকলের সাথে মুসাফাহা করে শেষ করলেন।

যেহেতু রাসূল সা. সফরের কারণে ক্লান্ত ছিলেন, তাই আবু বকর রা. মুসাফাহা করে রাসূল সা. কে কষ্টের হাত থেকে বাঁচালেন। যদি আজ কাল কোনো খাদেম তার শায়েখের সামনে এরূপ করে তাহলে তাকে বড় বে-আদব মনে করা হবে, আর সে হবে লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনার পাত্র।

এখন আমরা বাহ্যিক ইজ্জত-সম্মানকেই খেদমত মনে করি। আসলে প্রকৃত খেদমত সেটা নয়; বরং অন্যকে আরাম ও শান্তি দেয়া-ই হলো প্রকৃত খেদমত, যদিও তাতে নিজের কষ্ট হয়। প্রকৃত ভালোবাসার অর্থ তো এটাই। আমরা তো খেদমত জানি না, প্রকৃত খেদমত সাহাবায়ে কেরাম-ই করে দেখিয়েছেন।[২১]

দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে হযরত থানভী রহ.-এর সাথে মুসাফাহার ঘটনা

৭. থানভী রহ, বলেন, একবার আমি দারুল উলূম দেওবন্দের কোনো এক মজলিসে নামাজের অপেক্ষায় মুসল্লায় বসা ছিলাম, সামনের তৃতীয় কাতার থেকে এক ব্যক্তি এসে আমার সাথে মুসাফাহা করে হাত শক্ত করে ধরে সামনের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। সাধারণ মানুষ সম্মান ও খেদমত মনে করে এরূপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো খেদমত নয়; প্রচলিত রীতি-নীতি মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধির শূণ্য কোঠায় নিয়ে গেছে।[২২]

---

[২১] । হুসনুল আজিজঃ খঃ ১ পৃঃ ১৫

[২২] । হুসনুল আজিজঃ থ-১ পৃঃ ১৪৩

মজলিসের সবার সাথে পৃথক মুসাফাহার প্রয়োজন নেই

৮. এক আগন্তুক ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে থানভী রহ. এর সাথে মুসাফাহা করার পর মজলিসের সকলের সাথে পৃথক পৃথক মুসাফাহা আরম্ভ করে দিলো। থানভী রহ. তাকে বললেন, কে তোমাকে এ পদ্ধতি শিখিয়েছে? যদি মজলিসে ৫০ জন মানুষ থাকে তাহলে সকলের ব্যক্তিগত কাজ ছেড়ে দিয়ে সকলেই তোমার সাথে মুসাফাহা করতে হবে?

আর যদি তাই করতে হয় তাহলে সকলকে পৃথক পৃথকভাবে সালাম দিলে না কেন? এক্ষেত্রে আদব হলো একজনের সাথে মুসাফাহা করার দ্বারাই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। ইসলামের সামাজিকতা মানুষদের মাঝ থেকে এখন প্রায় বিদায় নিতে চলছে।[২৩]

বড়দের সাথে উদাসীন হয়ে মুসাফাহ করবে না

৯. জনৈক ব্যক্তি এসে হযরতের সাথে মুসাফাহা করলো, তবে সে মুসাফাহার সময় এমন কিছু কাজ করলো যাতে আদব-আখলাকের প্রতি মোটেও খেয়াল রাখেনি। হযরত মুসাফাহা শেষ করে তাকে বললেন, মানুষদের থেকে এখন আদব-আখলাক বিদায় নিতে চলছে, আদবের কারণে দুনিয়াবী কাজ-কর্মও ইবাদতে পরিণত হয়। আর বে-আদবীর কারণে ইবাদতও অনর্থক কাজে পরিণত হয়। শুধু মানুষের আকৃতি বাকি রয়ে গেছে; কিন্তু তাদের মাঝে আজ মনুষ্যত্ব নেই।[২৪]

মুসাফাহকৃত ব্যক্তির আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে

১০. এক ব্যক্তি আসরের নামাযের পর থানভী রহ. জায়নামাযে বসা থাকতেই তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য আসলেন, হযরত একটু বিরক্তির স্বরে বললেন, তোমাদের কি হলো জায়নামায থেকে ওঠতে না ওঠতেই মুসাফাহার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে? তোমরা তাড়াহুড়া করছো কেন? আমার কি কোনো আরাম-আয়েশের প্রয়োজন নেই। লোকটি তার ভুল বুঝতে পেরে বললো, হযরত ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দেবেন। হযরত বললেন, যখন ভুল বুঝতে পারলে তখন আবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, এখান থেকে চলে যাও।[২৫]

---

[২৩]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহঃ খঃ ৩ পৃঃ ২৩
[২৪]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ৩ পৃঃ ৩৫১
[২৫]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ৬ পৃঃ ১৭৮

১১. একদিন জুমার নামাজের পর থানভী রহ. নিজে কামরায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মানুষেরা এসে মুসাফাহা আরম্ভ করলো। মানুষের ভিড় দেখে থানভী রহ. বললেন, তাড়াহুড়া না করে যে যেখানে আছো সে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাও। আর যারা আমার নিকটে আছো তারা মুসাফাহা করে চলে যাও। আজ যত সময় লাগুক না কেন সকলের সাথে মুসাফাহা করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের সাথে মুসাফাহা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কামরায় ফিরছি না। কিন্তু কেউ হযরতের কথা শুনলো না। একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত অত্যন্ত কষ্ট পেলেন এবং মুসাফাহা বাদ দিয়ে কামরায় চলে গেলেন। আর বললেন, এটা কেমন স্বভাব! এদের মাঝে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই।

আমি তো বললাম, সকলের সাথে আমি মুসাফাহা করবো, তারপরেও তারা আমার কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো না। আবার বদনাম করে যে, হুজুরের মেজাজ অনেক রূঢ়। তাদের এমন কষ্টকর কথার চেয়ে নিজেই মরা যাওয়া ভালো। আমি তো তোমাদেরকে এ কথাও বললাম, যত সময় লাগুক না কেন, আমি সকলের সাথে মুসাফাহা করবো। তারপরও তোমারা হুড়াহুড়ি করো না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এদের থেকে আশ্রয় পার্থনা করছি, এরাতো কারো আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য করে না, মনে যখন যা চায় তা-ই করে। তারাতো এমন হুড়াহুড়ি শুরু করেছিলো যে, সাধারণ মানুষের দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছিলো। আমিও ভয় পাচ্ছিলাম যে, তাদের হুড়াহুড়ির মাঝে আমি পড়ে যাই কি-না? এ আশঙ্কায় আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না।

এটা কোন ধরনের স্বভাব। যে কোনো বিদআতই কষ্টদায়ক, ঠিক এমনিভাবে নামাযের পর মুসাফাহা করা বিদআত। পক্ষান্তরে সুন্নত যত ছোটই হোক না কেন তাতে রয়েছ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সফলতা। যারা বলে হুজুরের মেজায অনেক রূঢ় এবং আমাকে তারা নরম হওয়ার পরামর্শ দেয়, তাদেরকে এখন এ দৃশ্য দেখানো উচিত।

তাছাড়া স্বভাবগতভাবেই আমি এমন হুড়াহুড়ি ও স্বর-হাঙ্গামকে পছন্দ করি না, আর যারা এরূপ করে তাদেরকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এসব কাজে অভদ্রতা রয়েছে। সকলের জন্য এসব কাজ থেকে সরে আসা একান্ত কর্তব্য, পাশাপাশি একথার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমার দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয় এবং আমি যেন অন্যের কষ্টের কারণ না হই। জনাব, তারাতো এমন তাড়াহুড়া শুরু করেছিলো ওই অবস্থায় মানুষ তো দূরের কথা শক্তিশালী কোনো প্রাণীও দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না।

সকলেই যদি নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতো, তাহলে আমি গিয়ে সকলের সাথে সুন্দরভাবে মুসাফাহা করতে পারতাম। যে সময় সুন্দর মতো দাঁড়িয়ে থাকার দরকার ছিলো, সে সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি এখন অসময় ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগও ছিলো; কিন্তু তারা অযথা মুসাফাহা করার জন্য এমন হুড়াহুড়ি করছিলো, যেন পেছন থেকে কোনো শত্রু পক্ষের আক্রমণ আসছিলো। যেখানে শাসকগোষ্ঠী আছে সেখানে এরূপ হতে পারে। কোনো দ্বীনি মজলিসে তো এরূপ হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, পাঞ্জাবের পীরদের সামনে এমন করা যেতে পারে। কেননা তারা মানুষের এমন হুড়াহুড়িকে দেখে আনন্দিত হয়। তবে আমি ভিন্ন ধরনের, আমি এসব মোটেও পছন্দ করি না।

আমি আমাদের বড় বড় বুযুর্গদেরকে এমন দেখেছি যে, তারা চলাফেরা এবং অবস্থান এমনভাবে করতেন যে, মনে হয় তারা কিছুই নয়। হযরত বলেন, একদিন আমি এক মজলিসে বসা ছিলাম, এক গ্রাম্য লোক মুসাফাহার উদ্দেশ্যে মানুষের ঘাড় টপকিয়ে আমার নিকট আসতে লাগলো, হযরত তার অবস্থা দেখে বুঝে গেলেন তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! তোমার কোনো কিছু বলার থাকলে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে বলো। মানুষকে কষ্ট দিয়ে তুমি কেন আমার কাছে আসছো?

উত্তরে লোকটি বললো, হযরত আমি আপনার সাথে মুসাফাহা করার জন্য আসছি। হযরত বললেন আমি তো সে আলোচনাই করছি, মুসাফাহা কি ফরজ না ওয়াজিব। যার কারণে তুমি এতগুলো মানুষকে কষ্ট দিয়ে আমার সাথে মুসাফাহা করতে আসছো? এটা একটা মুস্তাহাব কাজ, আর মানুষকে কষ্ট দেয়া হারাম। এ কথাগুলোর প্রতি মানুষ একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করে না। মনে করে বড়দের সাথে মুসাফাহা করলেই সফলতা।

সকলের জন্য এ কথা জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কেননা কষ্ট দেয়া হারাম। এখন তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আদব-আখলাক ও জায়েয-নাজেয়েযের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।[২৬]

মুসাফাহার আদবসমূহ

১২. একদিন তিনটার সময় খানকা থেকে কিছু লোক বিদায় নেবে, তাই তারা বিদায়ের পূর্বে হযরতের সাথে মুসাফাহা করলো। মুসাফাহা শেষে হযরত বললেন, কিছু লোক এমন আছে যারা বেশি আদব দেখাতে গিয়ে মুসাফাহার

---

[২৬]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ: ১ পৃ: ২৯৮

জন্য অযু করে নেয়। অযু করার কারণে কারো কারো হাততো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর তাদের সাথে মুসাফাহা করতে গিয়ে আমার হাতও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

কেননা তারা এইমাত্র যোহরের নামায আদায় করলো, এত তাড়াতাড়ি কীভাবে তাদের অযু ভেঙ্গে গেলো। শুধু মুসাফাহার আদব দেখাতে গিয়েই তারা অযু করেছে। এটা তো কোনো আদব নয়, এর ছেয়ে বড় আদব হলো, সর্বদা একথার প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, আমার দ্বারা যেন অন্যের কষ্ট না হয়। [২৭]

মুসাফাহার কতিপয় পদ্ধতি

১৩. থানভী রহ. বলেন, জুমার দিনে অনেক লোক নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির থেকে আগমন করে। নামাযের পর তারা সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার জন্য আমার কাছে আসে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় মানুষের সাথে মুসাফাহা করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। আর তারাও কোনো নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির প্রতি খেয়াল করে না। তাই আমি জুমার দিনে সকলের সাথে মুসাফাহার জন্য একটা সুবিন্যস্ত পদ্ধতির চিন্তা করলাম। কেননা জুমার পর এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করতে আর ধৈর্য সয় না। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নামায শেষ করে অযু খানার হাউজের কাছে গিয়ে বসবো এবং যতক্ষণ লাগে বসে বসে আমি সকলের সাথে মুসাফাহা করবো।

বসার জন্য জায়গাও ঠিক করা হলো। নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আমি বসে থাকতেই দুই ব্যক্তি আসলো, আমার সাথে মুসাফাহা করে হাত ধরেই কথা বলতে বলতে আমাকে নিয়ে গেলো। আমাকে নিয়ে একটি গাড়িতে বসালো, সেখানে এক বিচারক ছিলো, সে বলতে লাগলো তোমরা কেন এই মৌলভীকে গ্রেফতার করেছ? সে আবার কি অপরাধ করলো? সে তো খুবই দুর্বল, তাকে দুজন ধরে গাড়িতে ওঠানো হচ্ছে। তার কথায় আমার হাসি হাসলো। তার কথা তো এমন হলো, যেমন বর্তমান বুদ্ধিজীবিরা কুরআন-হাদিস দ্বারা আজে বাজে প্রমাণ পেশ করে। [২৮]

১৪. একদা এক লোক এসে হযরতের সাথে মুসাফাহা করে কোনো কথা-বার্তা না বলেই চলে গেলো। তার এ অবস্থা দেখে হযরত বললেন, মানুষেরা যাদেরকে বুযুর্গ মনে করে, তারা তাদেরকে জ্ঞানহীন মূর্তির মতো সম্মান করে। এটা কি

---

[২৭]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ২ পৃঃ ২২
[২৮]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ২ পৃঃ ৬২

ধরনের আচরণ যে কোনো কথা-বার্তা না বলেই শুধু মুসাফাহা করে চলে গেলো। যেন কোনো মূর্তি এবং পাগল বসে আছে। তার সাথে কথা-বার্তা বলে কোনো লাভ নেই। নতুন মানুষেরা যখন মুসাফাহা করতে আসে, তখন স্বভাবতই নিজের কাছে প্রশ্ন জাগে, কে এই লোক? কোথায় থেকে কি উদ্দেশ্যে আসলো? আর যদি কথা-বার্তা না বলে চুপচাপ চলে যায়, তখন তার উদ্দেশ্য বুঝে না আসার কারণে সে নিজেও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। যদি তাকে কিছু বলি, তাহলে সে তা শ্রবণ করে আর কিছু না বললে চুপচাপ থাকে।[২৯]

মুসাফাহার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না

১৫. জনৈক ব্যক্তি মজলিসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। বসছেনও না আবার কোনো কর্থাবার্তাও বললেন না। হযরত তাকে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার তুমি বসছোও না, আবার কোনো কথা-বার্তাও বলছো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন। তার কারণ কি? তোমার এ অবস্থা আমার কাছে অনেক খারাপ লাগছে। উত্তরে আগন্তুক বললো, হযরত আমি আপনার সাথে মুসাফাহা করার জন্য এসেছি। হযরত তাকে বললেন, তুমি যদি আমাকে না বল, তাহলে আমি কিভাবে জানবো? তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ। উত্তরে সে বললো, আমি এ কারণেই দাঁড়িয়ে আছি যে, আপনার সাথে মুসাফাহা করবো। হযরত তাকে বললেন, তুমি তো আমার কোনো কথাই বোঝ না। সোজা কথাগুলোকে কেন তুমি পেঁচিয়ে বলছো? আমার কথা ভালোভাবে বুঝবে তারপর উত্তর দেবে। আমার প্রশ্ন ছিলো তুমি মুখে বলা ছাড়া আমি কিভাবে বুঝবো যে, তুমি কোন উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আছো? সে বললো, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে। হযরত তাকে বললেন, এটা তোমার কথার উত্তর হলো না। দ্বিতীয়বার ভুল করে তুমি আমাকে আরো পেরেশান করে তুললে। সে বললো, হযরত আমিও তো পেরেশান হয়ে গেছি।[৩০]

মুসাফাহা সালামের পরিপূরক

১৬. রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

اِنَّ مِنْ تَمَامِ تَحِيَّاتِكُمْ اَلْمُصَافَحَةُ

অর্থ: নিশ্চয় তোমাদের সালামের পরিপূরক হলো মুসাফাহা। সালামের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। আর মুসাফাহা হলো সালামের অনুগামী। তাই অবশ্যই

---

[২৯]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ: ৫, পৃ: ৩৭৯
[৩০]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ: ২ পৃ: ৭১

মুসাফাহারও কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। যেমন কিছু কিছু সময় সালাম দেয়া নিষেধ, যথা- খাবারের সময়, আযানের সময়। মোটকথা যখন অন্য কোনো কাজে কিংবা ইবাদাতে ব্যস্ত থাকবে তখন সালাম দেয়া নিষেধ। এর দ্বারা বুঝে আসে ব্যস্ততার সময় মুসাফাহা করাও নিষেধ।

১৭. একদিন মাগরিবের নামাযের শেষে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, রাত একটার সময় রেলযোগে 'মেউ' নামক স্থানে সকলেই রওয়ানা হবে। হযরত পথিমধ্যে কোনো স্টেশনে অবতরণ করে ফতেহপুরের তালনারজা নামক স্থানে যাবেন, আর খাদিমরা সরাসরি 'মেউ' শহরে চলে যাবে। এ কারণে একটার রেল ধরার জন্য আমরা সবাই হযরতের সাথে রওয়ানা হলাম।

বিদায় জানানোর জন্য অনেক লোকজন উপস্থিত হলেন। সকলেই হযরতের সাথে মুসাফাহা করলো। অতঃপর যখন স্টেশনে পৌঁছলেন তখন মুসাফাহার জন্য দ্বিতীয়বার আবারো লোকজন তাড়াহুড়ো শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে হযরত একটু উচ্চস্বরে বললেন, এ মিয়ারা! একটি ঘটনা শোনো। সাথে সাথে একটি মাসআলাও জেনে নাও।

থানাভবনের কিছু ছেলের ঘটনা। এক সময় থানাভবনের কিছু ছেলে একটা কমিটি গঠন করলো এবং তারা সবাই মিলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, শহর পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের হাতে নিতে হবে। এরপর আমরা সকলেই মিলে শহর পরিচালনা করবো। সকলে মিলে শহরের ক্ষমতা নিজেরা দখল করলো এবং প্রত্যেকেই নিজেরা নিজেদের মাঝে বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করে নিলো। ওই শহরে সরকারের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ছিলো। সবাই পরামর্শক্রমে ওই কর্মকর্তার জন্য এক দুষ্ট ছেলে নিযুক্ত করলো। যাতে করে সে কৌশলে ওই কর্মকর্তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। ওই ছেলে তাকে বেশি শ্রদ্ধা ভক্তি করে। যাতে সালাম করতে করতে এক পর্যায়ে শহরের বাইরে নিয়ে গেলো এবং শহরে প্রবেশের ব্যাপারে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলো। হযরত থানভী রহ. এ ঘটনা শুনিয়ে মুচকি হেসে বললেন, তোমরা আমাকে বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়ে শহর থেকে বের করে দিতে চাও নাকি? মুসাফাহা করে বেশি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়ে বের করে দিতে হবে না, আমি নিজেই শহর থেকে বের হয়ে যাবো। আর মাসআলাটি হলো এই যে, হাদিসের মাঝে বর্ণিত হয়েছে-

اِنَّ مِنْ تَمَامِ تَحِيَّاتِكُمْ اَلْمُصَافَحَةُ

অর্থাৎ, মুসাফাহা সালামের পরিপূরক। আর শরীয়তে সালামের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে, সুতরাং মুসাফাহা যেহেতু সালামের পরিপূরক সেহেতু মুসাফাহারও কিছু

নিয়ম-নীতি রয়েছে। মোটকথা যেহেতু ব্যস্ততার সময় কাউকে সালাম দিয়ে কষ্ট দেয়া নিষেধ, তেমনিভাবে ব্যস্ততার সময় কাউকে মুসাফাহা করে কষ্ট দেয়াও নিষেধ। আর মুসাফাহার ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয় যে, তা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩১]

আঙ্গুলে মহব্বতের রগ রয়েছে, এটি জাল হাদিস

হযরত থানভী রহ. বলেন, অনেকে বলে থাকেন যে, মুসাফাহা করার সময় আঙ্গুল চাপ দিয়ে মুসাফাহা করা ভালো, কেননা আঙ্গুলে মহব্বতের রগ রয়েছে। এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আবার অনেকে এ সম্পর্কিত একটি হাদিসও বলে থাকে; এ হাদীসটিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।[৩২]

ꕥ ꕥꕥ ꕥ

[৩১]। হুসনুল আজিজঃ খ-৪, পৃ-২১৬
[৩২]। হুসনুল আজিজঃ খ-৪ পৃঃ ২৩৬

অধ্যায়-৩

মজলিসের আদবসমূহ

আদবঃ যদি কারো অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমন কোনো জায়গায় বসে অপেক্ষা করবে না যে, সে দেখলেই বুঝতে পারে তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছো। কেননা এর দ্বারা অযথা তার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং তার কাজে একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটবে। এজন্য তার নজর থেকে আড়াল হয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে বসবে।

আদবঃ যখন তুমি কারো কাছে যাবে, তখন তাকে সালাম দ্বারা অথবা কথা-বার্তার মাধ্যমে অথবা তার সম্মুখে বসে এ কথা জানিয়ে দিবে যে, তুমি মজলিসে উপস্থিত। কোনো প্রকার কথা-বার্তা ছাড়া চুপচাপ এমন স্থানে বসবে না যে, তোমার আগমনে সে অবগত নয়। কেননা হতে পারে সে এমন কোনো কথা বলতে চায়, যে ব্যাপারে তুমি অবহিত না হও। তোমার আগমন জানা না থাকার কারণে সে কথাগুলো বললো, আর তুমি তার সন্তুষ্টি ছাড়াই তা শুনে ফেললে।

কারো সন্তুষ্টি ছাড়া তার গোপন বিষয়ে অবগত হওয়া অন্যায় কাজ। এক্ষেত্রে করণীয় হলো, যে কোনো পন্থায় হোক তাকে তোমার উপস্থিতির কথা জানানো। অথবা সেখান থেকে এমনভাবে চুপচাপ সরে যাওয়া, যাতে সে তোমার উপস্থিতির কথা টের না পায়। যদি কেউ তোমাকে ঘুমন্ত মনে করে কথা বলে, তাহলে সাথে সাথে তুমি তোমার জাগ্রত হওয়ার কথা তাকে জানিয়ে দাও। তবে, হ্যাঁ যদি তোমার বিরুদ্ধে অথবা কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে কোনো উপায়ে তা শ্রবণ করা বৈধ, এতে কোনো সমস্যা নেই।

আদবঃ যদি কারো কাছে বসার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে তার গা ঘেঁষে বসবে না যে, তোমার বসার কারণে সে বিরক্তিবোধ করে। আবার এত দূরেও বসবে না যে, তোমার সাথে কথা-বার্তা বলতে বা শুনতে কষ্ট হয়।

ব্যস্ত কোনো লোকের নিকট বসে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। এতে তার কাজের একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে। অনেক সময় তা ওই ব্যক্তির জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য উচিত হলো তার দিকে মুখ করে না বসা।

আদব: অযথা কারো পেছনে এসে বসো না, কারণ এতে তার একাগ্রতা বিঘ্ন হবে। ওঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় কাউকে অতিরিক্ত সম্মান দেখাবে না। কারণ অধিকাংশ লোকদের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, যখন সম্মান দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন আর সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান না দেখানোই ভালো। তাতে যথাস্থানে সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হয়।

আদব: কেউ কোনো অজিফা অধ্যয়নরত অবস্থায় থাকলে, তার নিকটে বসে তার জন্য অপেক্ষা করবে না। কারণ এতে তার পাঠের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে এবং অজিফা আদায়ে বাধাগ্রস্থ হবে। তবে হ্যাঁ, যদি সে অন্যের স্থানে বসে অধ্যয়ন করে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

আদব: একজন তালেবে ইলম বাজারে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার জন্য আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। আমি প্রয়োজনীয় কোনো কথ-াবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম। সে আমার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। পাশে এসে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছিলো এবং আমার স্বভাব তার দাঁড়ানোকে অপছন্দ করছিলো। তাই আমি তাকে বুঝালাম দেখ, কোনো ব্যস্ত লোকের কাছে এসে এরূপ দাঁড়িয়ে থাকা অনেক দৃষ্টিকটু। তাই যখন কারো কাছে কোনো কাজ নিয়ে এসে তাকে ব্যস্ত দেখবে, তখন বসে যাবে। এরপর যখন সে অবসর হবে তখন তুমি তাকে তোমার প্রয়োজনের কথা অবহিত করবে।

আদব: অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত, কোনো ব্যস্ত লোকের কাছে এসে কেউ অপ্রয়োজনে বসে থাকলে তার একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে তার নিকটে বসে যখন তার কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

আদব: যদি কারো নিকট সাক্ষাতের জন্য যাও, তাহলে তার কাছে এত দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকবে না অথবা তার সাথে কথা-বার্তা এত দীর্ঘায়িত করবে না যে, সে বিরক্ত হয়, অথবা তার কাজে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

আদব: যেখানে লোকজন বসে আছে, সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক পরিস্কার করবে না, যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখান থেকে ওঠে একপাশে গিয়ে নিজের প্রয়োজন সেরে নেবে।

আদব: মানুষ যেখানে বসে আছে সেখানে ঝাড়ু দেবে না, কেননা এতে মানুষের স্বভাব ঠিক থাকে না।

মজলিসের আরো কতিপয় আদব

ভালো ও খারাপ মজলিসের প্রভাব

১. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবেই এ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা অন্যের স্বভাব, অবস্থা কোনো চেষ্টা ছাড়াই, মনের অজান্তে খুব দৃঢ়তার সাথে অতি দ্রুত গ্রহণ করে নেয়, চাই তা ভালো কিংবা খারাপ হোক। এজন্য ভালো সঙ্গী অনেক উপকারী। এ সঙ্গতা ভালো প্রভাব সৃষ্টি করে, অপর দিকে খারাপ সঙ্গ অত্যন্ত খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে।[৩৩]

২. অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, ভালো সঙ্গ দ্বীনের পথে পরিচালিত করে। আর মনের মাঝে দৃঢ়তার সৃষ্টি করে। আর খারাপ সঙ্গ দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং মনের মাঝে সন্দেহ ও দুর্বলতার সৃষ্টি করে।[৩৪]

৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন: المجلس أمانة "প্রতিটি মজলিসই আমানতপূর্ণ।" অর্থাৎ, মজলিসে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, সেসব বাইরে না বলা। ওই হাদিসে মশওয়ারা বা পরামর্শের মজলিসও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তবে ওই মজলিসের কথা বাইরে প্রকাশ করা জায়েয, যাতে তিন ধরনের আলোচনা হয়।[৩৫]

ফায়েদা: ওই তিন ধরনের আলোচনার সারাংশ এই যে, কারো জান, মাল অথবা সম্মান ভুলণ্ঠিত করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মজলিসের এ তিন ধরনের আলোচনা গোপন করা বৈধ নয়। যদি মজলিসের আলোচনা প্রকাশ করার দ্বারা ব্যক্তিগত কারো ক্ষতি হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অন্যায়। আর যদি তা প্রকাশ করার দ্বারা সকল মুসলমান এবং জনসাধারণের ক্ষতি হয়, তাহলে তা মারাত্মক অন্যায়।[৩৬]

৪. যখন মজলিসে কোনো বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে, তখন নতুন আগন্তুক মজলিসে এসে সালাম দেয়া অথবা মুসাফাহা করা উচিত নয়। অনেক লোক

---

[৩৩]। হায়াতুল মুসলিমীন: পৃ: ১৪৪
[৩৪]। হায়াতুল মুসলিমীন: পৃ: ১৪৬
[৩৫]। আবু দাউদ
[৩৬]। হায়াতুল মুসলিমীন: পৃ: ৩৩৪

এমন আছে, যারা আলোচনার মাঝে মজলিসে আগমন করে, সালাম দিয়ে এক দিক থেকে মুসাফাহা আরম্ভ করে দেয়। ফলে আলোচনার ধরাবাহিকতা ঠিক থাকে না। এতে করে মজলিসের সকলেই পেরেশান হয়ে পড়ে, এরকম কাজ আদব পরিপন্থী।

৫. মজলিসে তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। (১) সাধাসিধেভাবে বসবে, ভাব-গাম্ভীর্যতা নিয়ে বসবে না। (২) যদি প্রথম থেকেই মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে সামনে গিয়ে বসবে। (৩) আর যদি পরে উপস্থিত হয় তাহলে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে, সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না। জুমুআর দিন মসজিদে যদি পরে যায়, তাহলে যেখানে স্থান পাবে সেখানেই বসে পড়বে।

মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাবে না, এ ব্যাপারে হাদিসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এরকম ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পুল বানানো হবে, যাতে মানুষেরা তাকে পাড়িয়ে পাড়িয়ে অপর প্রান্তে চলে যেতে পারে। এতে চার ধরনের অনিষ্ঠতা রয়েছে। ১. মুসলমান ভাইকে অযথা কষ্ট দেয়া। ২. অহংকার। ৩. মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। ৪. রিয়া তথা নিজের আমল মানুষকে দেখানো হয়। তা এভাবে যে, যখন সে সামনের দিকে যায়, আর তার মনের অজান্তেই সে বলে দেয় যে, আমি একজন নামাযি, আমি প্রথম কাতারে নামায পড়ি। এ চারটির প্রতিটিই মারাত্মক গুনাহ। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।[৩৭]

৬. প্রতি দিনের মতো হযরত আসরের নামাযের পর জায়নামাজে বসা ছিলেন। কুরআন শেখার জন্য ওমর নামের এক বালকসহ আরো কয়েকজন এসে হযরতের সামনে বসলো। অন্য আরেক তালিবে ইলম যে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদরাসায় লেখা পড়া করছে সেও হযরতের অনুমতিক্রমে কুরআন নিয়ে খানকায় আসতো। সে এসে দেখতে পেলো যে, সকলেই সামনে বসে পড়েছে, তাই এ তালিবে ইলম সামনে যাওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলো। হযরত তার এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এতদিন থেকে খানকায় থাকো, মাদরাসায় লেখা-পড়া করছো তারপরও কি এই ছোট একটি আদব শেখতে পারনি? যাও, এখান থেকে চলে যাও।

দ্বীন কি শুধু কিতাবাদি পড়া, আর অজীফা আদায় করার নাম? নিজের আদব আখলাক ঠিক করা, আচার-আচরণ সুসজ্জিত করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ

৩৭। রহমাতুল মুতাআল্লিমীন: পৃঃ ৮৬

অধ্যায়। যারা আগে আগে চলে এসেছে, তাদেরকে ধাক্কিয়ে সামনে আসার আদব তোমাকে কে শিখেয়েছে। তুমি তো শ্রোতা, দূর থেকেই তো আমার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। যেখানে আওয়াজ পাও সেখানেই বসে পড়লে না কেন?

আর যদি সামনে বসার এতই আগ্রহ থাকে তাহলে সবার আগে আসলে না কেন? এখান থেকে চলে যাও, যতদিন পর্যন্ত তুমি আদব-আখলাক না শেখবে ততদিন পর্যন্ত আড়ালে বসে আমার কথা শোনবে। আমার সামনে আসবে না।[৩৮]

মজলিসে নব-আগন্তুকের চুপ থাকাই শ্রেয়

৭. থানভী রহ. কোনো লোকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যে মজলিসে নতুন আগমন করবে, তার জন্য কথা-বার্তা না বলে মজলিসে চুপচাপ বসে থাকা অধিক শ্রেয়। কারণ সে মজলিসের পূর্বাপর বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত নয়, সুতরাং যদি সে কথা বলে তাহলে তার কথা মজলিসের অন্যান্য সবার জন্য পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যারা পূর্ব থেকে উপস্থিত আছে তাদের কথা ভিন্ন। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত।

কারো চিঠির উত্তরে থানভী রহ. লিখেন, আমি দশ বছরের কষ্ট, সাধনা, মুজাহাদা দ্বারা এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, এরূপ মজলিসে কথাবার্তা বললে যা অর্জন হয় চুপ থাকলে তার থেকে অনেক বেশী কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়।[৩৯]

একটি ঘটনা

এক ব্যক্তি মজলিসে বসা অবস্থায় সামনের দিকে যাওয়ার জন্য হাতের উপর ভর দিয়ে সামনে বাড়লো। হযরত এ কাজ দেখে বললেন, কখনোই এরূপ করবে না, এটা মজলিসের আদব পরিপন্থী। তারপর হযরত মজলিসের উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি ঘটনা শোনাবো। কোনো এক সময়ের কথা। দুজন ছোট ছেলে চৌকিতে শুয়েছিলো। আমি তাদের পায়ের দিকে বিছানায় কাজ করতে লাগলাম। তারা দু'জন আমাকে দেখে উঠে যেতে লাগলো। আমি বললাম, তোমরা শুয়ে থাকো, তোমাদের কারণে আমার কাজে কোনো বাঁধা তো সৃষ্টি হয়নি।

তারা আমাকে বললো, হযরত এটা তো আদব পরিপন্থী। আমি তাদেরকে বললাম, যখন আদবের সময় হবে তখন আমি নিজেই তোমাদেরকে বলে

---

[৩৮]। মাজালিসে হিকমাত: পৃ: ১৫৬

[৩৯]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ-৮ পৃ: ২৪৬

দেবো। আর তখন তোমরা তা পূর্ণ করে নিও। এরপর যখন তারা বড় হয়েছে তখন আমি তাদেরকে দেখি যে, সামাজিকতা এবং আদবের ব্যাপারে তারা খুব সতর্ক খেয়াল রাখতো।[৪০]

লৌকিকতা পরিহার করা আবশ্যক

এক ব্যক্তি মজলিসে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে আদবের ভান করে বসা ছিলো, হযরত তাকে দেখে বলেন, তুমি লৌকিকতার সাথে আদবের যে ভান করে বসে আছো, মনে হচ্ছে যে, আদবের ক্ষেত্রে তুমি সবার উপরে পৌঁছে গেছো। তোমার আদবের এ অবস্থার কারণে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। প্রত্যেকটা কাজই বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে করলে কখনো লজ্জিত হতে হয় না এবং তোমার সে কাজ দ্বারা কেউ কষ্টও পাবে না।

তোমার এভাবে বসার কারণে আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি। কেননা এভাবে বসার কারণে মনে হচ্ছে যে, একজন নিরাপরাধ মুসলমানকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর মাঝে তো এমন লৌকিকতা ছিলো না। তারা রাসূল (সা) এর সম্মুখে স্বাভাবিকভাবেই বসে থাকতেন। তাই বলে আমি বলছি না যে, তুমি একবারেই বে-আদব হয়ে যাও।

আদব অবশ্যই জরুরী জিনিস, তবে তাতে লৌকিকতা না থাকা চাই। আদব এমন কাজের নাম, যা দ্বারা অন্যের আরাম হয়, কষ্ট না হয়। আদব তো বলা হয় একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মাঝে থেকে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা, এটা বড়দের জন্যও এবং ছোটদের জন্যও। যেমনিভাবে বড়দের ক্ষেত্রে আদবের সীমারেখা রয়েছে তেমনিভাবে ছোটদের ক্ষেত্রেও আদবের সীমারেখা রয়েছে।[৪১]

মজলিসের কথা-বার্তা গোপনে শোনা জায়েয নেই

১০. একবার থানভী রহ. এর বিশেষ দু'জন খাদিম এসে কাছারি ঘরে ঢুকলেন। কাছারি ঘরটি ছিলো হযরতের স্ত্রীর ঘরের সাথেই লাগানো। হযরত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একবার স্ত্রীর ঘরে তাশরীফ আনলেন। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থতার কারণে হযরত তার খানকায় আসেন না, পাশের এ রুমে মাঝে মাঝে এসে বসেন।

---

[৪০]। জাদিদ মালফুযাত: পৃ: ১৩২

[৪১]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ: ৪ পৃ: ৫৫

হযরত কাছারি ঘরে কেউ আছেন অনুভব করে বললেন, কাছারি ঘরে কে? যখন হযরত তাদের ব্যাপারে অবহিত হলেন তখন বললেন, কাছারি ঘরে প্রবেশের পর কেন আমাকে অবহিত করলে না? অবহিত না করে চুপ করে প্রবেশ করে চোরের মত বসে থাকলে কেন? চুপ করে কারো গোপন বিষয়ে অবহিত হওয়া জায়েয আছে? মেনে নাও আমি তোমাদের ব্যাপারে অথবা অন্য কারো ব্যাপারে এমন গোপন কথাবার্তা বলতে চেয়েছিলাম, যে বিষয়ের তোমাদের অবহিত হওয়াকে অপছন্দ করছিলাম। চুপ করে বসে থেকে সে ব্যাপারে অবহিত হওয়া কতই না মন্দ কাজ।[৪২]

মজলিসের আরো কতিপয় আদব

১১. একদা এক তালিবে ইলম যে দীর্ঘদিন থেকে থানভী রহ. এর মজলিসে থাকতেন, মজলিসে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। থানভী রহ. ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বললেন, তুমি কি এতটুকু আদবও শিখোনি যে, কোনো মজলিসে বসে এদিক ওদিক তাকানোর কারণে অন্যের কষ্ট হয়। তুমি মজলিসে বসার উপযুক্ত নয়। যাও, এখান থেকে চলে যাও। যতদিন পর্যন্ত আদব না শিখবে ততদিন পর্যন্ত এ মজলিসে আসবে না।[৪৩]

১২. এক ব্যক্তি এমনভাবে মজলিসে বসেছিলো যে, তার মুখ চাদরে আবৃত ছিলো। হযরত তার এ অবস্থা দেখে বললেন, এ লোক চোর অথবা গুপ্তচরের মতো মুখ ঢেকে বসে আছে কেন? এভাবে মজলিসে বসতে হয় নাকি? মজলিসে বসার পদ্ধতি কি এটা? আবার তার কোকড়ানো চুলগুলোও নারীদের মতো বের করে রেখেছে। উত্তরে লোকটি বললো, হযরত কোনো কারণ নেই, এমনিতেই এভাবে বসে আছি। হযরত তাকে বললেন, তাহলে এভাবে কেন বসলে? লোকটি এত নিম্নস্বরে উত্তর দিলো যে, তার কথা শোনাই যাচ্ছিলো না। হযরত তার ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এগুলো তো নারীদের স্বভাব। নারীদের স্বভাব তোমার ওপর বিস্তার লাভ করেছে, কাজ কারবারও নারীদের মতো, আওয়াজও নারীদের মতো। কমপক্ষে তো কথাবার্তা এমনভাবে বলো, কথা অন্যের কান পর্যন্ত পৌঁছে। তুমি যেভাবে কথাবার্তা বলছো এটা তো মানুষকে কষ্ট দেয়ার একটি পদ্ধতি।

লোকটি বললো, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে। হযরত থানভী রহ. তাকে বললেন, ভুল তো হয়েছে ঠিক আছে, ভুলের শাস্তি হিসেবে এখনই তুমি এ

---

[৪২]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ৭ পৃঃ ১৬৬
[৪৩]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহঃ খঃ ৭ পৃঃ ১১৭

মজলিস থেকে ওঠে যাও। তোমাকে দেখার কারণে আমার কষ্ট হয়। তোমার কারণে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমি মনে করছো যে, তোমার কাজগুলো কেউ দেখেনি। আর তোমার নিজের মাঝেও কোনো অনুভূতি নেই যে, আমি বলার কারণে লোকজন তোমার কাজের ব্যাপারে অবগত আছে, এখান থেকে গিয়ে তুমি আমার দোষ বর্ণনা করতে থাকবে। যাই হোক তুমি এখান থেকে চলে যাও। লোকটি তখন বললো, হযরত আমাকে ক্ষমা করে দিন। হযরত থানভী রহ. বললেন, ক্ষমা করলাম, তবে তুমি মজলিস থেকে চলে যাও।[৪৪]

১৩. এক ব্যক্তি মজলিসে বসা অবস্থায় অন্য লোকের পিঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তার এ অবস্থা দেখে হযরত তাকে বললেন, এটা কোন ধরনের আদব যে, প্রশস্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও তুমি অন্য লোকের পিঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছো। তোমার কি এ জ্ঞানও নেই যে, একান্ত অপারগতা ছাড়া কারো পিঠের দিকে মুখ করে বসা মারাত্মক অপরাধ। আর এটা মজলিসের আদব পরিপন্থী। এ মোটা মোটা কথাগুলোও কি তোমাকে আমি শেখাতে হচ্ছে? এগুলোতো সবার জানা কথা। নিজের বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা অনুমান করার বিষয়। তোমার মাঝে আবার কোন রং লাগলো যে, তুমি অন্য মুসলমান ভাইকে অপদস্থ করার মতো মন্দ কাজে জড়িতে হয়ে পড়লে? লোকটি বললো, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত তাকে বললেন, ভাই আমিও তো তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, সুতরাং তোমার আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা চাওয়া আর আমার আল্লাহর ওয়াস্তে স্মরণ করার মাঝে কি পার্থক্য আছে?[৪৫]

১৪. এক গ্রাম্য লোক এসে মজলিসের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেলোয়ারের ফিতা খুলে ভেতরের পকেট থেকে একটা থলে বের করলো, এরপর তার ভেতর থেকে একটি কাগজের টুকরো বের করলো, হযরত থানভী রহ. দূর থেকে তার এ অবস্থা দেখলেন। এ লোকটি এসে শায়খের নিকট বসে পড়লো। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তুমি সেখানে কী করছিলে? লোকটি বললো, হযরত আমি থলের ভেতর থেকে একটি কাগজের টুকরো বের করলাম। হযরত তাকে বললেন, মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সেলোয়ারের ফিতা খুলে সেখান থেকে কাগজের টুকরো বের করা তো শরমের কথা। আর কখনো

---

[৪৪] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খ. ৬ পৃ: ৭৪
[৪৫] । আল ইফাযাত: খ. ৬ পৃ: ২২

এরূপ করবে না। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো মজলিসে আসার আগেই কাগজের টুকরো বের করবে। তারপর মজলিসে আসবে। প্রত্যেকের জন্যই আদব ও শিষ্টাচার শেখা অত্যন্ত আবশ্যক। পশুদের সাথে থেকে পশু হওয়া কখানোই কাম্য নয়।[৪৬]

ꕥ ꕥ ꕥ

অধ্যায়-৪

কথা-বার্তার আদবসমূহ

আদবঃ অনেকে এমন আছে যারা কথা-বার্তা বলার সময় স্পষ্ট করে কথা বলে না; বরং লৌকিকতা অবলম্বন করে অথবা ইশারায় কথা বলে। আর এটাকে তারা আদব মনে করে থাকে। এর দ্বারা অনেক সময় দেখা যায় যে, যাকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে সে তার কথা বুঝতেই পারে না অথবা উল্টা বুঝে, ফলে তাকে পেরেশানির সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য কথা-বার্তা বলার সময় খুব স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা এবং অত্যন্ত চিন্তা-ফিকির করে কথা বলা উচিত।

আদবঃ এমনিভাবে যদি কারো কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হয়, তাহলে তার সামনে বসে কথা বলবে, পিছনের দিকে বসে কথা বলা আদৌ উচিত নয়। কেননা এভাবে বলার দ্বারা বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

আদবঃ যদি দ্বিতীয় বার কারো কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হয়, তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কথা বলবে। ইশারা করে অথবা পূর্বের কথার উপর ভরসা করে অসম্পূর্ণ কথা বলবে না। হতে পারে তার পূর্বের কথা স্মরণ নেই, অথবা ইশারা করে বলার কারণে ভুল বুঝবে, অথবা তার বুঝতে কষ্ট হবে।

আদবঃ কতেক লোক এমন আছে যারা নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে এসে পেছনের দিকে বসে গলায় আওয়াজ দিতে থাকে। যখন তার গলার আওয়াজ শুনে ফিরে দেখবে, তখন তার সাথে কথা বলবে। এ কাজের কারণে ভীষণ কষ্ট হয়। এর চেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হলো, যদি কোনো কিছু বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে সামনে এসে বসবে। যখন তোমার দিকে মনোনিবেশ করবে তখন তুমি তার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলবে।

---

[৪৬]। আল ইফাযাত: খ. ৪ পৃ: ৩৮৩

আর যিনি কোনো কাজে ব্যস্ত তার কাছে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এভাবে গিয়ে বসাও ঠিক নয়, অনেক সময় এভাবে বসার কারণে সে বিরক্তিবোধ করে, অথবা তার কাজে ব্যাঘাত ঘটে, তবে যখন সে কাজ থেকে অবসর হবে, তখন তার কাছে গিয়ে বসে যা বলার প্রয়োজন- বলবে।

আদব: কতেক লোক এমন আছে যারা কিছু কথা উচ্চঃস্বরে বলে, আর কিছু কথা নিম্নস্বরে এমনভাবে বলে যে, তা শোনাই যায় না, অথবা শোনা তো যায়, কিন্তু তা অস্পষ্ট থেকে যায়। উভয় পদ্ধতি শ্রবণকারীর জন্য বিরক্তির কারণ হয়, অথবা তা থেকে ভুল বুঝে। এজন্য কথা পরিস্কার ভাষায় মধ্যমপন্থায় বলা উচিত।

আদব: হযরত এক নব আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আবার কখন এখান থেকে রওয়ানা দেবেন? উত্তরে লোকটি বলল, যখন আল্লাহর হুকুম হয়। হযরত তাকে বললেন, এমন অস্পষ্ট উত্তর দেয়া এটা কোন ধরনের আদব? তোমার অবস্থা সম্পর্কে আমার কি জানা আছে? কখন রওয়ানা হলে তোমার জন্য মঙ্গল হবে? কি পরিমাণ সময় তোমার হাতে আছে? উত্তর দেয়ার সময় উচিত হলো যে, তুমি তোমার আগ্রহের ব্যাপারে অবহিত করে বলবে যে, ঐসময় আমার যাওয়ার ইচ্ছা।

আর যদি বেশি আদব আনুগত্য দেখাতে চাও তাহলে এভাবে বলবে, আমার ইচ্ছা তো ঐ সময় যাওয়ার বাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন নির্দেশ হবে। মোট কথা হলো এমনভাবে উত্তর দিবে না যা প্রশ্নকারীর জন্য বুঝা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

আদব: কথা-বার্তা সব সময় স্পষ্ট ভাষায় বলবে, কখনো লৌকিকতার আশ্রয় নিবে না।

আদব: অপ্রয়োজনে কাউকে মাধ্যম বানিয়ে অন্যকে সংবাদ পৌছাবে না, যা বলার নিজেই বলে দিবে। আর কোনো প্রকার লৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না।

আদব: কিছু লোক আছে তারা এসে বলে, হুজুর! একটা তাবীজ দিন। জিজ্ঞাসা ছাড়া বলে না যে, কি সমস্যার জন্য সে তাবীজ নিতে এসেছে, এ ধরনের কাজগুলো এক প্রকার অভদ্রতা।

আদব: এক তালিবে ইলমকে এক কর্মচারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে এখন কি করছে? উত্তরে তালিবে ইলম বলল, সে এখন ঘুমাচ্ছে। পরে জানা গেলো যে, অথচ সে ওই সময় তার কামরায় জাগ্রত ছিলো।

তার কারণে ঐ তালিবে ইলমকে বলা হলো যে, শুধু ধারণাপ্রসূত কোনো কথাকে নিশ্চিত ভেবে কাউকে সংবাদ দেয়া মারত্মক অন্যায়। যখন কোনো ব্যাপারে তোমার কাছে নিশ্চিতভাবে জানা থাকবে না, তখন অনুমানের উপর সংবাদ

দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে সংবাদ দাতার কাছে অনুমানের বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে এবং সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে এই পন্থা অবলম্বন করে বলতে হবে যে, সম্ভবত সে ঘুমে আছে। আর এ কথাও খুব নিম্নস্বরে বলতে হবে, যাতে করে তোমার কথা থেকেই বুঝে আসে, তুমি যে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছো তা অনুমানের ভিত্তিতে। তবে সবচেয়ে ভালো হলো স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া যে, আমার জানা নেই অথবা আমি দেখে বলবো। অতঃপর দেখে সঠিক সংবাদটি অবহিত করবে, এতে করে যে সংবাদ দিলো তার উপর খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে না।

এমনিভাবে ধারণাপ্রসূত হয়ে সংবাদ দেয়ার দ্বারা অন্যান্য ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়, যেমন পূর্বের সংবাদের ব্যাপারে যদি আমি পরবর্তীতে অবহিত না হতাম এবং এ ধারণায় বসে থাকতাম যে, সে ঘুমাচ্ছে, তাহলে অনর্থক আমার মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হতো। তাছাড়া যখন পরবর্তীতে জানা যাবে, তখন ওই সংবাদ দেয়ার কারণে ক্রোধ সৃষ্টি হবে। যাকে সংবাদ দেয়া হলো, তার জন্য আবশ্যক হলো কাউকে কোনো ব্যাপারে সংবাদ দিতে হলে নিশ্চিত ও ভালোভাবে জেনেশুনে সংবাদ দিবে। যাতে করে আমার অবাস্তব সংবাদ অন্যের অস্থিরতার কারণ হয়ে না দাড়ায়।

আদবঃ এক আগন্তক খানকায় এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন আসলেন, কিছু বলার আছে কি? উত্তরে আগন্তুক বলল, ঐ সময় খানকায় পৌঁছেছি, সাক্ষাতের জন্য এসেছি, কোনো কিছু বলার নেই।

মাগরিবের নামায শেষ করে যখন তার যাওয়ার সময় হলো, তখন লোকটি বলল, হযরত একটা তাবীজ দেন। হযরত ক্রোধের স্বরে বললেন, প্রতিটি কাজের একটা সময় আছে, এখন মাগরিবের সুন্নাত ও ফরযের মাঝামাঝি সময়, নফল ইবাদতের সময়, এখন তো তাবীজ দেয়ার সময় না। যখন তুমি খানকায় আগমন করেছ, তখনই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো প্রয়োজনে এসেছ কি-না? তখন উত্তরে তুমি বলেছ যে, শুধু সাক্ষাতের জন্য এসেছি। তাহলে এখন আবার তাবীজের আবেদন করলে কেন? যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখনই তোমার বলা উচিত ছিলো।

মানুষেরা এ কাজগুলোকে আদব মনে করে থাকে। বাস্তবতায় এ কাজগুলো কোনো আদব নয়, আমার কাছে এগুলো বড় ধরনের বে-আদবি। এ পন্থা অবলম্বন করার অর্থই হলো, অন্যরা আমার চাকর, যখন ইচ্ছা, যে সময় ইচ্ছা তখনই আমি তার কাছে থেকে কাজ আদায় করে নেবো। তুমি নিজেই একটু চিন্তা করে দেখ, এখন আমার কত কাজ।

একে তো সুন্নাত নফলসমূহ আদায় করা, যারা খানকায় আছে তাদেরকে কিছু বলা, তাদের কথাবার্তা শোনা, মেহমানদের খাবার খাওয়ানো। এত কাজ বাদ দিয়ে তোমাকে কিভাবে তাবীজ দিবো। আফসোস! বর্তমানে সময়ে আদব একেবারেই বিদায় নিয়েছে। এই ব্যস্ততার মাঝে তুমি তাবীজ নিতে এসেছ, স্মরণ রাখবে, উচিত হলো প্রথম সাক্ষাতেই নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দেয়া।

বিশেষ করে যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তা আর গোপন না রেখে স্পষ্ট ভাষায় নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দিবে। আমি তো প্রত্যেক আগন্তককে যখনই তারা সাক্ষাতের জন্য আসে তখন-ই তাকে জিজ্ঞাসা করি কোনো প্রয়োজনে এসেছে কিনা? যাতে করে বিষয়টি তার জন্যও সহজ হয়, আমার জন্যও সহজ হয় এবং তার প্রয়োজনের কথা যথাসময়ে আমাকে জানাতে পারে। কেননা, সব সময় খানকায় অনেক ধরনের লোকজন থাকে, অনেকে আছে তারা লজ্জা-শরমের কারণে কথা বলতে পারে না। আবার কেউ কেউ আছে তারা অনেক লোকের সমাগমের কারণে গোপন বিষয়ে আমাকে অবহিত করতে পারে না। যদি সে বলে যে, আপনাকে পৃথকভাবে জানাতে হবে, তখন তার বিষয়টি আমার স্মরণে থাকার কারণে সময় মতো পৃথকভাবে তাকে ডেকে নিয়ে আমি তার গোপন বিষয় শুনে নেই। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করার পরও না বলে তাহলে তার বিষয়ে আমি কিভাবে জানব। আমার কাছে কি অদৃশ্যের সংবাদ পৌঁছে নাকি?

আদব: খানকায় বয়ান চলাকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। হযরত রাগান্বিত হয়ে কিছুটা উচ্চস্বরে বললেন, এটা কোন ধরনের কথা? একটা আলোচনা চলছে, সেটা শেষ হতে না হতেই তুমি নুতন আরেকটা আলোচনা শুরু করলে?

سخن را سرست اے خردمند و بن * میادر سخن در میاں سخن

خردمند تدبیر و فرہنگ ہوش * نگوید سخن تا نہ بیند خموش

অর্থ: যারা জ্ঞানী তাদের কথার সূচনা ও সমাপ্তি রয়েছে, তারা কখনোই এক কথার মাঝে আরেকটি কথার অনুপ্রবেশ ঘটান না। জ্ঞানীগণ কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা আলোচনা চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকেন, নতুন কথা আরম্ভ করেন না।

উপদেশ: তোমার অবস্থায় মনে হচ্ছিল এটা স্বপ্নের ব্যাখ্যার মজলিস, এখানে ব্যাখ্যার আলোচনা চলছে, বয়ান আর তা'লীম এখানে অনর্থক, যেন এতক্ষণ

পর্যন্ত আমি যে বয়ান করলাম সেগুলো অর্থহীন। সামনে থেকে কখনই এমন কাজ করবে না। যাও, এখান থেকে চলে যাও। সামনে অন্য কোনো সময় তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেয়া হবে। তুমি তো বয়ান আর তা'লীমের অবমূল্যায়ন করেছ।

আদব: যার কাছে তুমি তোমার পার্থিব বা পরকালের কোনো প্রয়োজনের কথা বলবে, তার সাথে তুমি সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে, কোনো প্রকার লৌকিকতার পথ অবলম্বন করবে না। যদি সে তোমার ঐ বিষয় সম্বন্ধে জানতে চায়, তাহলে এমন কোনো ধরনের কথা বলবে না, যা হওয়া না হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। তার কাছে কথা বলার সময় কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করবে না, যার কারণে সে ভুল বুঝে, অথবা অযথা সেটা তার জন্য পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বার বার জিজ্ঞাসা করার দ্বারা তার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সে তো একনিষ্ঠভাবে তোমার উপকারে তার সময় নষ্ট করছে, তার তো এ কাজে ন্যূনতম স্বার্থও নেই।

যদি তুমি তার কাছে পরিস্কার ভাষায় সত্য কথা বলতে না পারো, তাহলে তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বলো না। তুমি তোমার ঐ বিষয় নিয়ে নিজে নিজেই চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও এবং তা বলা থেকে বিরত থাকো।

আদব: কথা বলার সময় বক্তা যে বিষয়কে দলিল প্রমাণাদির মাধ্যমে অযৌক্তিক বলে সাব্যস্ত করেছে অথবা যে দাবির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে, তার অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। তবে হুবহু ঐ দাবি ও প্রমাণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শ্রোতাদের বিরক্ত করা এবং কষ্ট দেয়া আদৌ উচিত নয়। এ বিষয়টির প্রতি সকলের খুব তীক্ষ্ণ ও সর্তক দৃষ্টি রাখা উচিত।

আদব: কোনো অসুস্থ ব্যক্তি অথবা তার পরিবার পরিজনের কাছে নৈরাশ্যের কোনো কথা শোনাবে না, কেননা এতে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তার পরিবার পরিজনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং হতাশার সৃষ্টি হয়, বরং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে এবং এভাবে বলবে যে, ইনশাআল্লাহ অচিরেই আল্লাহ তাআলা তার সকল দুঃখ দুর্দশা দূর করে দিবেন এবং সুস্থতা দান করবেন।

আদব: যদি কারো ব্যাপারে কোনো গোপন কথা বলতে হয় এবং সেও যদি ঐ মজলিসেই উপস্থিত থাকে তাহলে চোখ অথবা হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে না। কেননা এরূপ করার দ্বারা নরম স্বভাবের লোকেরা মারাত্মক ব্যথিত হন। এ নির্দেশ তো ঐ সময় যখন শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ কথা বলা বৈধ হয়। আর যদি বৈধ না হয়, তাহলে তা গুরুতর অপরাধ।

আদব: যদি কারো চিন্তা পেরেশানি, অথবা অসুস্থতার সংবাদ শোন, তাহলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে অন্য কারো কাছে বলো না, বিশেষ করে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে।

কথা-বার্তার আরো কতিপয় আদব

১. ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ঈসা আ. বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহর যিকির এবং দ্বীনের কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনা কথা-বার্তা বলো না। কারণ এসবের দ্বারা অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং দিলের একগ্রতা নষ্ট হয়, পরবর্তীতে দ্বীনের কথাবার্তা ভালো লাগে না। ইমাম মালিক রহ. বলেন, এটা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণীত।[৪৭]

২. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কথাবার্তা এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যাতে করে সহজেই বুঝতে পারে। তোমারা কি চাও সাধ্যের অতিরিক্ত এমন কিছু কথাবার্তা বলবে, যা সঠিকভাবে না বুঝার কারণে আল্লাহ ও তার রাসূলকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।[৪৮]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যখন তোমরা মানুষদেরকে এমন কথা বলবে, যা তাদের জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে না অর্থাৎ সহজেই কথাবার্তাগুলো বুঝতে পারে না, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওই কথাগুলো কিছু মানুষের জন্য অনিষ্টতা এবং ফিতনা ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৪৯]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন যে, তোমরা মূর্খ ও গ্রাম্য লোকদের মুখে ইশার নামাযের কথা শুনে ধোকা খেও না। কেননা, এই মূর্খ লোকেরা মাগরিবের নামাযকে ইশা বলে থাকে, অর্থাৎ তাদের সাথে তাল মিলিয়ে তোমারাও ইশা বলো না। বরং মাগরিবই বলো। রাসূল সা. আরো বলেছেন যে, তোমরা গ্রাম্য মূর্খ লোকদের মুখে আতামা শব্দের ব্যবহার শুনে প্রতারিত হয়ো না। কেননা, তারা ইশার নামাযকে আতামা বলে থাকে। কুরআন কারীমে ইশার নামাযকে আতামা বলা হয়নি, বরং ইশা বলা হয়েছে। কেননা, আতামা শব্দের অর্থ হলো- রাতের অন্ধকারে উষ্ট্রির দুধ দোহন করা।

---

[৪৭]। আত তাকাশশুফ পৃ-৬৫

[৪৮]। আত তাকাশশুফ পৃ-৫৯৬

[৪৯]। আত তাকাশশুফ পৃ-৫৯৬

ফায়েদাঃ পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, কথা-বার্তা বলার সময় অনর্থক ঐসব লোকদের সামঞ্জস্যতা অবলম্বন করা আদৌ উচিত নয়, যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ও মুর্খ।[৫০]

رحمة المتعلمين নামক কিতাবে বর্ণিত কর্থা-বার্তার আদবসমূহ

৫. কথা-বার্তার মাঝে বড়দের নাম নেওয়ার সময় খুব সম্মানের সাথে নেওয়া চাই। যতদূর সম্ভব তাদের নাম না নিয়ে উপাধি ব্যবহার করাই ভালো ও আদব।

৬. যদি কারো নিকট তুমি প্রয়োজনে যাওয়ার পর, তাকে কোনো কাজে অথবা কারো সাথে কথাবর্তায় ব্যস্ত দেখ, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত অবসর না হয়, অথবা তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা তার কাছে পেশ করবে না।

৭. যদি রাস্তায় পরিচিত কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তার অবস্থা সম্পর্কে জানার উপরই সীমাবদ্ধ রাখবে, লম্বা চৌড়া কোনো আলোচনা শুরু করে দিবে না, যাতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, কেননা, এরূপ করার দ্বারা তার মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করে তোমাকে সে আলোচনা পূর্ণ করতে হবে। আর যদি তোমার সে আলোচনা পূর্ণ না করেই সে লোক চলে যায় তাহলে তোমাদের মাঝে অযথা এক ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, কি হলো সে আমার কথা না শুনে চলে গেল কেন? যদি তুমি এরূপ লম্বা আলোচনা শুরু না করতে, তাহলে অযথা সময়ও নষ্ট হতো না এবং সন্দেহের সৃষ্টিও হতো না, এজন্য এরূপ অনর্থক কাজ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে।

৮. যদি কেউ তোমাকে তার পরিচিতজন ভেবে দূর থেকে অন্য কোনো নাম ধরে ডাকে, আর তুমি তা বুঝতে পারো, তাহলে এ কথা ভেবে চুপ থেকো না যে, সে ভুল করে আমাকে ডেকেছে, বরং সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম জানিয়ে দিয়ে বলো, ভাই আপনি যাকে ডাকেন আমি সেই নই। যাতে করে তোমার চুপ থাকার কারণে আহ্বানকারীর মাঝে অযথা একধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়।

৯. মজলিসে এমন কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করবে না, যা শ্রবণকারীদের জন্য ঘৃণার কারণ হয় যেমন- প্রস্রাব-পায়খানা। যদি একান্ত বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে বলবে কাযায়ে হাজত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছি, অথবা কাজের জন্য যাচ্ছি, অথবা প্রয়োজনে যাচ্ছি। এমনিভাবে খাবারের সময়ও এসব

---

[৫০]। হায়াতুল মুসলিমীন পৃঃ ৩৪৭

শব্দ উচ্চারণ করবে না, কেননা, অনেকের স্বভাব এতটাই দুর্বল হয় যে, তারা এসব শব্দ শুনে ঘৃণার কারণে বমি করে ফেলে।

১০. তিনজন লোকের মাঝে হতে দু'জন ব্যক্তি চুপে চুপে কথা-বার্তা বলবে না। এমনিভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে, অথবা ইশারায়ও কথাবার্তা বলবে না, কারণ এতে করে তৃতীয় ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়।

১১. দুই ব্যক্তির কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এ কথা বলা অদৌ উচিত নয় যে, তা আমার পূর্বে থেকেই জানা আছে, বরং জানা থাকলেও বক্তার মনের সন্তুষ্টির নিয়তে তার কথাগুলো চুপচাপ শ্রবণ করতে থাকবে।

১২. কেউ যদি কারো নিকট তার শায়েখের কুৎসা রটনা করে, তাহলে কখনোই তার শায়েখের নিকট তা বর্ণনা করবে না, এজন্য যে, সে শুনলে তার অন্তর ব্যথিত হবে।

১৩. হযরত বয়ানের মাঝে এক সময় বললেন, ভুলকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে শুদ্ধ করার চেষ্টা করা আমার নিকট মারাত্মক অপরাধ। পঞ্চাশবার ভুল করার পর ভুলকে ভুল হিসেবে মেনে নেয়া ওই পরিমাণ অপরাধ নয়; একবার ভুল করার পর তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত করার চেষ্ট করা যে পরিমাণ অপরাধ।

অনর্থক গল্পকাহিনী বর্ণনা করবে না

১৪. হযরত বললেন, অনর্থক কল্পকাহিনী, বেহুদা ঘটনা বর্ণনা করে সময় নষ্ট করা আমার কাছে খুবই মন্দ কাজ। মানুষেরা অহেতুক কথা-বার্তা বলে আমার সময় নষ্ট করে থাকে, মানবতার খাতিরে অনেক সময় আমি কিছু বলি না, চুপচাপ থাকি, উচিত হলো ব্যস্ত মানুষের নিটক কাজের কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগ করা।

১৫. হযরত বলেন, আজে বাজে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। যে বুঝার আগ্রহ রাখে, সে সহজেই বুঝতে পারে, আর যার উদ্দেশ্য শুধুই প্রশ্ন করা, তাকে বলে দেয়া উচিত যে, তুমি এটা বুঝবে না।

বেশি বেশি প্রশ্ন করবে না

১৬. হযরত বলেন বেশি বেশি প্রশ্ন করার অর্থ হলো আমল না করা, বরং যে আমল করবে সে বেশি বেশি প্রশ্ন করবে না, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা বাস্তবে পরিণত করবে।[৫১]

৫১। কামালাতে আশরাফিয়া পৃ- ৭০

উত্তর শুনে চুপচাপ বসে থাকা আদব পরিপন্থী

১৭. কেউ প্রশ্ন করে তার উত্তর শোনার পর, কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকার কারণে আমার বড় কষ্ট হয়। যদি উত্তর বুঝে না আসে তাহলে দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করা যে, হযরত আমার কাছে পরিস্কার হয়নি, অথবা আমার বুঝে আসেনি। আর যদি বুঝে আসে তাহলে কমপক্ষে তো এতটুকু বলা যে, জ্বী বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, অথবা হ্যাঁ সূচক কোনো ইশারা করা, কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকার কারণে আমার কষ্ট হয়, আর এটা আদব পরিপন্থী।

অসম্পূর্ণ কথা না বলা

১৮. কিছু মানুষ ছাড়া সকলের মাঝে এই রোগ ব্যাপক যে, কথা বলার সময় কিছু কথা বলে আর কিছু কথা রেখে দেয়, অর্থ্যাৎ অর্ধসম্পূর্ণ কথা বলে, এ অবস্থা শ্রোতার জন্য বড় কষ্টের কারণ হয়।

নিজের ঘরেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা উচিৎ

১৯. হযরত বলেন, অনেক লোক এমন আছে যে, তারা কোনো কিছু না বলেই নিজ কক্ষে প্রবেশ করে, এটা বড় মন্দ কাজ। জানা নেই যে, ঘরের ভেতর মহিলারা কোন অবস্থায় আছে, না-কি বাহির থেকে কোনো গায়রে মাহরাম মহিলা ঘরের মাঝে এসেছে। এজন্য উচিত হলো নিজ ঘরেও প্রবেশের সময় অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। প্রথমেই অনুমতি চাইবে যদি অনুমতি দেয় তাহলে ঘরে প্রবেশ করবে।

মু'মিন পরস্পর উত্তম উপাধিতে ডাকবে

২০. রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, এক মুমিনের উপর অন্য মুমিনের হক বা দাবি হলো, তাকে এমন সুন্দর ও উত্তম উপাধীতে ডাকবে, যা তার কাছে পছন্দনীয়। এজন্য আরবের লোকদের মাঝে উপনামের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যখন কারো নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তাকে উপনামে ডাকে। আর রাসূল সা. এটাকে পছন্দ করেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দীককে আতীক, হযরত উমর রাযি. কে ফারুক, হযরত হামযা রাযি. কে আসাদুল্লাহ এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. কে সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।[৫২]

---

[৫২]। মা'আরেফুল কোরআন খ.৮ পৃ-১১

অসম্পূর্ণ কথার উপর আমল করার ব্যাপারে সতর্কতা

২১. এক ব্যক্তি হযরতের কাছে এসেছে, তার অসুস্থতার জন্য লবণ পড়া নিতে, লোকটি হযরতকে কথাটি অসম্পূর্ণভাবে বলেছে, হযরত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, এখন যাও যখন কথা পরিপূর্ণভাবে বলতে শিখবে তখন লবণ পড়া নিয়ে যেও। অতঃপর তিনি মজলিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হাদীসের মাঝে এসেছে- একবার এক ব্যক্তি অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই রাসূল সা.-এর দরবারে আসলে রাসূল সা. তাকে অন্যের কাছে যাওয়ার পদ্ধতি বলে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন এরপর যখন আসবে তখন এভাবে আসবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, আমলি বা বাস্তবিক শিক্ষা দেয়া হলো সুন্নাত, যারা নির্বোধ তাদেরকে এভাবে শিক্ষা দেয়া ছাড়া তারা স্মরণও রাখতে পারে না।[৫৩]

পরিষ্কার ভাষায় কথা বলা আবশ্যক

২২. একদিন হযরত বলেন, এলোমেলো অগোছালো কথা-বার্তার কারণে আমার মেজাযে এক ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে পরিস্কার ভাষায় বলা উচিত। আমি নিজেও পরিস্কার ভাষায় কথা বলি আর অন্যের কাছ থেকেও পরিস্কার কথা শোনার আশা রাখি। মানুষদের মাঝে অধিকাংশ মানুষদের সাথে আমার বাক বিতন্ডা হয়।[৫৪]

সাক্ষাতে প্রথমেই নিজের পরিচয় দেবে

এক নব আগন্তুক মজলিসে উপস্থিত হয়ে হযরতের সাথে মুসাফাহা করার পর, আরেকজনের একটা চিঠি হযরতকে দিয়ে বললেন, হযরত এই চিঠিটা অমুকে পাঠিয়েছেন।

হযরত তাকে বললেন, প্রথমে তো তুমি তোমার পরিচয় দিবে, এরপর অন্যের কথা বলবে। আমি তো তোমাকেই চিনি না। নিজের পরিচয় আগে দাও তারপর অন্যের কথা বলো, উত্তরে আগন্তুক বলল, আমি একজন তালিবে ইলম, অমুক মাদরাসায় লেখাপড়া করি। এতটুকু বলে সে চুপ হয়ে গেল। হযরত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এতটুকু বলাই কি পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট? এর দ্বারাই কি তোমার পূর্ণ পরিচয় হয়ে গেছে? এরপরেও লোকটি চুপ থাকলে হযরত দ্বিতীয়বার আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? তারপরেও সে কিছু

---

[৫৩] । জাদিদ মালফুজাত পৃ- ১৬৩

[৫৪] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খ-২ পৃ- ২৫৮

বলল না, লোকটি চুপ থাকল। হযরত বললেন, এই রোগের কোনো চিকিৎসা আমার কাছে নেই।

আমি বার বার বলার পরেও সে নিজের পূর্ণ পরিচয় দিলো না। লোকটি পূর্বের মত মুখ বন্ধ করে থাকল। হযরত বললেন, যদি আমার প্রশ্ন তোমার কাছে অনর্থক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহলে এখান থেকে উঠে ঐখানে গিয়ে বসো। আমার কাছে অযথা বসে থেকো না।[৫৫]

২৪. হযরত বলেন, সদা সর্বদা সত্য কথা বলবে, এবং সুন্দর ও বিনম্র ভাষায় বলবে, যাতে করে তোমার বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা অন্যের অন্তর ব্যথিত না হয়।

২৫. এক নব আগন্তুক এসে হযরতের সাক্ষাৎ করতে গেলে, হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থেকে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? আগন্তুক হযরতকে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না। হযরত বললেন, ভাই যা বলার আছে দ্রুত বলে দিন, কমপক্ষে তোমার পরিচয় দিয়ে বলবে, কোথায় থেকে এসেছ? কত দীর্ঘ সফর করলে? কি উদ্দেশ্যে এসেছ? কত টাকা পয়সা খরচ করলে? তুমি যদি না বলো তাহলে কার কাছে এসেছ সে কিভাবে বুঝবে? তার কাছে তো আর ইলমে গায়েব নেই যে, তোমার উদ্দেশ্যের কথা বলার পূর্বেই সে জেনে ফেলবে।

যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে পরিস্কারভাবে তা বলে দাও। সেটা বলে দেয়া তো কঠিন কোনো কাজ নয়। তারপরেও লোকটি কিছু বলল না। এরপর হযরত বললেন, যারা আসছে তাদের অবস্থা দেখেও কি বুঝতে পারছো না? তারা এসে কি করছে? এরপরেও লোকটি কোনো কথা-বার্তা না বলে চুপ থাকল। হযরত বললেন, এর উদাহরণ হলো একজন তার পাশেই থাকা লোকটিকে বার বার আহবান করার পরেও আহবানে সাড়া দিলো না। তাই সে লোকটির শরীরে একটা সুই ঢুকিয়ে দিলেন, তখন লোকটি জোরে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগল ভাই মরে গেলাম, এই জালিম আমার শরীরে সুই ঢুকিয়ে দিয়েছে, এভাবে চিল্লা ফাল্লা শুরু করে দিলো। আর তার চিল্লা ফাল্লার আওয়াজ সকলেই শুনে ফেলল, কিন্তু তার পূর্বের অবস্থা তো কেউ দেখেনি। এরপর হযরত বললেন, আসলে এরূপই করা দরকার, তাহলে বাস্তবতা বুঝে আসবে। তার অবস্থা তো কোনো মানুষই সহ্য করতে পারবে না। ইসলাহের নামই মানুষেরা শনেছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার হাকিকত সম্পর্কে লোকেরা একেবারেই বে-খবর। প্রকৃত মানুষ হওয়া বড়ই কঠিন কাজ।[৫৬]

৫৫। আল ইফাযাদে ইয়অওমিয়্যাহ ২/১৪৩
৫৬। আল ইযাফাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৪/২৫২

কোনো বিষয়ে আবেদনের পদ্ধতি

২৬. জনৈক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জানার আবেদন করে হযরতের হাতে একটি চিঠি দিলেন। অতঃপর আবার মৌখিকভাবেও বলতে আরম্ভ করে দিলেন। হযরত তাকে বললেন, এরূপ এলোমেলো কেন? জানতে চেয়ে চিঠিও দিলে আবার মৌখিভাবেও বলতে শুরু করলে, এটা কেমন কথা। হয় সবগুলোই লিখিত আকারে দিবে, অথবা সবগুলোই মৌখিকভাবে বলবে? আর যদি কোনো কারণে দুই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হয়, তাহলে তার পদ্ধতি হলো, প্রথমে মৌখিকভাবে বলবে, এরপর চিঠি দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি দেয়া হয় তাহলে চিঠি দিবে, অন্যথায় নয়। এখন দুটি একত্রিত করার কারণে আমার পেরেশানি তো বেড়ে গেল, চিঠির মাঝে যে বিষয়ে লিখছ, তা বাদ দিয়ে ভিন্নভাবে অন্য কোনো কিছু মৌখিকভাবে বলতে চাচ্ছে. নাকি যা চিঠিতে লিখেছ, সে বিষয়টিই মৌখিকভাবে বলতে চাচ্ছে। তোমার এ কাজের কারণে অযথা এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ করা থেকে বিরত থাকবে। খুব বুঝে শুনে সর্তকতা অবলম্বন করে দুনিয়াতে চলতে হবে। একদম গাফেল হয়ে অথবা অবুঝের মতো চলা যাবে না। সর্বদা ফিকির রাখবে আমার কারণে অন্যের কষ্ট হচ্ছে কিনা? আমি অন্যের জন্য পেরেশানি বা অস্থিরতার কারণ হয়ে যাচ্ছি কিনা? তারপর লোকটি বলল, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার অসর্তকতার কারণে আপনার যে কষ্ট হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৫৭]

নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিষয়ের সংবাদ দেবে না

২৭. জনৈক ব্যক্তি ভুলের শিকার হয়ে কোনো এক সংবাদের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই অন্যের কাছে সংবাদ বর্ণনা করল। হযরত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হলে তাকে পাকড়াও করে বললেন, কোনোরূপ যাচাই না করেই, নিশ্চিতভাবে না জেনে কিভাবে তুমি এই সংবাদটি অন্যের কাছে বললে? বানিয়ে বলার অভ্যাস কি তোমার মাঝে আছে? নাকি যে কোনো বিষয় শোনা মাত্রই যাচাই বাছাই ছাড়াই অন্যের কাছে বলতে আরম্ভ করো? যখন তোমার মত বুঝ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরই এই অবস্থা, তাহলে অন্যদের অবস্থা কি হবে। তুমি তো ঐ সকল প্রবাদের মিসদাক বা সত্যায়নকারী হয়ে গেছ। অর্থ: যখন কা'বা থেকেই কুফরির উদ্ভাবন, তো এখন মুসলমানি আর কোথায়?[৫৮]

৫৭। আল ইযাফাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ২/২২

৫৮। আল ইযাফাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৬/৪

২৮. এক মৌলভী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত বললেন, তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক, অনেক লেখাপড়া করেছ, তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিখতে পারোনি? শুধু তোতাপাখির মতো মুখের বুলি আওড়িয়েছ, আর কিতাবের শব্দই পড়েছ। তা থেকে কিছু শিখতে পারলে না, যদি ভালোভাবে বুঝে-শুনে পড়তে, তাহলে এরূপ বেহাঙ্গামার মতো আর করতে না। তোমার প্রশ্নের কারণে আমার কষ্ট হয়েছে, তোমার এরকম ফিকির কেন? চিন্তাভ-াবনা ছাড়াই মুখে যা আসে তাই বলো, কথা বলার আগে মোটেও চিন্তা কারো না।

যখন তোমার মতো শিক্ষিত শ্রেণির মানুষেরই এই অবস্থা, তাহলে মূর্খ জনসাধারনের অবস্থা কি হবে? লোকটি বলল, হযরত ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন, ইনশাআল্লাহ সামনে থেকে কথা বলতে খুব চিন্তা ভাবনা ও অত্যন্ত সর্তকতার সাথে বলব। তখন হযরত বললেন, বড় আফসোসের কথা! তোমাদের এসব কাজ কারবার ও অবস্থার উপর কিভাবে ধৈর্য ধরা যায়। যদি তোমাদের এসব শুধরিয়ে দেই, অথবা সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করি, তাহলে আমার বদনাম কর, আবার যদি কিছু না বলি তাহলে তোমাদের ক্ষতি। কিছু বলতেও পারি না সহ্যও করতে পারি না। তবে সামনের জন্য অঙ্গীকার করে নাও যে, কথা-বার্তা বলতে খুব বুঝে শুনে কথা বলবে। পূর্বের সেই প্রশ্ন এখন আবার দ্বিতীয়বার করো দেখি। হযরতের নির্দেশের কারণে লোকটি দ্বিতীয়বার আবারো প্রশ্ন করল। এখন খুব সুন্দরভাবে সঠিক নিয়মে প্রশ্ন করল। হযরত তাকে বললেন, দেখেছ শুধু ফিকিরের অভাব। সামান্য ফিকিরের কারণে প্রশ্নটা কত সুন্দর হয়েছে। তোমার এই প্রশ্নটা আমার জন্য বুঝাও সহজ হয়ে গেছে আর আমার জন্য কষ্টের কারণও হয়নি। এজন্য আমি বলে থাকি ভুলের কারণ বুঝতে না পারা নয়, বরং সুচিন্তিত না হওয়া, তার প্রমাণ এই প্রশ্নটিই। না বুঝার কারণেই যদি ভুল হতো তাহলে এতো তাড়াতাড়ি প্রশ্নটি সঠিক হয়ে যেত না। কেননা, তার মূল কারণ হলো সুচিন্তিত না হওয়া।[৫৯]

কথা বলার সময় পরিপূর্ণ বলা

২৯. হযরত এক ব্যক্তির কোনো ভুলের কারণে পাকড়াও করে বললেন: যখন খানকায় আসো, এসে কথা অর্ধেক বলো, আর অর্ধেক কার জন্য রেখে দাও? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও লোকটি অসম্পূর্ণ উত্তর দিলো।

৫৯। আল ইযাফাতুল ইয়াওমিয়্যঅহ ৬/২৯

হযরত তাকে বললেন, আবারো তো পূর্বের কাজই করলে? লোকটি বলল, হযরত আপনি লেখালেখিতে ব্যস্ত তাই এমন করছি। হযরত তাকে বললেন, তোমার কথা শোনার জন্য আমার লেখা বন্ধ রাখতে হবে নাকি? আমার কাছে কি অদৃশ্যের সংবাদ আছে? তুমি কোন কিছু আমাকে জানানো ছাড়াই আমি জেনে ফেলব যে, অমুক লোক আমার কাছে এসে কিছু কথা বলবে, আর তার কথা শোনা জন্য আমাকে লেখা বন্ধ রাখতে হবে।

হযরতের এ কথা শুনে লোকটি আবারো তার কথা বলতে আরম্ভ করল। হযরত তাকে বললেন, আমি তো এখনও লিখছি, তাহলে এখন কথা বলা শুরু করলে কেন? তোমরা অবাস্তব কথা বলো আবার তা সত্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাকেও অস্থির করে ফেল। নিজেরাও অস্থিরতায় পড়ো আর আমাকেও অস্থিরতায় ফেল। বলার পরেও সোজা সুজি কথা বলো না, বানিয়ে বানিয়ে বলো। এতে তোমার কোন সমস্যা নেই, তোমরা নিজেরাই সমস্যায় পড়ো। লোকটি কিছু বলতে চাইলে, হযরত তাকে বললেন, দেখ! বিষয়টি আমি সহজ করতে চাচ্ছি, তুমি আর কথা বাড়িও না।

আমি তোমাদের নাড়ি ভুড়ির খবর জানি। তোমাদের ব্যাপারে আমার ভালো ধারণা আছে। যখন তোমাদের মতো শিক্ষিত মানুষদের অবস্থা এই তাহলে অন্যদের অবস্থা কি? নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো বিড়ালের মতো লুকানোর চেষ্টা করো, আর যখন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন অসত্য ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করো। তাহলে তোমাদের সংশোধন কিভাবে হবে? যে সমস্ত ভুল তোমরা লুকানোর চেষ্টা করো, এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কি? আমি সব কিছুই বুঝি, আমি দীর্ঘ সময় এ কাজের পিছনে ব্যয় করেছি। এগুলোর ব্যাপারে আমার ভালো অভিজ্ঞতা আছে। এখন কি বলতে চাচ্ছো বলো। লোকটি বলল, হযরত ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। সামনে থেকে খুব সতর্কতার সাথে কথা বলবো, হযরত বললেন, ক্ষমা তো করলাম, তবে ক্ষমা করার দ্বারা তোমার এ রোগ দূর হবে না। এটা তোমার অহমিকা রোগ, যার কারণে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো সর্বদা গোপন করার চেষ্ট করো। দ্রুত এই রোগের চিকিৎসা করো, তা না হলে এটা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। আমি চাই যাতে করে সহজেই রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়। তবে তোমরা নিজেরা নিজেরাই কঠোরতায় পড়ো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি করার আছে?।[৬০]

৬০। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৬/২৩

না ভেবে কথা বলাতে অধিক ভুল হয়

৩০. একজন আগন্তুককে হযরত সতর্ক করে বললেন, তুমি তোমার কথা নিজেও ভালোভাবে বলতে পারো না, আবার অন্যকেও বুঝাতে পারো না, এ অবস্থায় তোমার সাথে কথা বলা বেকার, যখন তুমি নিজের পরিচয়-ই দিতে পারছো না, তখন তুমি অন্যের কি পরিচয় করাবে, কথা বলার সময় এদিক সেদিক তুমি তাকাতাকি করছো। সামনে তোমার থেকে আর কি আশা করা যায়? এরকম লোকদের সাথে সম্পর্ক করাই উচিত নয়। যাও এখান থেকে চলে যাও, এরপর লোকটি তার সাথে থাকা লোকটির সুন্দরভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

হযরত তাকে বললেন, এইতো এখন খুব বুঝ বুদ্ধির সাথে সুন্দরভাবে পরিচয় করিয়ে দিলে। এতক্ষণ কোথায় ছিলো তোমার বুঝ বুদ্ধি? এত তাড়তাড়ি কিভাবে আমার কথা বুঝলে? অথচ একটু আগেই উল্টাপাল্টা করলে। আসলে এর মৌলিক কারণ হচ্ছে কথা-বার্তায় চিন্তা না করা, মনে যা আসছে বলে দিচ্ছে। এখন চিন্তা করে বলেছে তাই সুন্দরভাবে বলতে পেরেছে। এ রোগ এখন এত ব্যাপক যে, তা নিয়ন্ত্রণ করাই সম্ভব নয়। এখন একটু ধমক দেয়া হয়েছে সবকিছু চিন্তা করেই বলেছে। চাবুক ছাড়া তো ঘোড়াই চলে না, আর মানুষ কিভাবে চলবে।[৬১]

অসম্পূর্ণ কথা না বলা

৩১. একবার হযরত থানভী রহ. এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এসে বলল, হযরত আমাকে একটা তাবিজ দিন। হযরত তাকে বললেন, আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি। লোকটি খুব উচ্চস্বরে বলল, আমাকে একটা তাবিজ দিন। হযরত তাকে বললেন, আমি বধির নই যে, তোমার কথা শুনতে পাইনি, কথা শুনতে পেয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারি নি। এরপর লোকটি চুপ হয়ে গেলো।

হযরত তাকে বললেন, এখন বোবার মতো চুপচাপ বসে থাকলে কেন? কথা পুরোপুরি বলতে কি সমস্যা হয়? নাকি ঘর থেকে কসম করে এসেছ, গিয়ে যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে কোনো কথাই বলব না। লোকটি হযরতে কথা শুনে বলল, তাহলে কিভাবে বলব? হযরত তাকে বললেন, বাইরে যাও, গিয়ে কাউকে তুমি ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে বলবে কথা কি পূর্ণ হয়েছে? নাকি অসম্পূর্ণ রয়েছে? লোকটি বাহির থেকে ফিরে এসে বলল, হযরত আমার কথা অর্ধ সম্পন্ন হয়েছে, মাথা ব্যাথার তাবীজ দিন। হযরত বললেন, গ্রাম্য লোকেরা বাজারে,

[৬১]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৬/১৭২

অথবা রেল স্টেশনে গিয়ে অর্ধসম্পূর্ণ কথা বলে থাকে, যার পরিণাম হয় ঝগড়া আর হাঙ্গামা। তো যাই হোক এরকম কিছু লোক খানকায়ও আসে, এসে এভাবে অর্ধেক কথা বলে। এধরনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা অত্যান্ত জরুরি।

এখন যা অবস্থা দেখছি একটা তাবীজ তোমাকে দিতে হবে, আরেকটা আমাকে রাখতে হবে। তোমাদের মতো কিছু মানুষের জন্য আমিও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। খানকায় এসে কথা অর্ধেক না বলে পূর্ণ বলা কি তোমাদের জন্য অনেক বড় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়? লোকটি বলল, হযরত আমি তো একজন মূর্খ গ্রাম্য লোক, আমাদের বুঝ বুদ্ধি তো এমনই। হযরত তার কথা শুনে বললেন, তুমি অনেক চতুর। তোমার চালাকি কেবল না প্রকাশ পেল। আমরা তো ছোট শহরে বাস করি, আমাদের কথা তো এমনই।

এখন যাও এক ঘন্টা পর এসে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে তাবীজ নিয়ে যাবে। আবার যেন সময়ক্ষেপণ না হয়। আমি কথাগুলোর কোনো কিছুই ধরে রাখব না। লোকটি এক ঘন্টা পর এসে, তার কথার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে তাবীজ নিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় হযরত তাকে বললেন, এখন থকে কখনোই আমার এ কথা ভুলে যাবে না। যখনই যেখানে যাবে সেখানে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা স্পষ্ট ভাষায় পরিপূর্ণ বলবে, কখনোই কিছু বলবে, আর কিছু রেখে দিবে না।[৬২]

ঌ ৩৪৯ ৩

---

[৬২]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৬/৭৫

অধ্যায়-৫

কথা শোনার আদবসমূহ

আদবঃ মজলিসের কথাগুলো খুব মনোযোগের সাথে শোনবে। যদি কোনো কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে তাৎক্ষণিক দ্বিতীয়বার বক্তার কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে নিবে, কথা না বুঝে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করা ঠিক নয়। কারণ অকে সময় ভুল বুঝে আমল করার দ্বারা বক্তার কষ্ট হয়।

আদবঃ জনৈক ব্যক্তি হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলার জন্য কিছু সময় চাইল, হযরত তাকে বললেন, মাগরিবের নামাযের পর। মাগরিবের নামাযের পর হযরত লোকটিকে কাছে না পেয়ে একদিক সেদিক তাকালেন, তখন লোকটি একটু দূরে দেখতে পেলেন। তাই হযরত তাকে একটু উঁচু আওয়াজে ডাকলেন। লোকটি মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে নিজ জায়গা থেকে উঠে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত তার বিষয়টি বুঝতে না পেরে দ্বিতীয়বার আবারো ডাকলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর লোকটি সামনে এসে উপস্থিত হলো।

হযরত তাকে বললেন, আমি ডাকার পরও তুমি কোনো ধরনের সাড়া না দিয়েই চলে আসলে। আমি তোমার উত্তরের উপযুক্ত নই? উত্তর দিলে তো আহবানকারী বুঝতে পারে যে, যাকে আহবান করা হচ্ছে, সে আহবানকারীর আহবান শুনেছে। আর উত্তর না দিলে তো তার কষ্ট হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আহবান করার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়।

তোমার সামান্য অসাবধানতা-অলসতার কারণে অন্যের কষ্ট হয়। যদি উত্তর দিয়ে দিতে তাহলে কি এত বড় সমস্যা ছিলো? এখন তো ইলম অর্জনের শিক্ষা হয়, কিন্তু আখলাক অর্জনের শিক্ষা হয় না। এখন আমার মাঝে কিছুটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, অন্য কোন সময় আমি তোমার সাথে কথা বলব।

আদবঃ যখন কেউ সম্বোধন করে তোমাকে কথা বলে তখন তার কথা খুব মনোযোগ সহকারে শোন। মনোযোগ সহকারে কথা না শোনার কারণে বক্তার

মন ব্যথিত হয়। বিশেষ করে যে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছে, অথবা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এমনিভাবে যার সাথে তোমার ইসলাহের সম্পর্ক রয়েছে, তার কথা অমনোযোগী হয়ে শোনা আরো মারাত্মক অন্যায়।

আদবঃ যখন কেউ তোমার সাথে কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে জানতে চাইবে, তখন তুমি তার উত্তর হ্যাঁ বা না সুস্পষ্ট ভাষায় মৌখিভাবে জানিয়ে দিবে। এতে করে প্রশ্নকারীর অন্তর এক দিকে নিশ্চিত হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় প্রশ্নকারী তো মনে মনে ভাবছে যে, তুমি তার কথা শুনেছ, বাস্তবতায় তুমি তার কথা শোননি অথবা সে মনে মনে ভাবছে যে, তুমি এই কাজ করবে, অথচ সেইকাজ করার আগ্রহ তোমার নেই। এই জন্য কেউ সম্বোধন করে কিছু বললে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করা দরকার, অন্যথায় ভুল বুঝা বুঝির সৃষ্টি হয়।

কথা শোনার আরো কতিপয় আদব

১. যদি তোমার শিক্ষকের ব্যাপারে কেউ অশালীন কথা-বার্তা বলে, তাহলে তা শুনে চুপ থাকবে। যে বলছে তাকে কোনো কিছু বলবে না। কৌশল অবলম্বন করে পারলে তা বন্ধ করবে, আর যদি বন্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেখান থেকে উঠে চলে যাবে।[৬৩]

২. উস্তাদ যা বলবে তা খুব খেয়াল করে শুনবে এবং খুব মনোযোগ সহকারে উস্তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।[৬৪]

৩. শোনার পর যদি কোনো কথা বুঝে না আসে, তাহলে সেটাকে উস্তাদের অযোগ্যতা হিসেবে জানবে না, বরং নিজের বুঝতে কমতি মনে করবে।[৬৫]

শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়াদি না শোনা

৪. গান বাজনায় কখনোই কান দিবে না। কেননা, তা মুমিনের অন্তরকে নষ্ট করে ফেলে। এজন্য যে, মানুষের অন্তরে কু-প্রবৃত্তির প্রভাব রয়েছে, যখন গান বাজনা শোনে তখন তা আরো বৃদ্ধি পায়। আর সর্বস্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে যে কাজ করা হরাম, তার মুকাদ্দামা অর্থাৎ যে কারণে ঐ কাজে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটিও হারাম।[৬৬]

---

[৬৩] । ফুরুউল ঈমান পৃ. ১২
[৬৪] । ফুরুউল ঈমান-পৃ. ১২
[৬৫] । ফুরুউল ঈমান পৃ. ১২
[৬৬] । তালীমুদ্দীন

৫. স্বামী-স্ত্রীর নির্জনের কথা-বার্তা যদি তোমার কানে পৌছে, তাহলে তা থেকে তোমার কান বন্ধ করে নাও, অর্থাৎ তা শুনবে না।[৬৭]

৬. মহিলারা কথা বার্তা বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে, যাত করে তার আওয়াজ গাইরে মাহরাম পুরুষদের কানে না পৌছে।[৬৮]

৭. যদি কেউ তোমাকে উপদেশ দিয়ে কথা-বার্তা বলে, তাহলে তা খুব মনোযোগসহ শোন। অন্যথায় তার কথার অবমূল্যায়ন হয় এবং যে কথা বলছে তার অন্তর ব্যথিত হয়।[৬৯]

৮. যদি কেউ তোমাকে তার আপনজন ভেবে অন্য নামে ডাকে, আর তুমি তা অনুধাবন করতে পারো, তাহলে এ মনে করে চুপ থাকবে না যে, আমাকে আরো দু-একবার আহবান করুক; বরং তৎক্ষণাত নিজের নাম বলে দিবে এবং বলবে, আমি অমুক, তাহলে আহবানকারী অযথা অস্থির হবে না।[৭০]

৯. মজলিসের কথাবার্তা বা বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনবে, অন্যের সাথে বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। কেননা বয়ান চলাকালীন সময়ে অন্যের সাথে অনর্থক কথায় লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মজলিসের অসম্মান হয়। আর এটা বড় ধরনের বে-আদবি। [৭১]

১০. যদি কেউ তোমাকে আড়াল থেকে আহবান করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার আহবানে সাড়া দিয়ে বলবে, আমি আসছি, এমন যেন না হয় যে, তুমি তার কথা শ্রবণ করার পরও চুপ থাকলে, আর সে তোমাকে ডাকতে থাকল।[৭২]

১১. কেউ তোমাকে কোনো কাজের কথা বললে, আগে তা ভালো করে শুনবে, অতঃপর বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিবে। তাহলে অযথা তোমাকে অস্থিরতায় পড়তে হবে না। এরপর কাজটা সম্পাদন করে তাকে অবহিত করবে, এতে করে তাকে আর অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে না। আর তুমি নিজেও তোমার দায়িত্ব বোধ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে।[৭৩]

---

[৬৭] । আনফাসে ঈসা পৃ. ৩২৭
[৬৮] । ফরুউল ঈমান পৃ. ১২
[৬৯] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৩৭
[৭০] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৮৯
[৭১] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৮৩
[৭২] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৭৬
[৭৩] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৭২

১২. যদি কথা শোনার পর তা বুঝে না আসে তাহলে, তা আবার জিজ্ঞেস করবে, না বুঝেই বলবে না জ্বী, হ্যাঁ খুব সুন্দর বলেছেন। যদি অন্ধকারে অথবা আড়ালে থাকার কারণে তোমাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? তাহলে উত্তর এমন বলবে না যে, আমি; বরং পরিস্কার ভাষায় তোমার নাম বলে দিবে আমি অমুক, উদাহরণস্বরূপ মুহাম্মাদ খলিল।[৭৪]

কথা ভালোভাবে বুঝে উত্তর দেবে

১৩. হযরত বয়ানের একপর্যায়ে বলেন, ওঠা, বসা, চলা, ফেরা এসব বিষয়ের প্রতি খুব সর্তক দষ্টি রাখবে, যাতে করে তুমি অন্যের কষ্টের কারণ না হও। কখনো কথা-বার্তা পেঁচিয়ে গুচিয়ে বলবে না, স্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে যে কেউ কোনো বিষয়ে তোমার কাছে প্রশ্ন করলে কথা আগে ভালোভাবে বুঝবে এরপর উত্তর দিবে, যাতে করে বার বার জিজ্ঞেস করতে না হয়।[৭৫]

কথার উত্তর না দেয়া বে-আদবী

১৪. কথা শোনার পর তার উত্তর না দেয়া অনেক বড় বে-আদবি, এমনিভাবে দেরিতে উত্তর দিয়ে, অন্যকে অপেক্ষার কষ্টে ফেলাও অন্যায়।[৭৬]

কথা শোনার পর হ্যাঁ অথবা না বলে উত্তর দেয়া

১৫. জনৈক ব্যক্তি হযরতের কাছে কাগজের একটি টুকরা পেশ করলে হযরত তার উপর তাবীজ লিখে তা ব্যবহারের পদ্ধতি বলে দিলেন। লোকটি ব্যবহারের পদ্ধতির বর্ণনা শুনে হ্যাঁ বা না কোনোই উত্তর দিলো না। তাই হযরত তাকে বললেন, আমি যে ব্যবহার পদ্ধতির কথা বলেছি তুমি তা শোনতে পাওনি? লোকটি বলল, জ্বি শুনতে পেয়েছি। হযরত তাকে বললেন, তাহলে হ্যাঁ বা না বলে উত্তর দিলে না কেন? কমপক্ষে তো এতটুকু বলতে পারতে, খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। লোকটি উত্তরে বলল, হযরত আমি কানে কম শুনি। হযরত তাকে বললেন, তুমি বললে আমি ব্যবহার পদ্ধতির কথা শুনেছি। না শুনেই হ্যাঁ বললে কেন? প্রথমেই বলে দিতে পারতে যে, আমি কানে কম শুনি। আরেকবার আমার কথার উত্তর দাও। লোকটি বলল, আমি কম শুনেছি। এবার হযরত তাকে বললেন, যতটুকু শুনেছ এতটুকুর উত্তর দিতে, তাহলে তো

---

[৭৪] । রহমাতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৭৩
[৭৫] । কামালাতে আশরাফিয়া পৃ. ১৫০
[৭৬] । কামালাতে আশরাফিয়া পৃ: ১২৪

উত্তরদাতা নিশ্চিত হয়ে যেত যে, তুমি তার কথা শুনেছ। লোকটি বলল, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। হযরত তাকে বললেন সামনে থেকে এমন ভুল করবে না, খুব সতর্ক থাকবে। এই সমস্ত ভুল এক সময় কাহিনী ঘটনায় পরিণত হয়, যেমন এখন হয়েছে। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে হযরত বললেন, এসব সাদাসিদে মানুষদের কোনো ভুল বা দোষ নয়, দোষ হচ্ছে বড়দের। কারণ তারা কখনো এসব ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে না।

হযরতের এ কথা শুনে লোকটি বলল, জ্বি আপনারা পীর, যা ইচ্ছা হয় তাই বলুন, আপনাদেরকে বলার কেউ নেই? হযরত তার কথা শুনে বললেন, আল্লাহর বান্দা আমি তোমাকে মানবতা আর ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছি, আর তুমি আমাকে জালিম বানাচ্ছো। আমি কি তোমাকে খারাপ বা অন্যায় কথা বলেছি ?[৭৭]

৪০ ৫৪৪০ ৫৪

[৭৭]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা ৫/৭৪

অধ্যায়-৬

সাক্ষাতের আদবসমূহ

আদবঃ যদি কারো কাছে সাক্ষাতের জন্য অথবা প্রয়োজনীয় কিছু বলার জন্য যাও, সে সময় ব্যস্ততার কারণে তার সুযোগ না হয়, যেমন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছে, অথবা অযীফা পাঠ করছে, অথবা নির্জন কোনো জায়গায় অবস্থান করছে, অথবা কিছু লিখছে, অথবা ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, অথবা তার অবস্থার কারণে অনুভব হচ্ছে যে, এখন সাক্ষাৎ করলে তার জন্য কষ্ট হবে এবং সাক্ষাৎ করা তার জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে সালাম দেবে না এবং তার সাথে কথাও বলবে না, বরং ফিরে যাবে। যদি পরবর্তীতে সুযোগ হয়, তখন বলবে; আর যদি অতিব প্রয়োজনীয় কোনো কথা হয়, যা না বললেই নয়, সে ক্ষেত্রে যদি অনুমতি দেয় তাহলে অপেক্ষায় থাকো। যখন সে অবসর হবে তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের প্রয়োজনের কথা বলবে।

আদবঃ কারো কাছে গিয়ে সালামের মাধ্যমে অথবা কথার মাধ্যমে অথবা তার সামনে বসে, মোটকথা যে কোনো পদ্ধতিতে হোক তোমার আগমনের সংবাদ তাকে জানিয়ে দাও। আড়ালে এমন কোনো জায়গায় চুপচাপ বসে থাকবে না যে, সে তোমার আগমনের ব্যাপারে অনবগত।

কেননা হতে পারে সে এমন কিছু বলার ইচ্ছা করেছে, যে ব্যাপারে তুমি অবগত না হও। সন্তুষ্টি ছাড়া তার গোপন কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া মারাত্মক অন্যায়, এজন্য যদি কারো কথা-বার্তা তুমি বুঝতে পারো যে, সে তোমার আগমনের ব্যাপারে অবহিত না হয়ে কথাগুলো বলছে, তাহলে দ্রুত সেখানে থেকে সরে যাও।

অথবা সে তোমাকে ঘুমন্ত ভেবে কথা বলছে, অথচ তুমি জাগ্রত তাহলে তোমার জাগ্রত থাকার বিষয়টি তাৎক্ষণিক প্রকাশ করো। তবে হ্যাঁ যদি কারো মুসলমানের ক্ষতিসাধনের ব্যাপারে কথা বলে, অথবা কাউকে হত্যার বিষয়ে কিছু বলে, তাহলে তাকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য চুপ করে শোনাতে কোনো অসুবিধা নেই।

আদবঃ যে পারিবারিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়াতে লজ্জিত হয়, তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, তাকে টাকা পয়সা, বাড়ি ঘরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে না। এমনিভাবে তার পোষাক আশাক, বেতন ভাতা স্বর্ণালংকারের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করবে না।

আদবঃ যদি কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাও, তাহলে সেখানে গিয়ে দীর্ঘ সময় থেকো না, অথবা লম্বা চওড়া আলাপ শুরু করে দিও না। কেননা হতে পারে সে বিরক্ত হবে, অথবা তার জরুরী কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

আদব : মেহমানের জন্য উচিত মেজবানের অনুমতি ছাড়া অন্যের দাওয়াত গ্রহণ করবে না।

সাক্ষাতের আরো কতিপয় আদব

১. কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করো, এতে করে সে আনন্দিত হবে।[৭৮]

২. নতুন কোনো জায়গায় গেলে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই কয়েকটি বিষয় জানিয়ে দিবে, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? কোথায় থেকে এসেছ? কেন এসেছ? [৭৯]

৩. কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাকে কোনো কাজে ব্যস্ত দেখলে তাৎক্ষণিক তার সাথে কথা-বার্তা জুড়ে দিও না; বরং তার সুযোগের অপেক্ষায় থাকো। যখন সে কাজ থেকে অবসর হয়ে তোমার প্রতি মনোবিবেশ করবে, তখন তুমি তোমার কথা বলো।

৪. কারো কাছে এমন সময় সাক্ষাতের জন্য যাবে না, যখন তার নির্জনে যাওয়ার সময়। কেননা সে সময় সাক্ষাৎ করা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৮০]

৫. কারো সাক্ষাতে গিয়ে তার সামনে যদি কোনো লিখিত কাগজ থাকে তাহলে তা উঠিয়ে দেখা আদৌ উচিত নয়। যদি সেটা লিখিত কাগজ হয়, তাহলে হতে পারে তাতে গোপনীয় কোনো কিছু লেখা আছে। আর যদি ছড়নো কিতাব হয়, তাহলে হতে পারে গোপন বিষয়ে লিখিত কোনো কাগজ তার মাঝে রাখা আছে।[৮১]

৬. কেউ তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসলে মজলিসে জায়গা না থাকা সত্ত্বেও তুমি একটু জড়োসড়ো হয়ে বসবে। এতে করে সাক্ষাৎকারীর প্রতি তোমার সম্মান পদর্শন করা হবে।[৮২]

---

[৭৮]। তালীমুদ্দিন পৃ ১০২
[৭৯]। ইযাফত পৃ. ২৬৫
[৮০]। কামালাত ১/১৯৬
[৮১]। বয়ানাত ১০/৪-৫
[৮২]। তালীমুদ্দীন ১১

৭. কেউ সাক্ষাৎ করতে আসলে, নম্র-ভদ্র হয়ে সুন্দরভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করো।[৮৩]

৮. ভালো করে স্মরণ রাখবে যখন কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে, তখন সালাম, মুসাফাহার মাধ্যমে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। পশুর মতো চুপচাপ এসে বসে পড়বে না।[৮৪]

৯. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত যখন কোনো নতুন জায়গায় যাবে, গিয়ে প্রথম সাক্ষাতের সময় নিজের প্রয়োজনীয় পরিচয় দিয়ে দিবে, মেজবানের জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায় থাকবে না। পাশাপাশি যে উদ্দেশ্যে এসেছ সেটাও মেজবানকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিবে। আর মেজবানের কর্তব্য হলো, সে এ কাজের জন্য সময় সুযোগ করে দিবে, অর্থাৎ সাক্ষাতের জন্য সময় দিবে। নিজের ব্যস্ততা ছেড়ে তার কাছে এসে বসবে।

১০. এক নব আগন্তুক খানকায় এসে কোনোরূপ কথা-বার্তা না বলে হযরতের সাথে মুসাফাহা করে চলে যেতে লাগল। হযরত তার এ অবস্থা দেখে বললেন, ভাই এটা কোন ধরনের মানবতা? নিজে মুসাফাহা করে খুশি হলে, আর অন্যকে অস্থিরতায় ফেললে।

নতুন কোনো মানুষ আসলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে লোকটি কে? কোথায় থেকে এসেছে? কি উদ্দেশ্যে এসেছে? তুমি কি আমাকে মূর্তি ভেবেছ? লোকটি উত্তরে বলল, হযরত আমার জানা ছিলো না, আমি বুঝতে পারিনি। হযরত বললেন, এখানে জানা না জানার কি হলো? এটা তো স্বভাবগত বিষয়।[৮৫]

১১. অনেক লোক এমন আছে যারা নিজের আগমনের ব্যাপারে মেজবানকে অবগত না করেই খাবারের সময় এসে উপস্থিত হয়। ঐ সময় খানা প্রস্তুত করা মেজবানের জন্য বড় কষ্টের কারণ হয়।

যদি যথাসময়ে পৌঁছতে পারো, তাহলে পৌঁছা মাত্রই মেজবানকে অবহিত করবে, আর যদি যথা সময়ে পৌঁছতে সক্ষম না হও তাহলে নিজেই খাবারের ব্যবস্থাপনা করে নিবে। খাবারের পর্ব শেষ করে তার কাছে যাবে, আর পৌঁছা মাত্রই মেজবানকে বলে দিবে যে, আমি খাবার সম্পন্ন করে এসেছি, খাবারের ব্যবস্থাপনার কোনো প্রয়োজন নেই।[৮৬]

---

[৮৩]। তা'লীমুদ্দীন ৯৯
[৮৪]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৫/৩৪৪
[৮৫]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৫/৪৫৯
[৮৬]। ইসলাহুল ইনকিলাব পৃ. ২৫৮

অধ্যায়-৭

মেহমানের আদবসমূহ

আদব: যদি তুমি কারো মেহমান হও আর রোযা থাকার কারণে, অথবা তুমি খেয়ে এসেছ, অথবা অন্য কোনো কারণে তোমার খাবারে আগ্রহ নেই তাহলে তাৎক্ষণিক এ বিষয়টি মেজবানকে জানিয়ে দাও যে, এ মহূর্তে আমার খাবারের আগ্রহ নেই। এমন যেন না হয় যে, মেজবান খুব গুরুত্বের সাথে কষ্ট করে তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থাপনা করল, আর যখন খাবার উপস্থাপন করল, তখন তুমি বললে যে, আমার খাবারের চাহিদা নেই। এতে করে মেজবান ব্যথিত হয়, আর তার কষ্টে প্রস্তুত করা খাবারগুলো নষ্ট হলো। (এজন্য এ সকল আদবের প্রতি সকলেরই খুব লক্ষ্য রাখা দরকার)

আদব: মেহমানের উচিত যদি তার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মেজবানকে জানিয়ে যাবে, যাতে করে খাবারের সময় তোমাকে তালাশ করতে গিয়ে মেজবানকে অযথা অস্থিরতার স্বীকার হতে না হয়।

আদব: মেহমানের জন্য আবশ্যক হলো সে মেজবানের অনুমতি ছাড়া অন্যের দাওয়াত গ্রহণ করবে না।

আদব: কোথাও মেহমান হয়ে গেলে, সেখানকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কখনোই নিজেকে জড়াবে না। তবে হ্যাঁ মেজবান যদি কোনো কাজের দায়িত্ব দেন, তাহলে তা সম্পাদন করাতে কোনো সমস্যা নেই।

আদব: একজন তালিবে ইলম মেহমান আসলো। সে পূর্বেও এসে সাধারণ অন্য এক বাড়িতে থাকত। তবে এবার এসে সে খানকায় অবস্থানের ইচ্ছা করলো ; কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কথা কারো কাছে প্রকাশ করল না। এজন্য তার জন্য খানাও পাঠানো হলো না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করার পর জানা গেল যে, সে অনাহারে রয়েছে। এরপর তাকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, তুমি যে এখানে থাকবে এবং খাবার খাবে এ কথা পূর্বেই তোমার জানিয়ে দেয়া উচিত ছিলো। তা না হলে তোমার প্রয়োজনের কথা আমরা কিভাবে বুঝব? কারণ তুমি এর আগে অন্য বাড়িতে থাকতে। এজন্য তোমার ইচ্ছার কথা পূর্বেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া উচিত ছিলো।

আদব: মেহমানের জন্য অনর্থক কথা-বার্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। একবার এক মেহমান অন্য আরেক মেহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন খাবার প্রস্তুত হয়েছে?

আদব: এক মেহমান মেজবানের খাদিমকে বলল, এই ! পানি দাও। হযরত তার নির্দেশসূচক বাক্য শুনে বললেন, কাউকে আদেশ করার অভ্যাস পরিত্যাগ করা খুবই জরুরি। তুমি এভাবে বলতে পারতে, দেখ তো পানি দেয়া যায় কিনা?

আদব: মেহমানের জন্য উচিত যদি কম মরিচ খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়, অথবা কোনো কিছু না খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে মেজবানের বাড়িতে পৌছা মাত্রই তাকে অবহিত করবে। এতে কোনো প্রকার লৌকিকতার আশ্রয় নিবে না। কিছু লোক এমন আছে তারা খাবার সামনে আসার পর এ সমস্যার কথা বলতে শুরু করে, যা কখনো উচিত নয়।

আদব: একবার এক লোক খানকায় আসলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো যে, আমার সাথে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি অন্য আরেক জন, যে খানকায় আসা-যাওয়া করে তার কাছে কিছু প্রয়োজন ছিলো, সে প্রয়োজনও সেরে নিবেন। ঘটনাক্রমে লোকটি সেদিন খানকায় আসেনি, তাই তাকে বলা হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয়তোবা তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক তাকে নিয়ে তেমন একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি।

কিন্তু আরো কয়েকজন মেহমান ছিলো, তাদের মাঝে কেউ কেউ অন্য কোনো প্রয়োজনে চলে গেল। তারা আসতে অনেক্ষণ বিলম্ব করল। লোকজন খানা নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করার কারণে তারা বিরক্ত হয়ে গেল। যার কারণে আরো কিছু সমস্যা হলো এবং মেজবান কষ্ট পেল। এজন্য উচিত হলো, যেখানে কোনো প্রয়োজনে যাবে, সেখানে একাধিক কাজ রাখবে না। কেননা, অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাঘাত ঘটে এবং অন্যের কষ্ট হয়।

আদব: আরেকজনের ঘটনা, ইশার নামাযের পর সে বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, গায়ে দেওয়ার একটি লেপ কেনার জন্য। তাকে বলা হলো, তুমি ফিরতে অনেকক্ষণ দেরি হবে, আর ততক্ষণে মাদরাসার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি এসে ডেকে অনর্থক সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে কষ্ট দিবে। সারা দিন কি করেছ? অযথা সময় নষ্ট করেছ, আর দিন ভর ঘুমিয়েছ। ঘুমানোর সময় হয়েছে এখন লেপের কথা মনে পড়েছে? এ বলে তাকে একটা কাপড় দিয়ে বলা হলো, এখন ঘুমাও, আগামীকাল দিনে গিয়ে লেপ নিয়ে এসো। আর মনে রাখবে, প্রয়োজনীয় কাজ যথাসময়ে করা জরুরী, অন্যথায় বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয়।

আদবঃ কারো বাড়িতে মেহমান হলে তাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিবে না, কেননা অনেক সময় এমন হয় যে, জিনিষ তো আছে কিন্তু সময়ের অভাবে তা জোগাড় করা সম্ভব হয় না, যার কারণে মেজবান তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং অনর্থক তাকে লজ্জা পেতে হয়।

আদবঃ মেহমানের জন্য উচিত পেট ভরে গেলে কিছু তরকারী -রেখে দিবে। যাতে করে মেজবানের এই সন্দেহের সৃষ্টি না হয় যে, সম্ভবত মেহমানের খাবার কম পড়েছে, যার কারণে সে অযথা লজ্জিত হবে।

আদবঃ যে ব্যক্তি খাবারের জন্য যাচ্ছে, অথবা খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তার সাথে খাবারের স্থান পর্যন্ত যাবে না। কেননা মেজবান লজ্জার কারণে তোমাকেও খাবারের জন্য অনুরোধ করবে, অথচ তার মন এতে সন্তুষ্ট নয়।

অনেক লোক এমন আছে, তারা এমন সময় মেজবানের কথা শোনা মাত্রই দাওয়াত কবুল করে নেয়। এমতাবস্থায় তুমি মেজবানের সন্তুষ্টি ছাড়াই খাবার খেলে। আর যদি তুমি তার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে সে অপমানিত হবে। তাছাড়াও খাবারের স্থান পর্যন্ত উপস্থিতি মেজবানের অস্থিরতার কারণ হয় এবং এতে সে কষ্ট পায়।

আদবঃ যদি কারো বাড়িতে কোনো প্রয়োজনে যাও যেমন কোনো বুযুর্গ থেকে দোয়া চাওয়ার জন্য, অথবা বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাহলে এমন এক সময় তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে, যাতে করে সে তোমার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

অনেকে এমন আছে, যারা বিদায়ের সময় নিজের প্রয়োজনের কথা বলে। এতে করে তার প্রয়োজন পূর্ণ করা বাড়িওয়লার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়। কারণ একদিকে সময় কম, অন্য দিকে মেহমানের বিদায়ের সময়। এমনও তো হতে পারে যে, এত অল্প সময়ে তার প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কেননা বাড়িওয়ালা তার কাজ ছেড়ে মেহমানের আদেশ রক্ষা করাকে অপছন্দ করছেন। তাই বাড়িওয়ালা এক ধরনের মসিবতে পড়ে। আর অযথা কাউকে মুসিবতে ফেলা উচিত নয়।

বরকত অর্জনের জন্য যদি কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে স্মরণ রাখবে যে, এমন জিনিস চাইবে যে জিনিসটা তার কাছে অতিরিক্ত। তবে এর জন্য সহজ পদ্ধতি হলো, তাকে কোনো জিনিস দিয়ে বলবে, আপনি ব্যবহারের পর আমাকে দিবেন।

মেহমানের আরো কতিপয় আদব

১. যদি কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত করা হয়, আর মেজবান মেহমানের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাবার প্রস্তুত করে, তাহলে মেহমানের জন্য উচিত হলো, সে সবগুলো থেকে কিছু না কিছু খেয়ে নিবে। এতে করে মেজবানের অন্তর খুশি হবে। তবে হ্যাঁ যদি অসুস্থতার কারণে কোনো খাবার স্বাস্থের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, অথবা ডাক্তার নিষেধ করে, তাহলে সেগুলো খাবার থেকে বিরত থাকবে।[৮৭]

খাওয়ার সময় জটিল কথা না বলা

২. খাবারের জন্য বসে অনেক কঠিন করে, জটিল কথা-বার্তা বলবে না, বরং সাদামাটা কথা বলবে। তা না হলে খাবারে মাজা থাকে না। খাবারের সময় খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার। যদি কেউ আজে-বাজে কথা বলে, তাহলে আমি তার কথার দিকে মোটেও কান দেই না। কেননা এতে খাবারের স্বাধ বাকি থাকে না।[৮৮]

মেহমান দস্তরখান থেকে অন্যকে দেয়া জায়েজ নেই

৩. ফুকাহায়ে কেরামগণ লিখেন. যদি ভিক্ষুক এসে খাবারের সুওয়াল করে, তাহলে মেহমানের জন্য জায়েয নেই দস্তরখানা থেকে কিছু উঠিয়ে দেয়া। এমনিভাবে খাবারের জন্য যে পাত্র দেয়া হয়েছে সে পাত্রেই খাবার খাবে। যদি অন্য পাত্র নিজের পক্ষ থেকে আনে, তাতে খাবার জায়েয নেই। তবে যদি স্বাদ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, যেমন - দই বা ফিরনির পাত্র দেয়া হয়েছে, তাহলে তাতে খাওয়া জায়েয আছে। এমনিভাব যদি খাবারের কয়েকটি মজলিস হয়, আর নিজ মজলিসে খাবার কম পড়ে, তাহলে নিজর সামনে থেকে দিতে পারবে। অন্য মজলিসে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দিবে না।[৮৯]

অন্যের উপর নিজের বোঝা চাপানো উচিত নয়

৪. যদি কারো কোনো কাজে যাও এবং সেখানে থেকে অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তাকে জানিয়ে দিবে, আমি এখানে অন্য এক কাজে এসেছি। তাহলে সে তোমাকে মেহমান মনে করে নিজ কাজের ক্ষতি করবে না। আর তোমার আগমন তার জন্য অস্থিরতার কারণও হবে না।[৯০]

৮৭। আল ফাজলু ওয়ালওয়াসল পৃ. ২৯৫

৮৮। কামালাতে আশরাফিয়া পৃ৪

৮৯। জাদিদ মালফুজাত পৃ . ১৮০

৯০। রাহমতুল মুতাআল্লিমিন পৃ. ৮০

৫. কারো জন্য উচিত নয় যে, সে এমন এক সময় অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাবে, যে সময় সে বিশ্রামের ইচ্ছা করেছে, কেননা এতে করে তার কষ্ট হয়।[৯১]

আমাদের সামাজিকতা

৬. এখন আমাদের সামাজিকতা নতুন রূপ নিয়েছে, যদি মেহমানের কাছে অবস্থানের সময় জানতে চাওয়া হয়, তাহলে মেহমান এ প্রশ্নকে অভদ্রতা মনে করে ক্রোধান্বিত হয়। এমনিভাবে অনেক মেহমান তো এমন আছে, যারা নিজে নিজেই খাবারের ব্যবস্থাপনা করে, কিন্তু মেজবানকে অবগত করায় না।

অন্যদিকে মেজবান বেচারাটা কষ্ট করে, সময় নষ্ট করে, টাকা পয়সা খরচ করে খাবার তৈরী করেছে। যখন খাবার পেশ করা হয়, তখন বলে খাবার আমার সাথে আছে। এর দ্বারা মেজবান সীমাহীন ব্যথিত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য খাবার সাথে থাকলে মেজবানকে পূর্বেই জানিয়ে দেয়া চাই।

এক ব্যক্তির ঘটনা: সে একবার আমার কাছে মেহমান হলো, সাথে সে খাবর নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে বিষয়টি আমাকে অবগত করায়নি। যখন খাবারের সময় হলো, তার সামনে খানা উপস্থিত করা হলো, তখন সে তার সাথে থাকা খাবার বের করল। হযরত তার কাছে খবার দেখে বললেন, আপনি আমাকে পূর্বেই অবগত করতে পারতেন, তাহলে অনর্থক আমার টাকা পয়সাও ব্যয় হত না, আর কষ্টের সম্মুখীন হতাম না। আপনি যেহেতু আমাকে পূর্বে অবগত করাননি, এবং কষ্ট দিয়েছেন এই জন্য আপনার খাবার অন্য কোথাও গিয়ে খাবেন, এখন আমার খাবার খেয়ে নিন।

তিনি আরো বললেন, যখন আমি সফর করার ইচ্ছা করি এবং সাহারানপুরে কিছু সময় অবস্থান করতে হয়, তখন খাবারের চাহিদা থাকলে পূর্বেই অবহিত করাই, অথবা বলি, খাবার আমার সাথেই রয়েছে, আমি অমুক জায়গায় গিয়ে খেয়ে নিব, অথবা মেজবানের কাছে পৌঁছা মাত্রই তার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়ে বলি, খাবারে সময় হলে এই খাবার এবং বাসার খাবার মিলে খাবার খেয়ে নিব। এতে করে মেজবানকে অযথা অস্থিরতায় পড়তে হয় না এবং খাবার তৈরীর জন্য অহেতুক মেজবানকে ঝামেলা পোহাতে হয় না। এমনিভাবে খাবার সাথে নিয়ে গেলে মেজবানেরও সমস্যার সৃষ্টি হয় না।[৯২]

৭. হযরত কোনো এক মুরিদকে বললেন, যদি জুমআর দিন আসো, তাহলে নিজেই খাবারের ব্যবস্থাপনা করে আসবে, আর যদি অন্য কোনদিন আসো,

---

[৯১]। কামালাতে আশরাফিয়া পৃ. ১২৬

[৯২]। কামালাতে আশরাফিয়া পৃ. ৯

তাহলে যখন সম্ভব হবে তখন আমি মেহমানদারী করাব। আর সম্ভব না হলে তুমি নিজেই খাবারের ব্যবস্থা করে নিবে, আমার উপর ভরসা করে বসে থাকবে না।

আমি সকলকেই বলে থাকি যারা জুমাআর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আসে, তারা আমার মেহমান নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের খাবারের ব্যবস্থাপনা করবে। তারা তো কেবল জুমআর নামাজের উদ্দেশ্যে এসেছে, আর তাছাড়া আশপাশের মহল্লা থেকে অনেক লোক সমবেত হয়। এত লোকজনের খাবারের ব্যবস্থপনা বড়ই কঠিন কাজ।

এজন্য খুব স্মরণ রাখবে, যারা আশপাশ থেকে আসবে, তারা নিজেরাই নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা করেই আসবে, আর যদি এমন ভেবে আসো যে, সেখানে গিয়ে খেয়ে নিব, তাহলে এমনও হতে পারে যে, ক্ষুধার্ত হয়েই ঘরে ফিরতে হবে। তবে হ্যাঁ যারা দূর থেকে আসবে তাদের মেহমানদারীর দায়িত্ব আমার, যেদিন-ই তারা আসুক না কেন? [৯৩]

মেহমান অন্যকে অতিথি বানানো জায়েয নেই

৮. এক মৌলভী সাহেব যিনি অত্যন্ত খোদাভীরু এবং এক প্রসিদ্ধতম মাদরাসার মুদাররিস ছিলেন। তিনি কোনো এক সময় আমার মেহমান হলেন। যখন তার সামনে খাবার পেশ করা হলো, তখন তিনি দস্তরখানায় আরেক জনকে বসিয়ে দিলেন, তিনি আমাকে পূর্বে অবগত করালেন না। অথচ এ কাজ শরীয়ত বিরোধী, সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ-ই নেই। আলেমরাও এখন সমাজের সাথে মিশে গেছে। আব্দুস সাত্তার তাকে বললেন, মাওলানা এটা জায়েয নেই যে, একজন মেহমান মেজবানকে অবহিত না করেই অন্যজনকে মেহমান বানাবে। কেননা, মেজবান তার জন্য যে খানা পাঠিয়েছে তার মালিক তো মেহমান নয়। এই খাবার শুধু তার জন্যই পাঠানো হয়েছে। এখন ঐ খাবারে অন্যকে শরিক করতে হলে অবশ্যই মালিকের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। এ কথা বলার পরেও মেহমান ঐ লোকটিকে উঠাল না, শুধু এটুকু বলাকেই যথেষ্ট মনে করলেন যে, পরে আমি অনুমতি নিয়ে নিব। পরে বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবহিত হলে, তার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু সে আর আমার কাছে অনুমতি গ্রহণ করেনি। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হলো।

তাকে আমি একথাও বললাম, এ যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে যারা সাধারণ মানুষ তাদের অবস্থা কি হবে? এই সাধারণ বিষয়গুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখা দরকার।[৯৪]

---

[৯৩]। মজলিসুল হিকমাহ ১৩৬

[৯৪]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ২

মাওলানা মুজাফফর হোসাইন রহ.-এর ভালো গুণ

৯. মাওলানা মুজাফফর হোসাইন রহ. যেখানে যেতেন সেখানে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন, ভাই আমি আপনার মেহমান, একদিন অথবা দুইদিন আপনার এখানে অবস্থান করব। একবার এই বুযুর্গ মাওলানা গাংগুহী কুদ্দিসা সিররুহু-এর মেহমান হলেন। গাংগুহী রহ. মাও. মুজাফফর সাহেবকে নাস্তার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে বললেন। মাও. মুজাফফর সাহেব তাকে বললেন, ভাই আমি রামপুরে যাব, অনেক দূরের সফর, নাস্তার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে, আমার সফরে বিলম্ব হবে। তাই নাস্তার জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে, হ্যাঁ যদি রাতের খাবার থাকে তাহলে নিয়ে আসেন, আমি সেগুলো দিয়ে পথেই নাস্তা সেরে নিব।

মাওলানা গাংগুহী রহ. মাশকালায়ের ডাল আর বাশি রুটি উপস্থিত করলেন। মাও. মুজাফফর সাহেব সেগুলো এক কাগজে পেঁচিয়ে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং পথেই নাস্তা করে নিলেন। যখন তিনি রামপুরে পৌঁছলেন তখন তিনি হাকিম জিয়া উদ্দীন সাহেবকে বললেন, ভাই মৌলভী রশিদ আহমদ সাহেব বড় ভালো মানুষ। হাকিম সা. বললেন বড় বুযুর্গ মানুষ। মাও. মুজাফফর সাহেব বললেন, ভাই আমি তার বুযুর্গির প্রশংসা করছি না, আমি বলেছি সে বড় ভালো মনুষ, যদি আমার কথার অর্থ বুঝতে না পারো, তাহলে জিজ্ঞাসা করো, আমি বলে দেই।

হাকিম সাহেব বললেন, ভালো কথা, হযরত তাহলে বলুন আপনার ঐ কথার অর্থ কী? তখন মাও: মুজাফফর সাহেব বললেন, দেখুন তিনি কিরূপ সরলমনা সাদাসিদে মানুষ। আমাকে বললেন, নাস্তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি তাকে বললাম, অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, যে খাবার প্রস্তুত আছে সেটিই নিয়ে আসুন। মৌলভী সাহেব কোনো ধরনের লৌকিকতার পথ অবলম্বন না করে যা ছিলো তাই নিয়ে উপস্থিত করলেন।

আমি এ জন্যই বলেছি যে, সে বড় ভালো মানুষ।[৯৫]

রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.-এর ঘটনা

১০. রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. একবার মাও. ইয়াকুব সাহেব রহ. এর ছেলে হাকিম মঈন উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে মেহমান হলেন। তিনি বড় সাদামাটা লোক ছিলেন। তিনি কখনোই কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পছন্দ করতেন না।

---

[৯৫]। হুসনুল আজিজ ৪/৪১৪

ঘটনাক্রমে ঐ দিন তার বাড়িতে খাবারের কোনো কিছুই ছিলো না। তাই খোলা মনে তিনি বললেন, হযরত আজ আমাদের বাড়িতে খাবারের কোনো কিছুই নেই, ঘরের সকলেই অনাহারে। তবে অনেকে আপনাকে দাওয়াত দেয়ার জন্য এসেছে, আপনি অনুমতি দিলে আপনার পক্ষ থেকে আমি দাওয়াত গ্রহণ করতে পারি। হযরত গাংগুহী রহ. তাকে বললেন, ভাই আমি আপনার মেহমান, আপনার যেই অবস্থা আমারো সেই অবস্থা। এরপর তিনিও তাদের সাথে অনাহারেই কাটিয়ে দিলেন।[৯৬]

শায়েখের নিকট মেহমানের আশা করা ভুল

১১. জনৈক ব্যক্তি একবার মেহমান সম্বন্ধে হযরতকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, হযরত আমরা আমাদের বুযুর্গদের দেখেছি যে, তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যে মেহমানগণ আসতেন, সে মেহমানদের খাবারের ব্যবস্থা ঐ বুযুর্গই করতেন, আর আপনার এখানে মেহমানগণ আসেন, তাদের নিজেদেরকেই খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। আপনার মাঝে এবং তাদের মাঝে এই বৈষম্যের কারণ কি? হযরত উত্তরে বললেন, ভাই! এই বৈষম্যের অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্য হতে অন্যতম হলো, তারা অনেক বড় মাপের বুযুর্গ এবং উচ্চ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। আর আমি তো তাদের মতো হতে পারিনি এবং স্বভাবগতভাবে অনেক দুর্বল, যার কারণে এ ব্যবস্থা করা আমার জন্য সম্ভব হয়নি।

এ সকল বুযুর্গ মেহমানদের খবর নিতে পারতেন, কিন্তু আমি তো তা পারি না। এখানের কাজ হলো আসো, শিখো, সুযোগ থাকলে খাও নাহলে এমনিতেই চলে যাও, এখানে হাদিয়া, তোহফা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।[৯৭]

১২. মেহমানের আদব হলো, তুমি যার মেহমান হবে, তাকে তোমার অবস্থা এবং মামুল সম্পর্কে পূর্বেই জানিয়ে দিবে। এমন যেন না হয় যে, যখন তোমাকে খাবারের জন্য ডাকা হলো, তখন তুমি খাবারের দস্তরখানায় তোমার মামুল বয়ান করা শুরু করলে। এরূপ করা খুবই মন্দ কাজ, এমন করার দ্বারা মেজবানের অন্তর ব্যথিত হয়।[৯৮]

১৩. খাবারের সময় অন্যান্য সকল চিন্তা থেকে নিজের মন মস্তিস্ক বিরত রাখবে। এক জাগায় কোনো এক ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শুরু করে

---

[৯৬] । হুসনুল আজিজ ৪/৪১৫

[৯৭] । হুসনুল আজিজ ৩/৯

[৯৮] । ওয়াযে আসলো পৃ.৪৪

দিলো, আমি তাকে বললাম, ভাই এটা খাবারের মজলিস, প্রশ্ন উত্তরের নয়, তাই একটু শান্তি মতো খেয়ে নিন।

মেজবানের পক্ষ থেকে তোমার জন্য পাঠানো পান অন্যকে খাওয়াবে না

১৪. মেজবান মেহমানের জন্য পান পাঠালে সে পান অন্যকে খাওয়াবে না অথবা তার জন্য ভিন্নভাবে পানও চাইবে না, এতে মেজবান অনেক সময় বিরক্তিবোধ করে।[৯৯]

মেজবানের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো আদৌ উচিত নয়

১৫. মাশায়েখ এবং ওলামায়ে কিরামদের এ কথার প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই যে, তাদের সাথী-সঙ্গী ও খাদেমদেরকে নিয়ে মেজবানের বাড়িতে উঠে মেজবানের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে না। মোটকথা অন্যের মালের ব্যাপারে খুব সর্তক দৃষ্টি রাখা, যাতে করে আমার কারণে অন্যের টাকা পয়সা অনর্থক নষ্ট না হয়। এ সমস্ত কাজ সঠিক পদ্ধতিতে না হওয়ার কারণেই আমাদের সামাজিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে।[১০০]

গ্রামের লোকেরা অনেক ভালো

১৬. এজন্য আমি বলে থাকি গ্রামের মানুষ এ ব্যাপারে অনেক সতর্ক, তারা কখনো নিজেদের সাথে আরেকজনকে অতিথি বানিয়ে মেজবানের উপর ঝামেলা সৃষ্টি করে না। খাবারের কথা বললেই তারা উঠে চলে যায়।[১০১]

৯৯। আত তাবলীগ নং ২০

১০০। তারযীহুল আখেরা ২৩৫-২৩৬

১০১। তারজীহুল আখেরাত পৃ. ২৩১

অধ্যায়-৮

মেজবানের অদবসমূহ

আদব: লৌকিকতার সাথে মেহমানকে খাবারের জন্য তাগিদ দেয়া উচিত নয়। আর এতে কোনো প্রকার মঙ্গলও নেই।

আদব: খাবারের দস্তরখানায় তরকারির প্রয়োজন হলে, যারা খাবার খাচ্ছে, তাদের সামনে থেকে পাত্র নিয়ে যাবে না, বরং তরকারি আনার জন্য অন্য পাত্র ব্যবহার করবে।

আদব: তোমার মুরুব্বীর সাথে আরো কিছু সাথী সঙ্গীদের দাওয়াত করলে কখনোই তোমার মুরুব্বীকে এ কথা বলবে না যে, হুযুর আসার সময় অমুক অমুককে সাথে নিয়ে আসবেন। কেননা নিজের কাজ মুরুব্বীর কাছ থেকে আদায় করা আদব পরিপন্থী। তবে হ্যাঁ মুরুব্বীর কাছ থেকে সাথী সঙ্গীদের ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে, তাদেরকে বলে দিবে যে, তোমরা যথাসময়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে থেকে অনুমতি গ্রহণ করে রওয়ানা হবে।

মেজবানের আরো কতিপয় আদব

১. মেহমানের আত্মতৃপ্তি ও সন্তুষ্টির প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করবে, কমপক্ষে একদিন ভালো খাবার রাখবে।[১০২]

২. খাবার ও পানীয় বস্তু মেহমানের নিকট ঢেকে পাঠাবে।[১০৩]

৩. মেহমানের বিদায়ের সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া সুন্নাত।[১০৪]

৪. মেজবান মেহমানের উপর কখনোই চেপে বসবে না, বরং তাকে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিবে, যাতে করে সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী খাবার খেতে পারে। চলাফেরা করতে পারে। অনেক লোক আছে তারা আবেগের তাড়নায়, মেহমানের চাহিদা না থাকার পরেও খাবার দিতেই থাকে, এতে মেহমানের কষ্ট হয়। আবার অনেকে আছে, তারা খুব খেয়াল করে, মেহমান কেমন করে খায়, কি খায়, এ সমস্ত কাজের দ্বারা মেহমানের কষ্ট হয়।[১০৫]

---

[১০২]। তালীমুদ্দীন ৮৮
[১০৩]। বয়ানাত পৃ./৯
[১০৪]। বয়ানাত ৭-৯ পৃ.
[১০৫]। ওয়াজে আসলো পৃ. ২৪

৫. হযরত আমিরে মু'আবিয়া রাযি. এর দস্তরখানা ছিলো বেশ ব্যাপক এবং সকল শ্রেনীর লোকদের জন্য উন্মুক্ত। ধনী, গরিব, গ্রাম ও শহরের মুসাফির ইয়াতিম যারাই খাবারের সময় উপস্থিত হতো, তারাই খাবারে অংশগ্রহণ করতো। কোনো এক সময় ঐ দস্তরখানায় এক গ্রাম্য লোক খাবারের জন্য উপস্থিত হলো। সে শহরের মানুষের স্বভাববিরোধী গ্রাম্য লোকদের মতো বড় বড় লুকমা করে খেতে থাকল। হযরত মু'আবিয়া রাযি. তার অবস্থা দেখে বললেন, মিঞা সাহেব! ছোট ছোট লুকমা করে খান, তা না হলে তো গলায় বেধে যাবে।

লোকটি তার কথা শোনামাত্রই দস্তরখানা থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আপনার দস্তরখানায় কোনো ভদ্র ও অভিজাত মানুষের বসা উচিত নয়। কারণ আপনি মেহমানের লুকমার প্রতি নজর দেন। কে ছোট ছোট লুকমা করে খাচ্ছে আর কে কে বড় বড় লুকমা করে খাচ্ছ, সেগুলোর হিসাব করেন।

সায়্যিদিনা হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাকে বার বার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, ভাই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি। লোকটি তার কোনো কথাই মানল না, বলল, আপনি যে উদ্দেশ্যেই বলুন না কেন এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, মেহমানদের খাবারের লুকামার প্রতি আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অথচ মেজবানের জন্য আবশ্যক হলো, সে মেহমানের সামনে খানা রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে, যাতে করে মেহমান স্বাধীনভাবে খাবার খেতে পারে। তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এসে খবর নিবে কোনো কিছু কম পড়ল কিনা? কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা? এ দিকে লক্ষ করা যে, কে বড় বড় লুকমায় খাচ্ছে, আর কে ছোট ছেট লুকমায় খাচ্ছে আদৌ উচিত নয়।[১০৬]

মুসাফির ও মেহমানের মাঝে পার্থক্য

এক তো হলো মেহমান, যে শুধু মহব্বতের তাড়নায় তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে, নিশ্চিতভাবে তার মেহমানদারীর দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির উপর বর্তায়, যার সাথে সে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে। আরেকজন হলো মুসাফির, যে মূলত কোনো কাজে এসেছে, পরবর্তীতে সুযোগ পেয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছে। আরবিতে একে বলে ইবনুস সাবিল। এ লোকের মেহমানদারীর দায়িত্ব সকল প্রতিবেশীদের উপর, তবে কোনো একজন করলে সকলের-ই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে।[১০৭]

---

[১০৬]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ২/২২৮

[১০৭]। মাকালাতে হিকমাত পৃ. ৬

দাওয়াত ছাড়া খাবারে অংশগ্রহণ করা অনুচিত

৭. হযরত বলেন, আমি একবার বাংলার নবাব সলিমুল্লাহ খানের দাওয়াতে ঢাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে বাংলাদেশের অনেক উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। আমি সকলকে বললাম তোমরা সকলেই গিয়ে বাজার থেকে খাবার খেয়ে আসবে।

যখন নবাব সাহেব বিষয়টি জানাতে পারলেন, তখন তিনি তার চাচা (যিনি খাবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত) তাকে ডেকে বললেন, যে সকল উলামায়ে কিরামের দাওয়াত তারা এখানেই খেয়ে নিবে। নবাব সাহেবের চাচা এসে বিষয়টি আমাকে জানালে আমি তাকে বললাম এরা সকলেই আমার বন্ধু বান্ধব। তারা আমাকে মহব্বত করে, আমিও তাদেরকে মহব্বত করি। এদের কাউকেই আমি দাওয়াত দেইনি, যার কারণে আমি এদের কাউকেই বলতে পারব না। আপনি নিজেই তাদেরকে বলে দিন, তারা যদি সাগ্রহে দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে ভালো, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। অতঃপর নবাব সাহেবের চাচা প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে দাওয়াত করল, সকলেই দাওয়াত গ্রহণ করল। এরপর সকলেই আমার সাথে খাবারে শরীক হয়ে গেল। আমি যদি না বলতাম তাহলে সকলেই আমার সাথে খাবার খেয়ে নিত। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাস করলাম, ভাই সম্মান কি এর মাঝে নাকি দাওয়াত ছাড়া খাবারের মাঝে?[১০৮]

হযরত নানুতুবী রহ.-এর মেহমানদারী

৮. একবার হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর নিকট এক বিদ'আতি দরবেশ মেহমান হলেন, উভয়ের মাঝে হালপুরচি হলো। অতঃপর হযরত তাকে অনেক ইজ্জত সম্মান করলেন, খুব মেহমানদারী করলেন। এই সংবাদ কোনো এক ব্যক্তি হযরত রশিদ আহমদ গাংগুহী রহ. এর নিকটে বললেন, হযরত বললেন এটা তো বড় মন্দ কথা।

ঐ লোকাটি গাংগুহি রহ.-এর এই কথা হযরত নানুতুবী রহ. কে বললেন। হযরত নানুতুবী রহ. বললেন, আরে ভাই রাসূল (সা) তো কাফির মুশরিকদের মেহমানদারী করেছেন। লোকটি হযরত নানুতুবী রহ. এর এই কথা আবার গাংগুহী রহ. এর কাছে গিয়ে বললেন। হযরত গাংগুহী রহ. বললেন, কোনো কাফিরকে সম্মান করার মাঝে ঐ পরিমাণ ক্ষতি নেই, যেই পরিমাণ ক্ষতি একজন বেদ'আতীকে সম্মান করার মাঝে আছে।

১০৮। আল কালামুল হুসন পর্ব ৯/৬৮

পুনরায় লোকটি গাংগুহী রহ. এর উত্তরটি নানুতুবী রহ. এর কাছে পৌঁছালেন। হযরত নানুতুবী রহ. লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, কত বড় মন্দ কথা, একজনের কথা আরেকজনের কাছে গিয়ে লাগাও। তোমার কি অন্য কোনো কাজ নেই নাকি? যাও গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো।[১০৯]

মেহমানদারীর ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত

৯. ইসলাম আমাদেরকে সহজ-সরল, সাদা-সিদে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত সকল ক্ষেত্রে আমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করব। কোনো ক্ষেত্রেই লৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করব না। ঠিক তেমনিভাবে মেহমানদারী কারার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করব, যদি কখনও মেহমানের আত্মসন্তুষ্টির জন্য লৌকিকতার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা ইসলামের সীমারেখার ভিতরেই করবে, সীমারেখার বাইরে নয়। আর বাস্তবতায় দেখা গেছে যে, এর মধ্যেই আমাদের ইজ্জত সম্মান। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল মানুষেরা মনে করে ইউরোপ আমেরিকার অনুসরণ করার মাঝে ইজ্জত সম্মান।

পোশাক আশাকে, মু'আমালাত মু'আশারাতে, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদীতে তাদের রীতিনীতি আর সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিজেদের উন্নতি করতে চাই, আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, এতে মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান নেই।[১১০]

একাধিক মেহমানের ক্ষেত্রে সবার মাঝে সমতা বজায় রাখা

১০. হযরত বলেন, একাধিক মেহমানে হলে খাবারের ক্ষেত্রে সকলের সাথে একই রকম ব্যবহার করা উচিত। মেহমানের মাঝে বৈষম্যের আচরণ আমার কাছে বড় ধরনের অপরাধ, একজনের সাথে এক রকম আরেক জনের সাথে অন্যরকম আচরণ এটা খুবই খারাপ কথা, সকল মেহমানের সাথে খাবার দাবারসহ সকল ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক।[১১১]

১১. একবার ইমাম শাফেয়ী রহ. কারো মেহমান হলেন, যার কাছে তিনি মেহমান হয়েছেন ঐ মেজবানের অভ্যাস ছিলো যে, তিনি বাবুর্চিকে প্রতি বেলার খাবারের তালিকা তৈরি করে দিতেন এবং তাকে বলে দিতেন অমুক সময় এই রুটিনে যা লেখা আছে তাই রান্না করবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. একবার বাবুর্চির

[১০৯] । জাদিদ মালফুজাত পৃ. ৭৯
[১১০] । ইসলাহুল মুসলিমীন পৃ. ১২৬
[১১১] । আল ইফাযাত ৩/৯

কাছ থেকে রুটিন নিয়ে তার পছন্দনীয় খাবার তালিকায় সংযোজন করে দিলেন। বাবুর্চি ঐ খাবার রান্না করল। যখন খাবার উপস্থাপন করা হলো, তখন মেজবান নতুন খাবার দেখে বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেন রান্না করেছ? আমি তো রুটিনে এটা লিখিনি। বাবুর্চি উত্তরে বলল, এই খাবার মেহমান নিজেই লিখে দিয়েছেন। মেজবান তার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো, শুধু তাই নয় মেহমানের নির্দেশ পালনের প্রতিদান হিসেবে বাবুর্চিকে আজাদ করে দিলেন।[১১২]

১২. প্রথমে মেহমানের হাত ধোয়াবে এবং খাবারও তার সামনে রাখবে।[১১৩]

১৩. একই শ্রেণীর সকল লোককে এক দস্তরখানায় বসাবে, যদি ভিন্ন শ্রেণীর হয় তাহলে অন্য দস্তরখানায় বসবা। বিভিন্ন শ্রেনীর লোককে এক দস্তরখানায় বসানোর কারণে অনেকের খাবারে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি খাবারের মসজলিস সংকোচমুক্ত হওয়া আবশ্যক। এজন্য মেজবানের জন্য আবশ্যক হলো নতুন কোনো আগন্তুককে মেহমানের সাথে বসাতে হলে বসানোর পূর্বে মেহমানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিবে। কেননা, হতে পারে সে আগন্তুক ভিন্ন শ্রেনীর হওয়ার কারণে মেহমানের কষ্ট হতে পারে এবং খাবার খাওয়া তার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে।[১১৪]

১৪. আমার সাধারণ অভ্যাস হলো, যদি মেহমান একাধিক হয় এবং তারা পূর্ব পরিচিত না হয়, তাহলে সকলকে একসাথে খাবার খাওয়ার জন্য বসাই না, তবে হ্যাঁ যদি আমি বসি তাহলে সকলকে এক সাথে বসাই, কেননা এ সময় আমি সকলের মাঝে মধ্যম হয়ে যাই। আমার মাধ্যমে সকলের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেহমানের ব্যাপারে আমি যে পরিমাণ খেয়াল রাখি তা আর অন্য কারো ব্যাপারে শুনবে না। একজন মেহমানের ব্যাপারে এতটুকু লক্ষ্য রাখার পরেও মানুষের মাঝে আমার ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আমার মেজাজ কঠোর।

এই নিয়ম অনুসরণ করার কারণ হলো, দস্তরখানে বিভিন্ন স্বভাবের লোক একত্রিত হয়, সকলের স্বভাব একই রকম হয় না, আর স্বাধীনভাবে খেতেও পারে না। অনেকের স্বভাব তো এমন যে, তারা অপরিচিত মানুষের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত খেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

---

[১১২]। হুসনুল ইবাদ পৃ. ২৪
[১১৩]। আসলূল ইবাদ পৃ. ২৪
[১১৪]। হুসনুল আজিজ পৃ. ২০২

অধ্যায়-৯

খেদমতের আদবসমূহ

আদবঃ যদি কোনা বুযুর্গের জুতা হিফাজত করতে চাও, তাহেল জুতা পা থেকে খোলা মাত্রই হাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষের আধিক্য থাকে, আর তখন জুতা হাতে নিতে গেলে, অন্য মানুষ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আদবঃ অনেক সময় কিছু কিছু খেদমত অন্যের কাছ থেকে নেয়াকে মাখদুম পছন্দ করেন না। যার খেদমত করা হচ্ছে তার অপছন্দ ও কষ্টের পরও খেদমতের জন্য পীড়া পীড়ি করা বড় মন্দ ও গর্হিত কাজ। আর তার অপছন্দের বিষয়টিকে অনুধাবন করতে হবে তার স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করার মাধ্যমে, অথবা তার নির্দেশনার মাধ্যমে।

আদবঃ যদি কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তি তোমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে সে কাজ সম্পাদন করে তাকে অবহিত করবে, কারণ অনেক সময় সে কাজটি সম্পাদন হয়েছে কিনা? তা জানার জন্য অপেক্ষায় থাকে।

আদবঃ প্রথম সাক্ষাতে-ই কোনো বুযুর্গের শারিরীক খেদমত করা খুবই কষ্টকর। যদি তোমার খেদমত করার আগ্রহ থাকে, তাহলে খিদমতে যাওয়ার পূর্বেই পরিচিত হয়ে নাও।

আদবঃ যদি কোনো বুযুর্গ তোমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে তা সম্পাদন করে ঐ বুযুর্গকে অবহিত করবে, অন্যথায় তিনি অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে যাবেন।

আদবঃ যারা পাখা দ্বারা বাতাস করবেন, তাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী।

প্রথমতঃ পাখা হাত অথবা কাপড় দ্বারা সুন্দরভাবে পরিস্কার করে নিবে। কারণ পাখা অনেক সময় বিছানায় এদিকে সেদিকে পড়ে থাকার কারণে ধুলা-বালি লেগে থাকে। আবার অনেক সময় পাথর বা মাটির টুকরা তাতে লেগে থাকে।

যখন বাতাস করতে নাড়াচাড়া করে, তখন ওই ধুলা বালি বা পাথর ও মাটির টুকরাগুলো মানুষের চোখে মুখে পড়তে থাকে, এতে মানুষের কষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত: বাতাস করার সময় হাত এমনভাবে রাখবে, যাতে করে তা মানুষের চোখেমুখে বাড়ি না খায়। আবার এতটুকু উঁচুও করবে না, যাতে পাখার বাতাস মানুষের গায়েই না লাগে; বরং স্বাভাবিকভাবে রাখবে।

তৃতীয়ত: তুমি যার পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করছো, পাখা যেন তার জন্য আড়াল হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

চতুর্থত: তুমি যাকে বাতাস করছো, সে দাড়িয়ে গেলে পাখা সরিয়ে নিবে, যাতে করে তার শরীরে লেগে না যায়।

পঞ্চম: যখন কোনো কাগজপত্র বের করতে লাগবে, তখন বাতাস বন্ধ করে দিবে। কারণ বাতাস অব্যাহত রাখলে, কাগজপত্র উড়ে যাবে, এতে করে কষ্ট হবে।

আদব: জনৈক খাদিম ফজরের নামাজের পূর্বে এক লোটা বা বদনা ভরে পানি ও তার উপর আমার মেসওয়াকটা রেখে দিলো, এ ধারণায় যে, আমি এসে অযু করব। কিন্তু ঘনটাক্রমে আমি সেদিন ঘর থেকে অযু করে মজজিদে এসেছি। মসজিদে প্রবেশ করার সময় অনিচ্ছা সত্তেও লোটার উপর আমার নজর পড়ল। আমার মেসওয়াক দেখে বুঝতে পারলাম যে, লোটাতে পানি আমার জন্য রাখা হয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম লোটাটা কে রেখেছে। তালাশ করে অনেক পেরেশান হওয়ার পর একজন বলল- হযরত আমি রেখেছি। আমি তাকে তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্তভাবে এবং নামাজের পর বিস্তারিতভাবে বুঝালাম। দেখ তুমি ধারণাপ্রসূত লোটাতে পানি আর মেসওয়াক প্রস্তুত করে রেখেছ যে, তা দ্বারা আমি অযু করে নিব। এমনও তো হতে পারে যে, পূর্ব থেকেই আমার অযু আছে। তো যাই হোক বাস্তবতায় তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আর এ অবস্থায় আমার নজর যদি লোটার উপর না পড়ত এবং যে পানি দিয়েছে, সেও যদি খেয়াল না করতো, তাহলে লোটাটা পানিভর্তি অবস্থায় থেকে যেত, কেউ তা ব্যবহার করতে পারত না। আর এর কারণে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।

প্রথম: লোটাভর্তি পানি থাকার কারণে সকলেই মনে করতো যে, কেউ ব্যবহারের জন্য তা ভর্তি করে রেখেছে, আর স্বাভাবিকভাবে এমন ধারণা করারই কথা। দ্বিতীয়: তার সাথে মেসওয়াক থাকায় ধারণা এখন নিশ্চিতে পরিণত হয়েছে। এমন একটি জিনিস, যার উপকার অর্জনের হক সকল মানুষের সাথে তা বিনা

প্রয়োজনে আটকিয়ে রাখা হতো, যা মূলত ঐ লোটা তৈরী এবং যে সেই লোটা ওয়াকফ করেছে তার নিয়ত পরিপন্থী। তাহলে এ কাজ কিভাবে বৈধ হতে পারে? এ তো গেল লোটার ব্যাপার।

আর এখন মেসওয়াকের ব্যাপারে কথা হলো, তুমি মেসওয়াকটি অযথা সংরক্ষিত জায়গা থেকে অন্য আরেক জায়গায় রেখেছ। এরপর তুমি তা সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করা উচিত ছিলো, খুব গভীরভাবে লক্ষ রাখা যে, ব্যবহারের পর অথবা ব্যবহার না হলে তা সংরক্ষিত স্থানে রেখে দেয়া। কারণ মেসওয়াকটি লোটার উপর থাকার কারণে সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধ হয়ে গেছে যে, ব্যবহারের পর ব্যবহারকারী নিজেই মেসওয়াক উঠিয়ে রাখবে।

এমনও হতে পারে যে, সেখান থেকে মেসওয়াকটি হারিয়ে গেল, তাহলে যার মেসওয়াক সে তো বড় ধরনের পেরেশানের মাঝে পড়বে। সুতরাং সর্বাধিক বিবেচনায় ধরে নেয়া যায় যে, তোমার খেদমতটি বৈধ পন্থায় হয়নি। সামনে থেকে কখনোই এরূপ করবে না, অথবা যার খেদমত করবে, তার অনুমতি নিয়ে করবে, অথবা অবস্থা দেখে তুমি নিশ্চিত হবে যে, সে অযুর জন্য আসছে, তখন এরূপ করাতে কোনো সমস্যা নেই। নিয়মবর্হিভূত খেদমত করার কারণে খেদমত আরামের জায়গায় কষ্টের কারণে হয়ে দাঁড়ায়।

সূক্ষ কথাঃ ঠিক এই অবস্থা হলো বিদআত বা ইসলামের নতুন আবিস্কৃত বিষয়ের, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সেটাকে ইবাদত মনে হয়, যেমনিভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ কাজ খেদমত মনে হচ্ছিল, কিন্তু বাস্তবতায় তার মাঝে বিভিন্ন ধরনের খারাপি বা অনিষ্টতা লুকায়িত আছে, যা কম বুঝ বুদ্ধির লোকেরা বুঝতে পারে না। তারা তো ইবাদত মনে করে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে তা সম্পাদন করে থাকে। ঠিক এমনিভাবে এই খিদমতের মধ্যে অনেক অনিষ্টতা লুকায়িত আছে, যা খেদমতকারী বুঝতে সক্ষম হয়নি।

আদবঃ এক ব্যক্তি ঝুলন্ত পাখা টানিয়ে বাতাস করছিলো। আমি যখন কোনো প্রয়োজনে উঠতে লাগলাম, তখন সে পাখার রশিগুলো খুব তাড়াতাড়ি নিজের দিকে টেনে নিতে লাগল, যাতে আমার মাথায় না লাগে। তখন আমি তাকে বুঝালাম, ভাই কখনোই এরূপ করবে না। যদি কখনো আমি পাখার জায়াগা খালি পেয়ে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাই, আর ঘটনাক্রমে পাখার রশি তোমার হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে পাখা এসে আমার মাথায় লেগে যাবে। তার চেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো, পাখার রশিগুলো একেবারেই ছেড়ে দেয়া, কারণ পাখা তখন নিজ স্থানে এসে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, আর তখন যারা উঠে যেতে চায় নিরাপদ উঠে যেতে পারবে।

আদব: দরস্তরখানার উপর অনেক চিনি রাখা থাকে, যখন খাদেম তা পরিষ্কার করার জন্য নাড়াচাড়া করে, তখন সেগুলো উড়ে গিয়ে অন্যের শরীরে পড়ে। আবার অনেক সময় পাত্র থেকে চামচ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তরকারির ঝোল টপকিয়ে পড়তে থাকে। এগুলো অন্যের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই খাদেমদের এ বিষয়গুলির প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা দরকার।

আদব: এশার নামাযের পর ঘটনাক্রমে একদিন মসজিদেই শুয়ে পড়লাম। অপরিচিত এক ব্যক্তি এসে আমার অনুমতি ছাড়াই পা টিপতে শুরু করল। আমার কাছে তার এ কাজটি খুবই খারাপ লাগছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই তুমি কে? তখন সে তার নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে পা টিপতে নিষেধ করলাম। আর তাকে এটাও বলে দিলাম যে, কারো খেদমত করার ইচ্ছা থাকলে, প্রথমেই তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, এরপর খেদমতের অনুমতি চাইবে। যদি অনুমতি দেয়, তাহলে খেদমত করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি বারণ করে, তাহলে খেদমত করা আদৌ উচিত নয়। আর যদি সাক্ষাৎ-ই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার পদ্ধতি এটা নয়, তার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি আছে। এরপর তাকে বুঝিয়ে বললাম, দেখ এশার পরের সময় আরামের সময়, এখন গিয়ে তুমিও আরাম করো। সে সকালে আবার সাক্ষাৎ করল। তাকে আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম।

আদব: আমার ভাইয়ের বাড়ি থেকে একটা চিঠি, তার এক শ্রমিকের হাতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো আর তাকে এ কথাও বলে দিলো যাতে করে চিঠি সে নিজেই পৌঁছে দেয়। ডাকে না পাঠিয়ে শ্রমিকের হাতে পাঠানোর কথা আমিই বলেছিলাম। কারণ সেটি জরুরি একটি চিঠি ছিলো, আর তার সম্পর্ক ছিলো আমার সাথে। শ্রমিক পথিমধ্যে ডাক পিয়ন বা পত্র বাহক দেখতে পেলো যে, সে ডাক নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছে। শ্রমিক চিঠি ডাক পিয়নের হাতে দিয়ে দিলো, এই ধারণায় যে, তার হাতে দিলে দ্রুত আজকের মাঝেই পৌঁছে যাবে। কেননা, পিয়ন দ্রুত পৌঁছানোর জন্য সকল চিঠিপত্র রেলের পোষ্ট মাষ্টারকে দিয়েছে। এদিকে আমি চিঠির জন্য অপেক্ষা করছি যে, ভাই তো আজ আমার কাছে চিঠি পাঠাবে।

যখন চিঠি যথাসময়ে পৌঁছল না তখন আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, শ্রমিক চিঠি ডাক পিয়নের হাতে দিয়েছে। আমি ঐ শ্রমিককে তলব করলাম। সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করল তখন বললাম তুমি একজনের আমানতের মাঝে তার অনুমতি ছাড়াই কিভাবে খিয়ানত করলে।

তোমার কি জানা আছে যে, তোমার মাধ্যমে চিঠি আমার কাছে পৌঁছলে কি কল্যাণ, আর ডাক পিয়নের মাধ্যমে পৌঁছলে কি কল্যাণ। তুমি এক ব্যর্থ চেষ্টার মাধ্যমে সকল উপকার বিনষ্ট করে ফেলেছ। তোমার এর মাঝে নাক গলানোর কি দরকার ছিলো? তোমাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাই করতে। তোমার কাজ ছিলো আমার কাছে পৌঁছে দেয়া, কিন্তু তুমি তা করোনি। শ্রমিক আপত্তি পেশ করে বলল, হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করুন, সামনে থেকে আর এরূপ হবে না।

আদবঃ এক ব্যক্তি জুমআর দিন বারোটার গাড়িতে সাহারানপুর থেকে আমার নিকট রওয়ানা হলো। সাহারানপুর অবস্থান করে আমার এক বন্ধু, তার মাধ্যমে আমার জন্য কিছু বরফ পাঠাল। লোকটি এমন এক সময় পৌঁছল, যে সময় ছাত্ররা জুমআর নামায আদায়ের জন্য এখনো মসজিদে যায়নি।

ঐ লোকটি বরফের খণ্ডটি এক জায়গায় রেখে জুমআর নামায আদায় করতে চলে গেল। জুমআর নামাযের পর আমি আমার এক বন্ধুকে ওয়াজ করার জন্য অনুরোধ করলাম। সে আমার অনুরোধ রক্ষা করে ওয়াজ করার জন্য সম্মতি প্রকাশ করল। যেহেতু সে আমাকে দেখে লজ্জাবোধ করে, তাই আমি মসজিদ থেকে মাদরাসায় চলে আসলাম। লোকটি ওয়াজ শোনার জন্য বসে পড়ল, দীর্ঘ সময় ওয়াজ শোনার পর যখন ওয়াজ শেষ হলো, তখন এক খন্ড কাপড়ে পেঁচানো বরফখন্ডটি এনে আমার সামনে পেশ করল। প্রথমত, কাপড়টি ছিলো অত্যন্ত ময়লাযুক্ত, আবার দীর্ঘ সময় থাকার কারণে সেটা গলে একদম ছোট হয়ে গেছে। আবার পাশাপাশি তার যে দায়িত্ব ছিলো, তাতেও সে অবেহেলা করেছে। তার তো দায়িত্ব ছিলো, আনা মাত্রই তা বাসায় পৌঁছে দেয়া।

যখন ঐ সময়ও পৌঁছাল না তখন কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই করা দরকার ছিলো যে, নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেয়া। যদি বাসায় আসতে তার মন না চায়, তাহলে তো কমপক্ষে এতটুকু করা দরকার ছিলো, যখন আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন আমাকে অবহিত করতো, আমি নিজেই সেটি নিয়ে আসতাম। এখন দুই ঘন্টা পর এসে আমাকে দিচ্ছে, যা গলতে গলতে নিঃশেষ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, নাম কে ওয়াস্তে সামান্য অবশিষ্ট আছে। আমি পূর্ণ ঘটনা জানালাম, এরপর তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম। আর চিন্তা করলাম, আমার বুঝানোই তার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলাম, যাতে করে আমার এ কথা তার সারা জীবনের জন্য শিক্ষা হয়। লোকটি অনেক পেরেশান হলো, আমি তাকে বললাম, তুমি এক ব্যক্তির

আমানত নষ্ট করেছ, যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন আমাকে দিতে চাচ্ছো। এখন এটা গ্রহণ করা আমার জন্য ঠিক হবে না। আর সামনে থেকে এভাবে কারো দায়িত্বও নিবে না, আর যদি দায়িত্ব নাও তাহলে পরিপূর্ণভাবে তা পালনে সচেষ্ট থাকবে।

খেদমতের আরো কতিপয় আদব

খেদমত করার তিনটি শর্ত:

একদা হযরত থানভী রহ. বলেন, খেদমতের মূল উদ্দেশ্য হলো যার খেদমত করা হচ্ছে, তাকে আরাম ও শান্তি দেয়া, তবে খেদমত করার জন্য তিনটি শর্ত হচ্ছে।

(১) নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ খেদমত করার দ্বারা খেদমতকারীর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। খেদমত হবে শুধু একনিষ্ঠ মহব্বতের টানে। অধিকাংশ মানুষই খেদমতকে স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ইশার নামাযের পর আমার কিছু সময়ের জন্য শুয়ে থাকার অভ্যাস আছে। আমি যখন শুয়ে যাই, তখন ছাত্ররা এসে আমার শরীর টিপতে শুরু করে। যেহেতু শরীর টেপার দ্বারা আরাম হয় এবং সারা দিনের ব্যস্ততাও থাকে তাই অনেক কম সময়ে ঘুমের ভাব চলে আসে। যখন ঘুমের ভাব এসে গেল, তখন অপরিচিত বাইরের এক লোক এসেই শরীর টেপায় অংশগ্রহণ করল। এক পর্যায়ে সে আমাকে বললল, হযরত! কিছু কথা আছে। আমি অনুমতি দিলে সে বলতে আরম্ভ করল। দেখলাম সে একজনের ব্যাপরে বিভিন্ন কুৎসা রটনা করছে, যাতে করে তার উপর আমার খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। আমি তাকে বারণ করে উঠিয়ে দিলাম। এরপর থেকে যদি কেউ আমার খিদমত করার জন্য আসে, তাহলে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নেই যে, কোনো ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা? যদি বুঝতে পারি যে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, তাহলে তার কাছ থেকে কোনো খেদমত গ্রহণ করি না। তবে দু-চারজন ছাত্র আছে যারা একনিষ্টভাবে কোনো স্বার্থ ছাড়াই খেদমত করে থাকে।

(২) পূর্ব পরিচিতি হওয়া, অনেক সময় অপরিচিত মানুষজন এসে খেদমত শুরু করে দেয়, কেউ শরীর টিপছে, আবার কেউ পাখা দ্বারা বাতাস করছে, তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে নিজের কাছে কষ্ট অনুভব হয়, এই জন্য যারা খেদমত করবে তারা পূর্ব থেকেই পরিচিত হওয়া চাই।

(৩) যে কাজ করতে এসেছে সেই কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা, উদাহরণস্বরূপ অনেকে আছে তারা শরীর টিপতে পারে না, তারা পরে যখন সুযোগ পায়, তখন এসে শুরু করে দেয়। এতে করে যার খেদমত করা হচ্ছে তার কষ্ট হয়। আবার অন্য দিকে মুখ খুলে বলাও যায় না যে, তুমি শরীর টিপতে পারো না, তুমি রেখে দাও। বাধ্য হয়ে চুপ থাকতে হয়, সে তো মনে মনে খুব খুশি যে, আমি খেদমত করছি। কিন্তু আমি তো বুঝছি যে, সে আমার খেদমত করছে না, আমি তার খেদমত করছি। কেননা, মুখ খুলে আমি কিছু বলতে পারছি না।

সে মনে মনে ভাবছে আমি তার জন্য কষ্ট করছি, আর আমি ভাবছি যে, আমি তার জন্য কষ্ট করছি। তবে ছাত্রদের ক্ষেত্রে সাধারণত এমন হয় না, কারণ তাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা থাকে, পূর্ব পরিচিতও থাকে। আবার খেদমত সম্বন্ধে পূর্ব থেকে অভিজ্ঞতাও থাকে। তাদের খিদমতের কারণে কষ্টও হয় না। যে অবস্থায় হোক না কেন তারা সর্বাবস্থায় খেদমত করতে পারে, চাই পা ছড়ানো অবস্থায় হোক, অথবা বসা অবস্থায় হোক, অথবা শোয়া অবস্থায়। তবে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।[১১৫]

অন্যের খেদমতকে নিজের সৌভাগ্য মনে করবে

২. হযরত বলেন, কোনো মুসলামনের খেদমত করতে পারাকে আমি ইবদত জানি এবং নিজের জন্য সৌভাগ্যের সোপান বলে মনে করি। তবে শর্ত হলো, তা শরীয়তবিরোধী হতে পারবে না।[১১৬]

৩. হযরত বলেন, আমি বৃদ্ধ, সায়্যিদ এবং জাকেরীনদের কাছ থেকে খেদমত নেই না।[১১৭]

৪. আমি কারো খেদমতও করি না, আর কারো কাছ থেকে খেদমতও গ্রহণ করি না। বুযুর্গদের খেদমত আমি করতে পারিনি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার খিদমতের অভ্যাস আছে সে পারে, আর যার অভ্যাস নেই সে পারে না। তবে আমি তা করতে পারিনি। হ্যাঁ, এমন লোকদের থেকে আমি খেদমত নেই, যাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমি তার খেদমত করছি। আর এটা ওই সময় সম্ভব হয় যখন সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টি হয়। আর যারা দেখে তারাও এটাকে

---

[১১৫] । কামালাতে আশরাফিয়া ৪/৮১
[১১৬] । কামালাতে আশরাফিয়া ৪/১৮২
[১১৭] । কামালাতে আশরাফিয়া ১/২৮

খেদমত মনে করে না। বরং ধারণা করে যে, বেশি নৈকট্য হওয়ার কারণেই কেবল তা গ্রহণ করছে।[১১৮]

৫. কথার এক ধারাবাহিকতায় হযরত বলেন, যদি কেউ সঠিক নিয়মে খেদমত গ্রহণ করে, তাহলে তার খেদমতের জন্য আমি সারা রাত ব্যয় করতে প্রস্তত। আর যদি সঠিক পদ্ধতিতে খিদমত না নেয়, তাহলে তার খিদমতের জন্য আমি এক মিনিটও ব্যয় করতে প্রস্তত নই।[১১৯]

৬. প্রত্যেককে তার অবস্থান অনুযায়ী সম্মান করো, সকলকে একই পাল্লায় মেপো না।

৭. কাউকে দুঃখ দুর্দশায় দেখলে যথাসম্ভব তার সাহায্য সহযোগিতা করো।

৮. বিপদে পতিত ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যদি নিজে না পারো, তাহলে তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অন্যের কাছে সুপারিশ করবে। তবে লক্ষ্য রাখবে যার কাছে সুপারিশ করবে তার যেন কোন ক্ষতি এবং তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়।

৯. এতিমের সাহায্য সহযোগিতা করবে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে এতিমের জামিন হবে, সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে।

১০. যে তার নিজ কামাই হতে বিধবা ও নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতা করবে, তার জিহাদ সমপরিমাণ সওয়াব অর্জিত হবে।

১১. জালিমের উপর ইহসান এভাবে করো যে, যাতে করে সে জুলুম থেকে বিরত থাকে। আর মজলুমকে টাকা-পয়সা দিয়ে এবং শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করো।

১২. পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি পান করানো বড় সওয়াবের কাজ। যেখানে সচারচর পানি পাওয়া যায়, সেখানে কোনো পিপাসিতকে পানি পান করানোর দ্বারা এক গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জিত হয়। আর যেখানে সচারচর পানি পাওয়া যায় না, সেখানে পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি পান করালে এ পরিমাণ সওয়াব অর্জিত হবে, যে পরিমাণ সওয়াব অর্জিত হতো কোনো মৃতকে জীবিত করার দ্বারা।

১১৮। কামালাতে আশরাফিয়্যা ১০/১৫০

১১৯। কামালাত পৃ. ১২৮

১৩. যদি খাবার রান্না করার জন্য কাউকে আগুন দিয়ে সহাযোগিতা করো, অথবা সামান্য লবণ দিয়ে সহাযোগিতা করো, তাহেল পুরা খাবার দান করার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জিত হয়।

১৪. পিতা-মাতার খেদমত করো, যদিও সে কাফির হোক না কেন? আর তাদের আনুগত্য করো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের বিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ না দেয়।

১৫. এটাও পিতা-মাতার খেদমতের অংশ হিসেবে জানো যে, তাদের মৃত্যু পর তাদের সাথী-সঙ্গী এবং তাদের সম-বয়সীদের সাথে ভালো আচরণ করা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হওয়া।

১৬. যদি পিতা-মাতা তোমার উপর অসন্তুষ্টি হয়ে মারা যায়, তাহলে সবসময় তাদের জন্য দোয়া করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর আল্লাহর কাছে তাদের সন্তুষ্টির আশা রাখো।

১৭. সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও নিকট আত্মীয়দের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো, যদিও তারা তোমার সাথে খারাপ আচরণ করুক না কেন।

অধ্যায়-১০

হাদিয়া দেয়ার আদবসমূহ

আদব: হাদিয়া দেয়ার আদব হলো, যাকে হাদিয়া দিবে তার কাছে যদি তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাকে হাদিয়া দিবে না। কারণ যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে, সে তোমার চাহিদা পূরণে বাধ্য হয়, অথবা সে লজ্জায় পতিত হয়। এমনিভাবে অনেকে আছে তারা সফরে এই পরিমাণ হাদিয়া দেয় যে, তা বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্ট হয়ে যায়, যদি এই পরিমাণ হাদিয়া দেয় যে, তা বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্ট হয়ে যায়। যদি তোমার হাদিয়া দেবার এতই আগ্রহ থাকে, তাহলে সে যেখানে অবস্থান করে সেখানে গিয়ে দেবে, অথবা ডাক মারফত তার কাছে পাঠিয়ে দিবে।

আদব: কেউ হাদিয়া দেয়ার পর ঐ বস্তুটি হাদিয়াদাতার উপস্থিতিতেই অন্যকে হাদিয়া বা কল্যাণকর কোনো কাজে চাঁদা দিবে না। কারণ এতে সে মনে কষ্ট পায় এবং ধারণা করে যে, আমার হাদিয়াটি সে পছন্দ করেনি। সে জিনিসটি এমন একসময় অন্যকে হাদিয়া দিবে বা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে যে সময় সে দেখবে না।

আদব: এক ব্যক্তি কিছু আটা নিয়ে এসে আমার কামরায় রেখে দিলো। কোনো কিছুই আমাকে বলল না যে, সেগুলো কার জন্য নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে জানতে পারলে, সেগুলো আমি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, যখন এসে রুমে রাখলে তখন কেন বললে না যে, এগুলো আমার জন্য এনেছ নাকি মাদরাসার জন্য? এখন আর তোমার হাদিয়া গ্রহণ করা হবে না, নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। যখনই হাদিয়া নিয়ে আসবে, তখনই অবহিত করবে।

আদব: যখন কেউ তার কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসবে, তখন হাদিয়া দেবে না, যেমন দোয়া করানোর জন্য আসলো, অথবা তাবীজ নেয়ার জন্য অথবা সুপারিশ করার জন্য, অথবা মুরিদ হওয়ার জন্য ইত্যাদি। এগুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী।

হাদিয়ার আদান প্রদান তো হয় কেবল মহব্বত-ভালোবাসা ও হৃদ্যতা প্রকাশের জন্য, যেখানে কোনো ধরনের উদ্দেশ্য থাকে না। যদি কোনো প্রয়োজনই থাকে,

তাহলে প্রয়োজনের সময় হাদিয়া নিয়ে আসবে না, বরং যখন প্রয়োজন নিয়ে আসবে তখন তোমার প্রয়োজনের কথাই প্রকাশ করবে। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে কোনো সময় হাদিয়া দিবে। যাতে করে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না হয় যে, হাদিয়া তার প্রয়োজনের বদলা হিসেবে দেয়া হয়েছে।

আদব: এক মেহমান আমাকে না জানিয়ে হাদিয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে দুই টাকা কলমদানির ভিতর রেখে দিলো। আসরের নামাযের সময় কলমদানি যখন তুলে নির্ধারিত স্থানে রাখি, তখনো কলমদানির ভিতর আমি কোনো টাকা পয়সা দেখিনি। নামাযের পর আমি কলমদানি চাইলে খাদেম কলমদানি নিয়ে আসলো। তখন তার ভিতর টাকা দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কলমদানিতে কে টাকা রেখেছে? অনেকে খোজ খবর নেয়ার পর এক মেহমান জানাল যে, কলমদানির ভিতর টাকা সে রেখেছে। আমি ঐ টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, যখন তোমার হাদিয়া দেয়ার পদ্ধতিই জানা নেই, তাহলে হাদিয়া দেয়ার কি প্রয়োজন? এই পদ্ধতি তোমাকে কে শিখিয়েছে? কয়েকটি কারণে তোমার এই হাদিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। হাদিয়া দেয়ার পদ্ধতি শিখে তারপরে হাদিয়া নিয়ে এসো।

প্রথমত: হাদিয়া দেয়ার উদ্দেশ্য ভালোবাসা ও হৃদ্যতা এবং যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তাকে আরাম পৌঁছানো। যখন এত খোঁজ খবর নিয়ে পেরেশান হয়ে হাদিয়াদাতাকে বের করতে হচ্ছে, তখন হাদিয়ার প্রথম উদ্দেশ্যই অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত: যদি কলমদানি থেকে আমার অজ্ঞাতেই কেউ টাকা নিয়ে যেত, যার ব্যাপারে তুমিও জানতে না, আর আমিও জানতাম না, তখন তোমার ধারণা থাকত যে, আমি ২ টাকা গ্রহণ করেছি। অথচ বাস্তাবতায় আমি তা থেকে সামান্যতমও উপকৃত হইনি। তাহলে অযথাই তোমার ঋণের বোঝা আমার মাথায় থেকে যেত।

তৃতীয়ত: যদি কেউ নাও নিত এবং আমার হাতে তা আসত, তাহলেই আমি কিভাবে জানতাম যে, টাকাটা কার পক্ষ থেকে আসলো ও কাকে দেয়া হলো। আর যখন জানতে পারতাম না তখন কয়েকদিন পর্যন্ত আমানত হিসেবে আমার কাছে রাখতাম, এরপর যখন অসুবিধা হতো তখন হারানো মাল হিসেবে গরিব মিসকিনদের দিয়ে দিতাম। এই সমস্ত অস্থিরতা আর পেরেশানি সৃষ্টি হলো শুধু নিয়ম অনুযায়ী হাদিয়া না দেয়ার কারণে। অথচ সঠিক পদ্ধতি তো ছিলো যে, যাকে তুমি হাদিয়া দিতে চাচ্ছো, সরাসরি তার হাতে দিয়ে দিবে।

যদি মনুষের সামনে দেয়াকে লজ্জাবোধ করো, তাহলে যখন একাকী সুযোগ হতো, তখন দিয়ে দিতে। আর যদি একা না পেতে তাহলে কোনো এক সময় সুযোগ করে বলতে যে, আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা আছে। অতঃপর যখন একা পাবে তখন দিয়ে দিবে।

আদব: আর যাকে হাদিয়া দেয়া হলো, তার এখতিয়ার রয়েছে হাদিয়াদাতার নাম প্রকাশ করা না করার ব্যাপারে। ইচ্ছা করলে তার উপস্থিতিতেই প্রকাশ করতে পারে, ইচ্ছা করলে সে চলে যাওয়ার পরও প্রকাশ করতে পারে। তবে যদি হাদিয়াদাতার নাম প্রকাশ করার দ্বারা সে লজ্জা পাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহলে পরবর্তীতে বলাই ভালো।

আদব: কোনো এক সফরে কিছু লোক আমাকে দাওয়াত করল, আমি সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, ওয়াজ নসীহত করলাম, যখন আমি বিদায় নিয়ে চলে আসতে লাগলাম তখন ঐ গ্রামের সকলেই কিছু কিছু করে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে একত্রিত করল এবং হাদিয়া দেয়ার জন্য আমার কাছে নিয়ে আসলো। যখন সেগুলো আমার সামনে আনল, তখন আমি তাদেরকে হাদিয়া হিসেবে আমাকে দেয়া থেকে বারণ করলাম এবং এ কথাও বললাম তোমরা কাউকে হাদিয়া দেয়ার জন্য কখনোই সকলের কাছ থেকে চাঁদা উঠাবে না।

তার প্রথম কারণ হলো, অনেক সময় চাঁদা উত্তোলনকারীরা মোটেও এ কথার প্রতি খেয়াল রাখে না যে, যারা চাঁদা দিচ্ছে, তারা কি সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে চাঁদা দিচ্ছে, নাকি সকলেই দিচ্ছে, না দিলে সামাজিকভাবে লজ্জিত হবে এ কারণে দিচ্ছে? যদি লজ্জার কারণে দেয় তাহলে তো তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

দ্বিতীয়ত. যদি ধরে নেয়া হয় যে, সন্তুষ্টচিত্তেই দিচ্ছে, তাহলেও হাদিয়ার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরপস্পরে হৃদ্যতা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তা কিন্তু কোনোভাবেই অর্জিত হয় না। কারণ যখন এ কথা জানা গেল না যে, হাদিয়া কে দিয়েছে, তখন কিভাবে তার সাথে হৃদ্যতা আর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে?

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দিক বিবেচনাপূর্বক অনেক সময় হাদিয়া গ্রহণ করা অমঙ্গল, আর সেদিকগুলো যথাযথভাবে জানা তখনই সম্ভব হয়, যখন হাদিয়াদাতা নিজ হাতে হাদিয়া দেয়, আর সমবেত হাদিয়ার মাঝে এটা জানা সম্ভব হয় না। এজন্য যে হাদিয়া দিবে, সে নিজ হাতেই হাদিয়া দিবে। আর যদি একান্ত নিজে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার ঘনিষ্ট কোনো লোককে পাঠিয়ে বলবে, তার পক্ষ থেকে এটা আপনাকে হাদিয়া, অথবা ঐ লোকের সাথে হাদিয়ার ব্যাপারে অবহিত করে, নিজের ব্যস্ততার কথাও লিখে পাঠাবে।

আদব: এক সফরে কিছু লোক আমার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং একের পর এক সকলেই আমাকে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে হাদিয়া দিতে লাগল। তখন আমি তাদেরকে বারণ করে বললাম, যদি তোমরা এভাবে হাদিয়া দিতে থাকো, তাহেল সকলেই মনে করবে, আমাকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিলেই হাদিয়া দিতে হয়। এজন্য যারা দরিদ্র আছে, তারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হাদিয়া না দিতে পারার লজ্জায় আমাকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিবে না। যদি কারো হাদিয়া দেয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার বাড়িতে এসে দিবে। এতে আমার স্বাধীনতাও খর্ব হবে না।

আদব: আমি এই আদব শিরোনামে হাদিয়ার এমন কিছু আদব সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছি, যে আদবগুলোর প্রতি খেয়াল না রাখার কারণে মূল উদ্দেশ্য হৃদ্যতা ভালোবাসা খর্বিত হয়।

১. যে হাদিয়া দিবে সে গোপনে দিবে, আর যাকে হাদিয়া দেয়া হবে, অর্থাৎ গ্রহীতার জন্য উচিত সে প্রকাশ করবে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা উল্টা হয়ে গেছে, যে হাদিয়া দেয় সে প্রকাশ করতে চায়, আর গ্রহীতা গোপন করতে চায়।

২. হাদিয়া যদি টাকা পয়সা অথবা ভিন্ন কিছু হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তার রুচি জানার চেষ্টা করবে। অতঃপর তার পছন্দনীয় জিনিস হাদিয়া দিবে।

৩. হাদিয়া দেয়ার পর অথবা হাদিয়া দেয়ার পূর্বে নিজের কোনো উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করবে না। কেননা যদি কোনো উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করা হয়, তাহলে যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হাদিয়া দিয়েছে।

৪. হাদিয়ার পরিমাণ এত বেশি না হওয়া যে, যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে সে হাদিয়াকে বোঝা মনে করে, হাদিয়ার পরিমাণে বা সংখ্যায় কম হওয়াতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। কেননা বুযুর্গদের নজর আধিক্য বা সংখ্যার প্রতি থাকে না, বরং ইখলাসের প্রতি থাকে। যদি বেশি হয় তাহলে ফেরত দেয়ার সম্ভবনা থাকে, তাই পরিমাণে বা সংখ্যায় কম হওয়াই ভালো।

৫. যদি হাদিয়া গ্রহীতা কোনো মঙ্গলের কথা বিবেচনা পূর্বক হাদিয়ার জিনিস ফিরিয়ে দিতে চায়, তাহেল ফিরিয়ে দেয়ার কারণ ভালোভাবে জেনে নিবে এবং পরবর্তীতে হাদিয়া দেয়ার সময় সে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে, কিন্তু তাৎক্ষণিক তা নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। তবে যে কারণে ফিরিয়ে দিচ্ছে, সেটা যদি বাস্তবসম্মত না হয়, তাহলে সেটা অবাস্তব হওয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিক জানিয়ে দেয়াতে কোনো ক্ষতি নেই।

হাদিয়ার আরো কতিপয় আদব

হাদিয়া সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যমুক্ত হতে হবে

১. হাদিয়া তো সেটাই হয়ে থাকে, যা দেয়ার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল উদ্দেশ্য মুক্ত হয়, শুধু একনিষ্টভাবে মুসলমান ভাইয়ের মহব্বত ভালোবাসার জন্য দেয়া হবে। অনেকে আছে যারা হাদিয়া দেয় দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। প্রকৃতপক্ষে সেটি হাদিয়া নয়, সেটি হলো সুদ। আবার অনেকে আছে ফতওয়া নেয়ার পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসেবে হাদিয়া দিয়ে থাকে। আবার অনেকে আছে হাদিয়া দেয় আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে। এটাও হাদিয়া নয়, বরং সেটি সদকা এবং খয়রাত।[১২০]

বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাদিয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

২. মানুষের মাঝে এক ধরনের অভ্যাস হয়ে গেছে, যখন তারা কোনো বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন হাদিয়া নিয়ে যাওয়াকে আবশ্যক মনে করে। অথচ আবশ্যকীয় মনে করে হাদিয়া নিয়ে যাওয়া অভ্যস্ত হওয়া ভালো নয়। এভাবে হাদিয়া নিয়ে যাওয়ার দ্বারা তিন শ্রেনীর লোকের ক্ষতি হয়। ১.হাদিয়া দাতার. ২. হাদিয়া গ্রহীতার ৩. ওই বুযুর্গের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাদের।

যে হাদিয়া নিয়ে যায় তার ক্ষতি হলো, তার স্বভাবে সব সময় মহব্বতের প্রবলতা থাকে না। আর হাদিয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে কোনো না কোনো সময় তার উপর হাদিয়া বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যেহেতু হাদিয়া ছাড়া তার জন্য সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়, এজন্য সে অনেক সময় মহব্বতের কারণে হাদিয়া নিয়ে যাবে না, বরং নিজের ব্যক্তিত্ব আর সম্মান রক্ষার জন্য হাদিয়া নিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এটা তো হাদিয়া হলো না। কেননা হাদিয়া তো বলা হয়, যা একনিষ্ঠ মহব্বতের কারণে দেয়া হয়। ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্য নয়। সুতরাং এভাবে হাদিয়া দেয়ার দ্বারা তার কোনো লাভ হবে না, বরং অর্থনৈতিক কিছু ক্ষতি হবে। এভাবে হাদিয়াদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

---

[১২০]। মাকালাতে আশরাফিয়া

আর হাদিয়া গ্রহীতার ক্ষতি হলো, ঐ হাদিয়াদাতা যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে তখনই তার মাঝে এক প্রকার সংশয় সৃষ্টি হয় যে, না জানি সে আমার জন্য কিছু নিয়ে এসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার সামনে উপস্থাপন না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংশয় আর সন্দেহ তার মাঝে কাজ করতেই থাকে। এক পর্যায়ে এভাবে তার মাঝে লোভ লালসা সৃষ্টি হয়, এভাবে হাদিয়া গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর যারা সম্পর্ক রাখে তাদের ক্ষতি হলো, যদি ঐ বুযুর্গের কোনো ব্যস্ততার কারণে তাদের সাথে ভালোভাবে কথা-বার্তা বলার সুযোগ না হয়, তাহলে তারা মনে মনে ধারণা করতে থাকে যে, আমরা হাদিয়া আনতে পারিনি তাই আমাদের সাথে এমন আচরণ করল। যারা হাদিয়া এনেছে তাদের সাথে তো ভালো আচরণই করেছে। অধিকাংশ দরিদ্র লোকেরা এভাবে আস্তে আস্তে বুযুর্গদের থেকে দূরে সরে পড়ে, যখন আমরা হাদিয়া নিয়ে যেতে পারি না, খালি হাতে কিভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করি।[১২১]

কিছু কিছু হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়াও জায়েয আছে

৩. হযরত বয়ানের এক ধারাবাহিকতায় বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়, তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও হাদিয়া দিয়ে থাকে, বাস্তবিক পক্ষে হাদিয়াদাতার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং কষ্টের কারণ হয় এদের হাদিয়া গ্রহণ না করে ফেরত দেয়াই শোভনীয়, আমার মনেও চায় ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু হাদিয়া ফেরত দেয়া যেহেতু সুন্নাত পরিপন্থী এই জন্য ফিরিয়ে দেই না। তবে মনের ভিতর একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

তবে এক হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়ার কারণসমূহের মাঝে থেকে এটাও একটি কারণ। হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে, রাসূল সা. বলেন, যদি কেউ তোমাকে ছোট কোন জিনিস হাদিয়া দেয়, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করো। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, অল্প এবং ছোট হওয়ায় হাদিয়াদাতার জন্য কষ্ট হয় না। আর গ্রহীতার জন্য বহন করা সমস্যা হয় না। এর দ্বারা বুঝে আসে, যদি হাদিয়াদাতার জন্য কষ্ট হয় এবং তা গ্রহীতার জন্য বহন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয নেই, বরং ফিরিয়ে দেয়াই উত্তম।[১২২]

---

[১২১] । মাকলাত পৃ. ৯৮-৯৯

[১২২] । মাকালাতে হিকমত পৃ. ১৩৭

হাদিয়ার ব্যাপারে এক আলেমের সন্দেহ ও তার উত্তর

৪. একজন বিজ্ঞ আলেম, তার বন্ধু বান্ধবদের হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তাই তিনি তার সন্দেহের কথা হযরতের কাছে পেশ করে বললেন, হযরত আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে তারা আমাকে হাদিয়া দিয়ে থাকে। তাদের অবস্থা দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তারা মহব্বতের কারণে দেয় না বরং নিজেদেরে ব্যক্তিত্ব আর সম্মান রক্ষার্থে হাদিয়া দিয়ে থাকে।

তাদের এ সমস্ত হাদিয়া গ্রহণ করলে আমার মনের ভিতর একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এরকম সন্দেহের অবস্থায় তাদের হাদিয়া গ্রহণ করাও হাদীসের দৃষ্টিতে সুন্নাত পরিপন্থী। তাই তাদের হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হয়। এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে? হযরত তার এ কথার জবাবে বললেন, হাদীসে যে সন্দেহের অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত পরিপন্থী বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদিয়াদাতা হাদিয়া না দিলে তোমার মনের ভিতর একধরনের বিরক্তির সৃষ্টি হয়, আর হাদিয়া না দিলেও তোমার মনের ভিতর বিরক্তির সৃষ্টি না হয় তাহলে ঐ অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করাতে কোনোরূপ সমস্যা নেই।[১২৩]

ভালো মানুষের পক্ষ থেকে হাদিয়া সৌভাগ্যের বিষয়

৫. হযরত বলেন, নেককার মুত্তাকীনদের পক্ষ থেকে কারো কাছে হাদিয়া আসা তার কবুলিয়াতের নিদর্শন। যখন ভালো মানুষদের অন্তরে ভালোবাসা আর মহব্বত স্থান করে নিয়েছে তার অর্থ হলো যে, আল্লাহ তাআলার কাছেও সে মহব্বতের পাত্র।

কোনো এক সময় এক স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী এক ব্যক্তি আমার কাছে বসেছিলো। সে কথার একপর্যায়ে বলল, হাদিয়া সকলের কাছে আসে না। হাদিয়া তো কেবল তাদেরই দেয়া হয়, যারা সরকারের নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক। হাদিয়া আসা হলো সরকারের ঘনিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার আলামত।[১২৪]

সম্পর্ক হওয়ার পর হাদিয়া দেয়া চাই

৬. এক ব্যক্তি হযরত রহ. এর কাছে মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঁচ টাকা হাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে একটা মাসআলা লিখলেন যে, যে খাট স্বর্ণের বা

১২৩। মাকালাতে হিকমত পৃ, ৩

১২৪। কামালাতে আশরাফিয়া ২/১২৪

চাদির তার উপর শোয়া জায়েয নেই, তবে সোনালী কালারের বোতাম লাগানো তো জায়েয, এর কারণ কি?

হযরত তার হাদিয়ার টাকা ফিরিয়ে দিলেন, আর এ কথা লিখে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো ধরনের হাদিয়া গ্রহণ করতে আমার লজ্জাবোধ হয়। আর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় বেশি বেশি সাক্ষাৎ করার দ্বারা অথবা চিঠি আদান প্রদান দ্বারা। এই দুই কাজের সম্পর্কই আপনার সাথে আমার নেই। যেহেতু এখনো পর্যন্ত আপনার সাথে আমার ঐ পর্যায়ের সম্পর্কে পড়ে ওঠেনি, তাই হাদিয়ার টাকা ফিরিয়ে দিলাম, যতদিন পর্যন্ত আপনার সাথে আমার ঐ পর্যায়ের সম্পর্ক গড়ে উঠবে না ততদিন পর্যন্ত আপনি দ্বিতীয়বার আমাকে হাদিয়া পাঠাবেন না।

আর মাসআলার কারণ যে জানতে চেয়েছেন, এটা আলেমদের কাজ, আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ আলেমদের কাছ থেকে শুনে আমল করা, মাসআলার দলিল কি? কারণ কি? সেগুলো তালাশ করবে উলামায়ে কিরাম।[১২৫]

হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করা

৭. এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করা চাই, যে হাদিয়া দেয়ার পর তার প্রতিদানপ্রার্থী হয় না, তা না হলে পরস্পরের মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার উচিত নিজের পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে কিছু দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। যদি প্রতিদান হিসেবে কোনো কিছু দেয়ার সুযোগ না হয়, তাহলে কমপক্ষে তার কিছু গুণকীর্তন বর্ণনা করবে এবং মানুষের সামনে তার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করবে।

গুণকীর্তনের জন্য এই বাক্যটি বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি অনুগ্রহকারীর শুকরিয়া আদায় করতে পারে না, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করাও সম্ভব হয় না। যদি কেউ তোমাকে হাদিয়া দেয়, তাহলে সেগুলোকে কখনোই গোপন রাখবে না, বরং আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে সেগুলোকে প্রকাশ করবে। আবার যা পাওনি তা কখনোই বানিয়ে বানিয়ে বলবে না। যেমন তুমি বললে এটা আমি হাদিয়া হিসেবে পেয়েছি, এটা বড় মন্দ কথা।[১২৬]

হাদিয়া দেয়ার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি

৮. হযরত বলেন, সাথী সঙ্গীদেরকে হাদিয়া দেয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তুমি যাকে হাদিয়া দিতে চাও, তার কাছে দুই-চারটা জিনিসের নাম লিখে পেশ করে

---

[১২৫] । কামালাতে আশরাফিয়া ২/১৩৫

[১২৬] । তালীমুদ্দীন পৃ. ৬৯

বলো, আমি আপনাকে হাদিয়া দিতে চাই, এগুলোর মাঝে হতে কোনটা আপনার পছন্দের। এর যেটা সে নির্ধারণ করবে, সেই জিনিস হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিবে।

এভাবে হাদিয়া দেয়ার দ্বারা গ্রহীতা খুশি হয় এবং হাদিয়াদাতাকে লৌকিকতার পথও অবলম্বন করতে হয় না। হৃদ্যতা ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর হাদিয়া দেয়া, কেননা আরবিতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, হৃদ্যতা ও ভালোবাসার পর যা আসে তাতে কোনো ধরনের কষ্ট থাকে না।[১২৭]

সামান্য জিনিসও হাদিয়া দেয়া যায়

৯. এক ব্যক্তি হযরতকে পাঁচ পয়সা দিয়ে বলল, আমি আপনাকে এক পয়সা হাদিয়া হিসেবে দিলাম আর চার পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিন। মজলিসে তালাশ করে হযরত সেটাকে খুচরা করলেন। অতঃপর এক পয়সা নিয়ে বাকি চার পয়সা হাদিয়াদাতাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর মজলিসের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখ তো এই হাদিয়ার মাঝে রিয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি?[১২৮]

পাগলের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নেই

১০. যে ব্যক্তি মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত তার হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা পাগলের কোনো কাজই সঠিক নয়।[১২৯]

হাদিয়া গ্রহীতার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা

১১. এক ব্যক্তি হযরতকে অনুমতি ছাড়াই বাজার থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এসে হযরতকে হাদিয়া হিসেবে দিলেন। হযরত সেটা পছন্দ করলেন না এবং বললেন, যখন তুমি আমাকে হাদিয়া হিসেবে কোনো কিছু দেয়ার ইচ্ছা করলে, তখন আমাকে পূর্বেই জিজ্ঞাসা করলে না কেন? কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছো আমার এখানে অনেক মিষ্টি রয়েছে, এখন আমি তোমার এই মিষ্টিগুলো কি করব? মাঝখান থেকে তোমার কিছু টাকা পয়সা নষ্ট হলো এবং মিষ্টিগুলোও কোনো কাজে লাগল না।

আমার তো কোনো ছেলে মেয়ে নেই যে, তারা খেয়ে নিবে। আমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী, আর আমরা তো মিষ্টি খাই না। এখন এগুলো অন্যদের মাঝে বন্টন

১২৭। আল কালামুল হুসনু ৯/৮৪
১২৮। আল কামুসুল হুসন ৯/৯৫
১২৯। আলকালামুল হুসন পৃ. ১২০

করে দাও। এছাড়া আর কি করা যাবে। এখন তোমার অনুগ্রহের বোঝা আমার মাথায় রয়ে গেল। এভাবে নেয়ার দ্বারা হাদিয়া গ্রহীতার কোনো লাভ হলো না। কেবল তোমার আত্মসন্তুষ্টির জন্য এটুকু করা যেতে পারে অর্ধেক আমার জন্য রেখে দাও আর অর্ধেক তুমি নিয়ে যাও। যাতে করে তোমার এ কথাও বুঝে আসে, সন্তুষ্টি ছাড়া জিনিস গ্রহণ করলে কেমন লাগে।[১৩০]

অপরিচিত লোকের হাদিয়া গ্রহণ না করা

১২. এক নব আগন্তুক হযরতকে হাদিয়া হিসেবে একটা জায়নামায দিলো, তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার অভ্যাস হলো, যদি কেউ আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই হাদিয়া দেয়, তাহলে আমি তার হাদিয়া গ্রহণ করি না।

এমনিভাবে ঐ ব্যক্তির হাদিয়াও গ্রহণ করি না, যে লৌকিকতার পথ অবলম্বন করে। লোকটি বলল, হযরত আমি আল্লাহর হুকুমে এই হাদিয়া নিয়ে এসেছি। অদৃশ্যভাবে আমার মনে হলো, আমি একটা জায়নামায খরিদ করে আপনার কাছে পেশ করি। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই হাদিয়া গ্রহণ করুন। হযরত মুসকি হেসে বললেন, কি আশ্চর্য কথা। আরে ভাই! আল্লাহর হুকুম তো নবীদের কাছে আসে। আর আপনি তো নবী নন, আপনার কাছে কিভাবে আল্লাহর নির্দেশ আসলো? লোকটি বলল, আমার মনের ভিতর অদৃশ্যভাবে এ কথা উদিত হয়েছে।

হযরত বললেন, আমার অন্তরেও এ কথা উদিত হয়েছে যে, নিয়মবহির্ভূত কোনো হাদিয়া গ্রহণ না করা। লোকটি বলল, তাহলে কোন নিয়মে দিতে হবে, আপনি বলে দিন। হযরত বললেন, আমাকে হাদিয়া দিবে, আবার কিভাবে দিবে, তার পদ্ধতি আমার কাছে জানতে চাচ্ছো? আমার কি লজ্জা শরম কিছুই নেই। নিজেও আত্মমর্যদাহীন আবার আমাকেও আত্মমর্যাদাহীন বানাতে চাচ্ছো।[১৩১]

১৩. আমি যখন কারো হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই, তখন আমি এই ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকি যে, না জানি আল্লাহর অন্যান্য নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায়।[১৩২]

যে মহব্বত ছাড়া হাদিয়া দেয়; তার হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া জায়েয

১৪. কথা-বার্তার ধারাবাহিকতার একপর্যায়ে হযরত বলেন, হাদিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আমি একটি নিয়ম নির্ধারণ করেছি। যখন কেউ আমার কাছে হাদিয়া

---

[১৩০] । কামালাতে আশরাফিয়া পৃ. ৬৩
[১৩১] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৮
[১৩২] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৮

নিয়ে আসে, তখন আমি তাকে কথাগুলো বুঝিয়ে বলি, এরপর তার হাদিয়া গ্রহণ করি। হযরত মাও. মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব, যিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট স্বভাবের মানুষ ছিলেন, হাদিয়া গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার এই অভিমত। তিনিও বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে অভাবী মনে করে হাদিয়া দেয়, আমি তার হাদিয়া গ্রহণ করি না, বাস্তবিকভাবে আমি অভাবি হই বা না হই।

কারণ হাদিয়াদাতার তো এই অধিকার নেই যে, সে আমাকে অভাবী মনে করবে। তবে হ্যাঁ যে আমাকে মহব্বত করে হাদিয়া দেয়, তার হাদিয়া গ্রহণ করি। হযরতের এই অভ্যাস ছিলো যে, তিনি সফরে কারো হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। তিনি তার কারণ উল্লেখ করে বলেন, সে আমাকে দেখার কারণে হাদিয়া দিতে আগ্রহী হয়েছে, এখানে প্রবল সম্ভবনা আছে যে, মহব্বতের তাড়নায় তা দেয়নি। আর মহব্বতের তাড়নায় ঘাটতি দেখা দিলে সে আফসোস করতে থাকবে। প্রকৃত চিকিৎসক হচ্ছেন তিনিই। সাধারণ একটা কাজকে তিনি কত গভীরবাবে চিন্তা করেছেন।[১৩৩]

কোরআন তেলাওয়াত অবস্থায় হাদিয়া দেবে না

১৫. যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করছেন, তাকে তেলাওয়াতরত অবস্থায় অথবা তেলাওয়াতের মজলিসে হাদিয়া দেয়া আদৌ উচিত নয়। আর যদি কেউ হাদিয়া দিয়েই দেয়, তাহলে তেলাওয়াতকারীর জন্য তা গ্রহণ করা উচিত নয়।[১৩৪]

হাদিয়া যেন সুদ-ঘুষে পরিণত না হয়

১৬. যখন কারো কাছে প্রয়োজন নিয়ে যাবে, তখন তার কাছে হাদিয়া নিয়ে যাবে না। কারণ এটা ঘুষ-সুদের মতো হয়ে যায়। আর তাছাড়া অনেক সময় ঐ ব্যক্তি যখন তোমার প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন সে তোমার হাদিয়া গ্রহণ করার কারণে এক ধরনের লজ্জিত হয়।[১৩৫]

মুসাফাহার সময় হাদিয়ে দেয়া উচিত নয়

১৭. অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস, তারা মুসাফাহা করার সময় বুযুর্গদের হাতে টাকা-পয়সা হাদিয়ে দিয়ে থাকে, যা মারাত্মক ভুল। কারণ মুসাফাহা হালো

---

১৩৩ । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৬/২২

১৩৪ । মাকালাতে আশরাফিয়া পৃ. ১২৫

১৩৫ । মাকালাত পৃ. ৯৭

ইবাদত তাতে দুনিয়া অন্তর্ভুক্ত করা আদৌ উচিত নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হাদিয়া তো ইবাদত। তার উত্তরে বলা হবে, আরে ভাই হাদিয়া তো ইবাদতের রূপ নিয়েছে অন্যের কারণে, নিজে নিজেই তো ইবাদাত নয়। আর মুসাফাহা তো স্বয়ংসম্পন্ন নিজে নিজেই ইবাদত।

আর তাছাড়াও তার আরেকটি খারাপ দিক হলো অনেক সময় হাদিয়া গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয় না, যদি এ সময় মুসাফাহার সাথে হাদিয়া দেয়া হয, তখন হাদিয়া ত্রুটিযুক্ত হয়।[১৩৬]

হাদিয়া দিতে গিয়ে যেন অন্যের কষ্ট না হয়

১৮. কারো কাছে হাদিয়া পাঠানোর প্রয়োজন হলে, এমন কারো হাতে পাঠাবে না যার উপর তোমার পূর্ণ আস্থা নেই। কারণ সে হাদিয়া পৌঁছে দেয়ার পর গ্রহীতার কাছে সে পৌছানের প্রমাণপত্র চাইবে। আর কাউকে হাদিয়া দেয়ার পর গ্রহীতার কাছ থেকে পৌঁছানোর প্রমাণপত্র তলব করা আদব পরিপন্থী।[১৩৭]

১৯. মজলিসে বসা এক ব্যি কে কেউ একটা তাসবীহ হাদিয়া দিলে তিনি হাদিয়াদাতাকে তার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত এ কথা শুনে তাকে বললেন, কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তার দাম জিজ্ঞাসা করা হাদিয়ার আদব পরিপন্থী। কারণ এতে করে হাদিয়াদাতা মনে মনে ধারণা করে যে, দাম কম হওয়ায় আমার এই হাদিয়াকে হালকা মনে করেছে।

৪০ ৫৪৪০ ৫৩

১৩৬। মাকালাত পৃ. ৬৭

১৩৭। মাকালাত পৃ. ৮৬

অধ্যায়-১১

সুপারিশের আদবসমূহ

আদব: বর্তমানে সুপারিশের অর্থ হলো, কারো উপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া, অন্যের উপর অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা প্রয়োগ করা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। যদি তুমি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও, তাহলে এমনভাবে সুপারিশ করবে যাতে করে সুপারিশকৃত ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব না হয়। এভাবে সুপারিশ করা শুধু বৈধ নয়, বরং সওয়াবেরও কাজ।

আদব: এমনিভাবে কারো প্রভাব দেখিয়ে কাজ আদায় করাও বৈধ নয়। অর্থাৎ, কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি আপনার আত্মীয়, আপনি তার অধীনস্ত কারো নিকট নিজের কোনো কাজ নিয়ে গেছেন এবং আপনি আপনার প্রভাবশালী আত্মীয়ের পরিচয়ে সেই কাজ করতে বাধ্য করছেন। স্বাভাবিভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সে নিজের মনের সন্তুষ্টিতে করছে না, বরং ক্ষমতাবান ব্যক্তির প্রভাবে করছে। তা না হলে সে রাগান্বিত হবে, এরকমভাবে কাজ আদায়, অথবা জোরপূর্বক সুপারিশ করিয়ে নেয়া হারাম।

আদব: এক লোক তার ছেলেকে সাথে নিয়ে আমার কাছে আসলো। এসে এক মক্তব বিভাগের শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ করে বলল, ঐ মাদরাসার মক্তবের শিক্ষক আমার ছেলেকে মাদরাসা থেকে বহিস্কার করে দিয়েছে। আমি তাকে অত্যন্ত নরম ভাষায় বুঝালাম এবং বললাম, দেখুন ঐ মক্তবে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। লোকটি বলল, আমি শুনেছি আপনিই নাকি ঐ মাদরাসার পরিচালক। তাই আপনি একটু সুপারিশ করলে আমার ছেলেকে তারা ফিরিয়ে নিবে। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ শিক্ষকদের বেতন শুধু আমি দিয়ে থাকি, তবে মাদরাসার পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় আমার কোনো অধিকার নেই। লোকটি আবারো ঐ মাদরাসার মক্তবের শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগল, আমি তাকে বললাম, দেখুন এ কথাগুলো আমাকে বললে নূন্যতমও লাভ হবে না। শুধু গীবতই হবে, আর কিছু গুনাহ হবে।

এরপর লোকটি চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলো এবং মুসাফাহা করতে এসে আবারো বলতে শুরু করল, ঐ মাদারাসার প্রধান শিক্ষক আমার ছেলেকে মাদারাসা থেকে বহিস্কার করে বড় ধরনের অন্যায় করেছে। যেহেতু আমি স্পষ্টভাবে আমার অবস্থানের কথা তার কাছে ব্যক্ত করেছি এবং তার ব্যাপারে আমার কাছে অভিযোগ করতে নিষেধ করেছি। তারপরেও আমার কাছে অভিযোগ করার কারণে কিছুটা রাগান্বিত হয়ে বললাম, বড় আফসোসের কথা আমি আপনাকে বারবার বলছি, আমার কাছে অভিযোগ করলে কোনোই লাভ হবে না, আর তার ফলাফল শূন্য। এরপরেও আমার কাছে ঐ কথা বলার অর্থ কি? এটাতো একজন বুঝ বুদ্ধিহীন মানুষের কাজ। আর অবুঝের সাথে কথা বলা নিরর্থক ছাড়া আর কিছুই না। এরপর লোকটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করল, আমি তার আর কোনো কথা না শুনে ঐ অবস্থায় বিদায় করে দিলাম।

সুপারিশের আরো কতিপয় আদব

আমি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করি না

১. হযরত বলেন, আমি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করে কোনো কিছু লিখে দেই না এবং মৌখিকভাবেও সুপারিশ করি না। কারণ বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে আমানতদারী এবং সততা মোটেও নেই। অনেকে এমন আছে যারা চিঠি নিয়ে চলো আসে এবং সুপারিশ করতে বাধ্য করে। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে এভাবে লিখে দেই। এই ব্যক্তি সুপারিশপত্র আমার কাছে নিয়ে এসেছে, আর তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সুপারিশপত্রে স্বাক্ষর করলাম। উপযোগী মনে হলে আমার সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে আবার উপযোগী মনে না করলে নাও করতে পারে।

বাইআতের জন্য জন্য কারো সুপারিশের প্রয়োজন নেই

২. হযরত বলেন এখন একটা রোগ বা অভ্যাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মুরিদ হতে আরেকজনকে সুপারিশ করার জন্য সাথে নিয়ে আসে। যদি এরকম কারো ব্যাপারে আমি অবহিত হই অথবা জানতে পারি যে, অন্যজনকে সুপারিশ করার জন্য নিয়ে এসেছে, তাহলে আমি তাকে বাইআতই করি না। কারণ এতে সন্দেহ থাকে লোকটি বাইআত হওয়ার ইচ্ছা নেই কিন্তু

সুপারিশকারীর পীড়াপীড়িরি জন্য এসেছে। পবরর্তীতে তার মাঝে এই মনোভাব আর আগ্রহ বাকি থাকবে না। আর যে নিজের আগ্রহ ছাড়া শুধু অন্যের পীড়াপীড়ির জন্য আসে সে আমলে টিকে থাকতে পারে না।[১৩৮]

হযরত মুগিস রা.-এর পক্ষে রাসূল সা.-এর সুপারিশের ঘটনা

৩. রাসূল সা. এর জামানার ঘটনা, হযরত বারিরা রা. রাসূল সা.-এর আযাদকৃত বাদি ছিলো। তিনি হযরত মুগিস রা. এর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। যখন হযরত বারিরা রা. কে রাসূল সা. মুক্ত করে দিলেন তখন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার খিয়ারে ইতক এর কারণে হযরত মুগিস রা. এর বিবাহে থাকা না থাকার স্বাধীনতা অর্জিত হলো। হযরত বারিরা রা. সেই অধিকার বলে মুগিসের বিবাহে না থাকর সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু হযরত মুগিস রা. বারিরা রা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই তিনি হযরত বারিরা রা. এর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলেন না। এজন্য উদভ্রান্তের মতো মক্কার অলিতে গলিতে ফিরতে থাকলেন। রাসূল সা. তার এ অবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন এবং তার উপর অনুগ্রহ হলো। তাই তিনি বারিরা রা. এর কাছে, হযরত মুগিস রা. এর পক্ষ থেকে সুপারিশ নিয়ে আসলেন এবং বললেন, বারিরা! তুমি মুগিসের বিবাহে থাকো।

(পাঠক একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন হযরত বারিরা রা. এর সামনের কথাটা) হজরত বারিরা রা. বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনার নির্দেশ নাকি সুপারিশ? কি এক আশ্চর্যজনক প্রশ্ন ছিলো! বিশ্বনবী সা. উত্তরে বললেন, এটা আমার সুপারিশ, নির্দেশ নয়। রাসূল সা. এর জবাব শুনে বারিরা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই সুপারিশ গ্রহণ করা আমার জন্য সম্ভব নয়।

রাসূল সা. একদম চুপ থাকলেন। কোনো কথা-বার্তা বলেননি। বর্তমানে সময়ে কোনো মুরিদ যদি তার পীর সাহেবের মুখের উপর বলে, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে পীর সাহেব কি পরিমাণ রাগ করতো? পীর সাহেব তাৎক্ষণিক বলে দিতেন, এই মুরিদ মুরতাদ হয়ে গেছে। (এজন্য বর্তমানে পীর সাহেবের জন্য উচিত কারো জন্য সুপারিশ না করা।) যাই হোক পীর সাহেবের ধমকের কারণে মুরিদ যখন একটু নিচু হতো, তখন পীর সাহেব চিন্তা করতো তাকে আরো কিভাবে নিচু করা যায়, যা আদৌ উচিত নয়।

বর্তমান পরিস্থিতি তো এমন, সুপারিশকারী যার পক্ষে সুপারিশ করবে, যদি তার অপকর্মের কারণে সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে বিভিন্নভাবে

---

[১৩৮] । কামালাতে আশরাফিয়া ২/১১২

সুপারিশ করার জন্য বাধ্য করা হয়। এমনকি এ কথা পর্যন্ত বলা হয়, লোকটি এমন কৃপণের কৃপণ, টাকা পয়সা দিয়ে কারো তো উপকার করবেই না, একটু মৌখিকভাবে উপকার করবে, তাও করবে না। এ ব্যাপারে আমার কথা হলো স্পষ্ট, কারো জন্য টাকা পয়সা খরচ করা অনেক সহজ কাজ, কিন্তু কারো অবাস্তব সুপারিশ করা অনেক কঠিন কাজ। আর যেখানেই এই সন্দেহ হয় যে, তাকে অবাস্তব সুপারিশ করলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে, সেখানে সুপারিশ করা আরো কঠিন।[১৩৯]

অনর্থক সুপারিশ করা উচিত নয়

৪. এক ব্যক্তি হযরতের কাছে এসে আবেদন করলেন, হযরত আমি আমার ছেলেকে দন্তবিশেষজ্ঞ ডাক্তার বানানোর জন্য লাহোর পাঠাচ্ছি। লাহোরের ডাক্তারদের সঙ্গে আপনার ভালো সম্পর্ক আছে। তাই যদি আপনি একটু সুপারিশ করে দিতেন, তাহলে সেখানকার ডাক্তারগণ আমার ছেলের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন।

হযরত বললেন, সুপারিশ করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বড় কথা হলো ছাত্র শিক্ষকের মাঝে কি পরিমাণ সম্পর্ক হয়, সেটা দেখা দরকার। এরপর সুপারিশ করলে তখন আপনার ছেলের জন্য ঐ সুপারিশ কাজে আসবে। এজন্য তার পূর্বেই সুপারিশ করা আমি উপযোগী মনে করি না। এখন সুপারিশ করলে আরো সমস্যা সৃষ্টি হবে, আর তা হলো, ডাক্তারি শিক্ষার জন্য যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন, আমি সুপারিশ করলে আমার খাতিরে, সেখানকার ডাক্তারগণ স্বাধীনভাবে আপনার ছেলের উপর সেই বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করতে পারবে না।

এজন্য আমি মনে করছি এখন সুপারিশ করা লাভের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। তাই আপনার ছেলেকে বলে দিন, কাজ শুরু করে দিক। পরবর্তীতে তার প্রতি বিশেষভাবে ল্য রাখার জন্য লাহোরের ডাক্তারদেরকে আমি বলে দিব। প্রতিটি কাজ নিয়ম অনুযায়ী হওয়া চাই। নিয়ম অনুযায়ী কাজ হলে, তা সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয় এবং তার জন্য কারো কষ্টও হয় না।[১৪০]

সুপারিশ করার ক্ষেত্রে হযরতের পদ্ধতি

৫. হযরত বলেন, সুপারিশের ক্ষেত্রে আমর নিয়ম হলো, যার জন্য আমি সুপারিশ করব, তাকে যে নিয়োগ দিবে সে যদি অপছন্দ করে, তাহলে এ ব্যক্তির

---

[১৩৯]। হুসনুল আজিজ, ১/২৬৭

[১৪০]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৮/২৯৭

জন্য সুপারিশ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সীমা লঙ্ঘন করা। সুতরাং শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে কারো জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য কতটুকু বৈধ হবে? এ জন্য এ রকম স্থানে সুপারিশ করা থেকে আমি সম্পূর্ণ বিরত থাকি। অনেকে বলে থাকে সুপারিশের শব্দাবলি লেখার সময় আমি যেন দৃঢ়তার সাথে লিখি। ভালো কথা, আমি দৃঢ়তার সাথে যার জন্য সুপারিশ করব, তাকে নিয়োগদাতা বাধ্য হয়ে নিয়োগ দিবে, কাউকে তার অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়।

এ কারণে আমাকে অনেকে কৃপণও বলে থাকে। আবার অনেকে বলে, সামান্য একটা কথা বললে অথবা কলম দ্বারা লিখে দিলেই তো তার কাজটা হয়ে যেত কিন্তু সেটাও করে না। এক্ষেত্রে আমার জবাব হলো, অন্যের উপকার করা আমার জন্য মুস্তাহাব। কিন্তু তার উপকার করতে গিয়ে আরেকজনকে কষ্ট দেয়া বা তার ক্ষতি করা তো হারাম। সুতরাং কারো সামান্য উপকার করতে গিয়ে আরেকজনের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারি না।[১৪১]

সুপারিশের উৎস হলো কোরআনুল কারীম

৬. এক আগন্তুক এসে হযরতের কাছে কোনো ব্যাপারে সুপারিশের আবেদন করল, হযরত বললেন, সুপারিশের মূল উৎস হলো আল কোরআন। সুপারিশের জন্য কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে, কিভাবে সুপারিশ করতে হবে, সে ব্যাপারে কুরআনে কারীম থেকে একটি নির্দেশনা শোন।

অবশ্যই তোমরা সূরা কাহাফে হযরত মুসা আ. ও খিজির আ. এর ঘটনা শুনেছ। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ. কে হযরত খিজির আ. এর কাছে গিয়ে ইলম অর্জন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে হযরত খিজির আ. এর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। খিজির আ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন এসেছেন? হযরত মুসা আ. বললেন,

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

অর্থাৎ আমি ইলম অর্জন করার জন্য আপনার কাছে অবস্থান করতে চাই। এতবড় সম্মানিত জালিলুল ক্বদর একজন নবী হযরত খিজির আ.কে বললেন আমি আপনার সাথে ইলম অর্জন করার জন্য অবস্থান করতে চাই। অর্থাৎ হযরত মুসা আ. এর ইলমের সামনে হযরত খিজির আ. এর ইলম তো কিছুই না। তারপরেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দরখাস্ত করলেন।

[১৪১]। কামালাতে আশরাফিয়া ৪/২

যা হোক এটাতো ঘটনা। কিন্তু গভীরভাবে খেয়াল করা দরকার, কি আশ্চর্য কথা যে, হযরত মুসা আ. হযরত খিজির আ. এর কাছে এসে এ কথা বলেননি যে. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমি প্রেরিত। যদি এমন বলতেন তাহলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ হতো, কিন্তু তিনি তা বলেননি।

এর দ্বারা বুঝে আসে যে, আজকাল যে সুপারিশ নিয়ে যাওয়া হয়, অথবা গিয়ে কারো নামের দাপট দেখানো হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অন্যের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার জন্য তা বাস্তবায়ন করা কষ্টের কারণ হয়। বাস্তব জ্ঞানের ধারক বাহক হলেন হযরত আম্বিয়া আ.। সকল ক্ষেত্রে তারা আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয়। দেখুন হযরত মুসা আ. এর আবেদনের মাঝে কি পরিমাণ আদব ছিলো। এখানে দাপট দেখিয়ে নিজের অধিকার আদায় করেননি। এমনকি এটুকুও বলেননি যে, আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এসেছি। কেননা এ কথা শুনলে হযরত খিজির আ. এর স্বাধীনতা খর্ব হতো এবং শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি যে শর্তারোপ করেছেন, সেগুলো স্বাধীনভাবে করতে পারতেন না। এর দ্বারা এ কথাও বুঝে আসে যে, কারো অনুমতি ছাড়া তার নাম ব্যবহার করে উপকৃত হওয়াও জায়েয নেই।

এমনিভাবে অনেক তালিবে ইলম এমন আছে যারা অন্য মাদরাসায় গিয়ে আরেকজনের মেহমান হয় এবং কারো অনুমতি ছাড়াই দরসে বসে, যা মূলত ভুল পদ্ধতি। আর কারো কাছে গিয়ে এ কথাও বলবে না যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি পাঠিয়েছে।[১৪২]

ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে সুপারিশ করা ঠিক নয়

কোনো এক তালিবে ইলম এসে আমাকে বলল, হযরত দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম সাহেব আমাকে কোনো এক ভুলের কারণে মাদরাসা থেকে বহিস্কার করেছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি যদি একটি চিঠি লিখে দিতেন. তাহলে আমাকে আবারো তার মাদরাসায় ফিরিয়ে নিত। হযরত বললেন, আমার তো পূর্ণ ঘটনা জানা নেই যে, কোন ভুলের কারণে তোমাকে মাদরাসা হতে বহিস্কার করেছে। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে মাদরাসার নিয়ম কানুনের অধীনে বহিস্কার করেছে? নাকি অন্যায়ভাবে বহিস্কর করেছে? ছেলেটি বলল, মাদরাসার নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকেই বহিস্কার করেছে।

---

[১৪২]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা ৩/২৬৪

হযরত বললেন, যদি নিয়মের অধীনে বহিস্কার করে থাকে। তাহলে আমার সুপারিশের অর্থ কী? অবৈধ হস্তক্ষেপ, যে নিয়ম কানুনের কোনো তোয়াক্কা নেই, যখন মন চায় যাকে ইচ্ছা তাকে বহিস্কার করল, আবার যখন মন চায় যাকে ইচ্ছা তাকে ফিরিয়ে নিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার জানা না থাকার কারণে আমি তো বুঝতে পারছি না যে, তোমার অপরাধটি ছোট নাকি বড়, এমনিভাবে তোমার অপরাধটা সংক্রামক কিনা? ভবিষ্যতে আবার তার পুনারাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে কিনা? এই সকল বিষয় একমাত্র মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ভালো বুঝবে।

তুমি দীর্ঘ দিন যাবৎ ঐ মাদরাসায় লেখাপড়া করছো, তোমার সকল বিষয়েই সে পূর্ণ জ্ঞাত। আমি কারো উপর ভরসা করে এবং কিসের ভিত্তিতে তোমার জন্য সুপারিশ করব। আর তাছাড়া আমি কারো সুপারিশের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে সতর্কতার পথ অবলম্বন করি। যখন দেখি নিশ্চিত কাজটি হবে, তখন আমি সুপারিশ করা জায়েয মনে করি। যখন দেখি কাজটি হওয়ার প্রবল ধারণা আছে, তখনও আমি সুপারিশ করা নাজায়েয মনে করি। বর্তমান সময়ে সুপারিশ করা হলো অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি করা, যা মূলত শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

যদি কোনো জায়গা এমন হয় যে, আমি সুপারিশ করলে, আমার এই সুপারিশ অন্যের উপর বল প্রয়োগ হবে না এবং সুপারিশ গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে সে পরিপূর্ণ স্বাধীন, তখন সুপারিশ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। বাস্তব ক্ষেত্রে এধরনের সুপারিশ হলো, মাশওয়ারার একটি অংশ। আর যেই সুপারিশ অন্যের জন্য চাপ সৃষ্টি এবং তার স্বাধীনতা খর্ব হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে না জায়েয।

৭. এক ব্যক্তি সুপারিশ নেয়ার জন্য হযরত থানবী রহ.-এর কাছে আসলে হযরত তাকে সুপারিশের মন্দ দিকগুলো শোনালেন। এরপরও লোকটি সুপারিশ প্রার্থনা করল। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে বললেন, একটা কাগজের টুকরা লিখে নিয়ে আসো, যাতে লেখা থাকবে যে, আমি সুপারিশ প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত করছি। আমি তাতে শুধু স্বাক্ষর করে দিব। তার কারণ হলো, যার কাছে এই সুপারিশ পেশ করবে, সে যেন এ কথা বুঝে নেয় যে, লোকটি সুপারিশপ্রার্থী হওয়ার কারণে, বাধ্য হয়ে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। এখন আমার গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তখন আমার স্বাক্ষর সুপারিশ গ্রহণকারীর জন্য চাপ সৃষ্টি হবে না এবং তার স্বাধীনতাও খর্ব হবে না।

যাই হোক, লেকাটি একটা কাগজে সুপারিশের দরখাস্ত নিয়ে আসলে আমি তাতে স্বাক্ষর করে দিলাম, এই খেয়ালে যে, যাতে করে সুপারিশ প্রার্থী নিজেও তাদ্বারা

অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার না করে এবং সুপারিশ গ্রহীতার উপরও চাপ সৃষ্টি না হয়।
এখন সুপারিশপ্রার্থী আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর সুপারিশ গ্রহীতা আমার
জন্য দোয়া করবে, আর এতে আমাকেও নাজায়েয কোনো কাজ করতে হলো
না। শেষ পর্যায়ে চিঠির খামের উপর আমি এ কথাও লিখে দিলাম যে, লোকটি
খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করবে। এর কারণ হলো যাতে করে সে অন্যের জন্য
কষ্টের কারণ না হয় এবং আমার সুপারিশের অবৈধ ব্যবহার করে মাসের পর
মাস বসে বসে অন্যের কাছে খেতেও না পারে।

ഇ ঙঙ্গ ঙ

অধ্যায়-১২

সন্তান লালন-পালনের আদবসমূহ

আদব: বাচ্চাদের সাথে বেশি হাসি ঠাট্টা করবে না এবং তাদেরকে কোনো উচু জায়গায় ঝুলিয়ে রাখবে না। কারণ যে কোনো মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। এমনিভাবে হাসাহাসি করতে করতে তাদের পেছনে দৌড়াবে না, কারণ অসতর্কতাবশত পড়ে গিয়ে সে আহত হতে পারে।[১৪৩]

আদব: শিশুদের সামনে লজ্জাজনক কোনো কথা-বার্তা বলবে না।

সন্তান লালন-পালনের আরো কিছু আদব

সন্তান প্রতিপালনের জন্য নারীদের সংশোধন হওয়া আবশ্যক

সন্তান প্রতিপালনের জন্য নারীদের সংশোধন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা নারীরা খুব সহজেই সংশোধন হতে পারে। কারণ তাদের মাঝে নম্রতা ও লাজুকতার প্রাধান্য রয়েছে। আর নারীরা সংশোধন হলে তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ সন্তানেরা শিক্ষিত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়। কারণ মায়ের প্রভাব সন্তানের উপর শুরু থেকে পড়ে এবং তাদের আদর্শে আদর্শবান হয়ে ওঠে।[১৪৪]

---

[১৪৩]। বেহেস্তী জেওর
[১৪৪]। হুসনুল আজিজ ৯/২০

নারীদের সংশোধন হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তারা বেশি বেশি দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যায়ন করবে। আর যদি লেখাপড়া না জানে তাহলে স্বামী তাদেরকে সংশোধন করবে এবং দীনি কিতাবাদি পাঠ করে শোনাবে। এতে সে সংশোধন হোক বা না হোক কমপক্ষে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে।[১৪৫]

সন্তান লালন-পালনের কিছু দিক নির্দেশনা

১. সন্তানদের লালন পালন করা তো এমনিতেই সওয়াবের কাজ, কিন্তু মেয়েদের লালন পালনের সওয়াব আরো বেশি।[১৪৬]

২. সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে না বেশি কঠোরতা অবলম্বন করবে, না বেশি শিথিলতা হবে; বরং এক্ষেত্রে উত্তম হলো মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এগোবে।[১৪৭]

৩. ঘরের সবাইকে খুব ভালোভাবে সতর্ক করবে, যাতে সন্তানকে ঘরের বাইরের কোনো কিছু না খাওয়ায়। যদি কেউ কোনো কিছু খাবারের জন্য দেয় তাহলে বাড়িতে এনে মাতা পিতাকে দিবে, এরপর তারা সন্তানকে খাওয়াবে, নিজে নিজে খাবে না।

৪. যখন সন্তানের একটু বুঝ বুদ্ধি হবে, তখন নিজ হাতে খাবারের অভ্যস্ত করাবে। খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে দিবে। ডান হাতে খাবার খাওয়ার শিক্ষা দিবে। কম খাওয়ানোর অভ্যস্ত করাবে, তাহলে রোগব্যধি ও লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকবে।

৫. বাচ্চাকে মাজন এবং মেসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্ত করাবে।

৬. সন্তানকে খুব ভালোভাবে অভ্যস্ত করে তুলবে যাতে করে সে আপন মাতা পিতা ছাড়া অন্যের কাছে কোনো কিছু না চায় এবং অন্য কেউ কোনো কিছু দিলে মাতা পিতার অনুমতি ছাড়া তা গ্রহণ না করে।

৭. বেহেস্তী জিওরের সপ্তম খন্ডে খানাপিনা, চলাফেরা, উঠাবসার যে সমস্ত আদব লেখা হয়েছে, সন্তানের ছোট থেকেই সেগুলোর ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলবে। কখনোই এরূপ ভরসা করবে না যে, বড় হয়ে নিজে নিজেই শিখে নিবে, অথবা নিজে পড়ে নিবে। স্মারণ রাখবে নিজে নিজেই কোনো কিছু শিখে না, পড়ার দ্বারা ঐ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, কিন্তু তার অভ্যাস গড়ে ওঠে না।

---

[১৪৫]। হুনুল আজিজ ৬/৭৪

[১৪৬]। তা'লীমুদ্দীন

[১৪৭]। হুসনুল আজিজ ১/১৬৮

যতদিন পর্যন্ত ভালো কাজের অভ্যস্ত হয় না, ততদিন পর্যন্ত লেখাপড়া জ্ঞানার্জন কোনোই কাজে আসে না, বে-আদবী দুষ্টুমি এবং অন্যকে কষ্ট দেয়ার অভ্যাস থেকেই যায়।

৮. ছেলেদেরকে শিক্ষা দিবে যাতে করে সে, মানুষদের সামনে বিশেষ করে মহিলাদের সামনে ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

৯. তোমার সন্তান যদি অন্যের কাছে অপরাধ করে, অথবা কোনো অন্যায় করে থাকে, তাহলে কখনোই সন্তানের পক্ষাপাতিত্ব করবে না। বিশেষ করে তার সামনে। কেননা এরূপ করার দ্বারা সন্তানের অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়।

১০. বাচ্চাদেরকে ভালো করে দেখে-শুনে রাখবে, যাতে করে চাকর চাকরানী বা তাদের সন্তানদেরকে কষ্ট না দেয়। কেননা এই সমস্ত লোক লজ্জার কারণে মুখে কোনো কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দেয়, আর অভিশাপ যদিও না দেয়, কিন্তু অন্যের উপর জুলুম করা তো মারাত্মক অন্যায়।

১১. সন্তানকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে চাও, যত্দূর সম্ভব সে বিষয়ের এমন একজন শিক্ষক নির্বাচন করবে যে, ঐ বিষয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। অনেকে আছে তারা অল্প টাকায় অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। এর দ্বারা সন্তানের শিক্ষার বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তার সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে।[১৪৮]

১২. ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া বা প্রহার করা আদৌ উচিত নয়, না আপন সন্তানকে না ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। বরং এমন অবস্থায় দূরে সরিয়ে দিবে, অথবা নিজেই সরে যাবে। এরপর যখন রাগ কমে যাবে তখন চিন্তা করে, উপযোগী মনে করলে শাস্তি দিবে।

১৩. ছোট বাচ্চাদের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হলে লাথি ঘুষি অথবা মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করবে না এবং খুব সাবধানতা অবলম্বন করবে, যাতে কোনো নাজুক জায়গায়, অর্থাৎ চেহারা, মাথার বা লজ্জাস্থানে লেগে না যায়, কারণ এতে মারাত্মক অসুবিধা হবে।[১৪৯]

১৪. অনেকে মনে করে থাকে প্রাথমিক কিতাবাদি পড়ানোর জন্য সাধারণ শিক্ষকই যথেষ্ট। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। মানুষেরা মনে করে, মিজানে এমন গুরুত্বপূর্ণ কি আছে? আমি মনে করি মিজান একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, মিজান

১৪৮। বেহেস্তী জিওর ১০

১৪৯। বেহেস্তী জিওর ১০

এবং মিজানের মতো যে সমস্ত প্রাথমিক কিতাব আছে সেগুলো পড়ানোর জন্য বড় যোগ্যতাসসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি এমন হতে হবে যে, ঐ বিষয়ের উপর তার পরিপূর্ণ পান্ডিত্য রয়েছে।[১৫০]

১৫. সন্তানকে মা-বাবা, দাদা-দাদীসহ পূর্ণ স্থায়ী ঠিকানা মুখস্থ করিয়ে দিবে এবং মাঝেমাঝে তার কাছ থেকে শুনবে। যাতে করে সে ভুলে না যায়। এতে বড় উপকার হলো, আল্লাহ না করুন যদি কখনো বাচ্চা হারিয়ে যায়, তাহলে যখন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমর বাড়ি কোথায়? তোমার মা-বাবার নাম কি? ইত্যাদি যদি বাচ্চার মুখস্থ থাকে, তাহলে সে বলে দিতে পারবে এবং সহজেই কোনো না কোনো ব্যক্তি তোমার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে।[১৫১]

১৬. যে সকল ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে, তাদেরকে শারীরিক এবং মস্তিস্কের শক্তিবর্ধক খাবার সব সময় খাওয়াবে।

১৭. যে সকল মেয়েরা বাইরে যায়, তারা স্বর্ণের গহণা পরবে না। কারণ এতে জান মাল উভয়টা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

১৮. মেয়েদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ দিবে যাতে করে তারা ছেলেদের সাথে খেলাধুলা না করে, কারণ এতে উভয়ের স্বভাবে অভ্যাসের বিকৃতি ঘটে। যদি অন্যের ছেলে বাসায় আসে তার পরেও, যদিও সে ছোট হোক না কেন, মেয়েদেরকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

১৯. যে সমস্ত মেয়ে তোমার কাছে পড়তে আসে তাদের দ্বারা বাসায় কাজ করাবে না। পাশাপাশি তাদেরকে ছোট সন্তান কোলে দিয়ে ঘোরাফিরা করতে বাইরে পাঠাবে না। বরং সর্বদা এই চিন্তা করবে, সেও আমার সন্তান। তাদের শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাকর্মগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যেমন খাবার রান্না, কাপড় সেলাই ইত্যাদি।

২০. অনেক কাজ এমন আছে যেগুলো শেখানো ছাড়া শুধু প্রাকৃতিকভাবে শেখা হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রস্রাব, পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ না করা, কোন কোন জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে, শৌচকার্য কিভাবে সম্পন্ন করবে, এগুলো শিখাতে হবে।[১৫২]

---

[১৫০]। কালিমাতুল হক পৃ ১৮০

[১৫১]। বেহেস্তী জিওর ১০

[১৫২]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা পৃ. ৩৮

২১. অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস যে, কেউ দাওয়াত দিলে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে যায়। এ কাজগুলো আদৌ উচিত নয়। এতে বাচ্চাদের স্বভাব নষ্ট হয়।[১৫৩] হযরত বলেন, আমার বাবা মিরাঠে থাকতেন। শৈশবে আমরা দুই ভাইও মিরাঠে থাকতাম। যেদিন মসজিদে কুরআন খতম হতো, সেদিন বাবা আমাদের দুইভাইকে ডেকে বলতেন, দেখ, আজ তোমরা মসজিদে যাবে না। অল্প একটু মিষ্টি পাওয়ার আশায় মসজিদে যাবে, এটা কেমন কথা, তাও তো আবার পাওয়া না পাওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। আর যদি পাও তাহলে কি অপদস্থ অবস্থায় পাবে সেটাও তো চিন্তার বিষয়। আমি তোমাদেরকে বাজার থেকে আরো ভালো এবং বেশি মিষ্টি এনে দিব। এমনিভাবে তিনি আমাদেরকে দাওয়াতে সাথে নিয়ে যেতেন না, যাতে করে অভ্যাস খারাপ হয়ে না যায় এবং হীনমন্যতার সৃষ্টি না হয়। তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত কৌশলে সুন্দর আদব শিখিয়েছেন।[১৫৪]

২২. অধিকাংশ লোকই শৈশবে সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। আর বলে এখন তো ছোট আছে, যখন বড় হবে তখন শিখে নিবে। অথচ শৈশবই শিক্ষা দীক্ষার জন্য উপযুক্ত সময়, শৈশবে সন্তানকে যে রীতিনীতিতে গড়ে তোলা হয়, সারা জীবন সেই রীতিনীতি, অভ্যাস তার মাঝে স্থায়ী হয়। এই সময়ই শিক্ষা দীক্ষা, আচার আচরণ ও উন্নত স্বভাব চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়।[১৫৫]

২৩. জনৈক ব্যক্তি বড় জ্ঞানগর্ভপূর্ণ কথা বলেছেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। তিনি বলেন, সন্তান যদি তোমার কাছে কোন কিছু চায় তাহলে হয়তো প্রথমেই তার চাহিদা পূরণ করে দিবে। যদি প্রথমবার তার চাহিদা পূর্ণ না করো, তাহলে পরবর্তীতে সে যতই জেদ করুক না কেন, তার ঐ জেদ কিছুতেই পূরণ করবে না। তা না হলে তার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। মোটকথা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বড় প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে।

২৪. বর্তমানে মানুষেরা সন্তানকে এমনভাবে লালন পালন করে, যেভাবে কসাই ষাড়কে লালন পালন করে। কসাই ষাড়কে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ায়, সুন্দর জায়গায় রাখে, ভালো ভালো ঘাস-পাতা খাওয়ায়, যাতে করে অতিদ্রুত মোটা তাজা হয়ে সুঠাম দেহের অধিকারী হয়। পরিণামে উদ্দেশ্য থাকে গলায় ছুরি চালানো। এমনিভাবে বর্তমান সমাজের লোকজনও অত্যন্ত আরাম আয়েশ আদর

১৫৩। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়া পৃ. ৩৮

১৫৪। কালিমাতুল হক পৃ. ১৫৮

১৫৫। হুসনুল আজিজ ৩/১৭৬

যত্ন করে সন্তান লালন পালন করে, শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামের লাকড়ি হয়। তাদের এভাবে গড়ে তোলার কারণে তার মা বাবা যারা জান্নাতের অধিকারী হয়েছিলো, তাদেরকেও ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হয়। কারণ ঐ আরাম আয়েশ করাতে গিয়ে সন্তানকে নামায রোযা শিখায়নি, ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত করায়নি। কিছু নির্বোধ তো এমন আছে, যারা তার সন্তানকে ইসলামের কোনো বিধি নিষেধই শিক্ষা দেয় না।[১৫৬]

২৫. আমি সবসময় এ কথা বলে থাকি, যে সকল বাচ্চারা স্কুলে লেখাপড়া করে, তাদেরকে বন্ধকালীন সময়গুলোতে কোনো আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে রাখা, যদিও সেখানে গিয়ে সে ঠিকমত নামায আদায় না করুক, অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী না করুক, এতে করে তাদের আকায়েদগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

এখন তো স্কুলের ছেলে মেয়দের স্বাধীনতা অনেক বেশি, যা পূর্বযুগে যারা স্কুল কলেজে পড়েছে, তাদের মাঝে ছিলো না। যার কারণে বর্তমানের ছেলে মেয়েদের ঈমান আক্বীদা পূর্ববর্তী ছেলে মেয়েদের তুলনায় অনেক খারাপ। এর মূল কারণ হলো, পূর্ববর্তী যুগের ছেলে মেয়েদের লালন পালন হতো কোনো ধার্মিক, আল্লাহওয়ালাদের তত্ত্বাবধানে।

আর বর্তমান যুগের ছেলে-মেয়েদের লালন পালন হয় ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের তত্ত্বাবধানে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরো বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমান সময় বড় নাজুক সময়। এখনই এগুলো প্রতিকারের উপযুক্ত সময়।[১৫৭]

২৬. প্রিয় বন্ধুগণ! বড় আফসোসের কথা, বর্তমান সময়ের অবস্থা তো এমন যে, লোকজন তাদের ছেলেদের জন্য ফুটবল খেলার সময় বের করতে পারে কিন্তু নিজ সন্তানের চরিত্র গঠন ও ইসলামী সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার সময় পায় না।

এজন্য আমি বড় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তোমাদেরকে বলছি, যদি নিজ ছেলে-সন্তানের জন্য প্রকৃত মঙ্গল কমনা করো, তাহলে যেমনিভবে প্রতিদিন অন্যান্য সকল কাজের জন্য রুটিন আছে ঠিক তেমনিভাবে প্রতিদিন সন্তানদের জন্য কিছু না কিছু সময় আদব আখলাক শিখার জন্যও নির্ধারিণ করে নাও, যে অমুক মসজিদে অমুক জায়গায়, অমুক বুযুর্গের নিকট গিয়ে কিছু সময় বসে থাকবে, তাদের কাছে থেকে আদব শিখবে। যদি নিজ শহরে এরকম বুযুর্গ ব্যক্তি না থাকে, তাহলে বন্ধকালীন সময়ে কোনো বুযুর্গের কাছে পাঠিয়ে দিবে। বর্তমানে কেউই এগুলোর পিছনে সময় দেয় না, কে বা কার কথা শোনে।

---

[১৫৬] । তারিকুন নাজাত পৃ. ১০৬-১০৭

[১৫৭] । হুসনুল আজিজ ৩/৬৩১

বড় দুর্ভাগা তারা, দিন রাত ঘোরাফিরা করে, নামায রোজার কোনো খবর নেই। মা- বাবা তো অত্যন্ত খুশি, আমরা নিজেরা তো নামায রোযা করছি, ছেলে সন্তান না করলে কি হয়েছে, অথচ তাদের জন্যই বড় অমঙ্গল, কিয়ামতের দিন এ সমস্ত সংতান হবে জাহান্নারে লাকড়ি।

এরা মুসলমানের সন্তান, মুসলিম দম্পতির কোলে পিঠে বড় হয়েছে, অথচ তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নামের আগুন আর বিভিন্ন শাস্তি চারপাশ থেকে তাদেরকে ঘিরে রাখবে। অথচ পিতা হিসেবে আপনি খুব গর্ভবোধ করছেন যে, আপনার সন্তান আইএ বিএ, মাস্টার্স পাস করেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তো আপনি সন্তানকে জাহান্নামের পথে ছেড়ে দিয়েছেন। চোখ এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন যে, জান্নাতের পথ তাদের নজরেই আসে না।[১৫৮]

ঞ ঔঋ ঐ

অধ্যায়-১৩

চিঠি-পত্রের আদবসমূহ

আদবঃ যে চিঠির প্রাপক তুমি নও, সে চিঠি কখনোই তুমি দেখবে না, না তার উপস্থিতিতে, না তার অনুপস্থিতিতে। অনেক মানুষের স্বভাব হলো তারা আড়চোখে অন্যের লেখা দেখে, এটা বড় অন্যায়।

আদবঃ এমনিভাবে যদি কারো সামনে কাগজপত্র রাখা থাকে, সে কাগজ উঠিয়ে কখনোই দেখবে না। কারণ হতে পারে সে এ বিষয়টি তোমার থেকে গোপন করতে চায়। যদিও ওই কাগজটি কোনো সংরক্ষিত জায়াগায় রাখা হয়নি। এজন্য কারো কাছে গেলে এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।

আদবঃ জনৈক ব্যক্তি চিঠিতে কিছু বিষয় লিখে তার উত্তর জানতে চাইলো এবং এ কথাও লিখে পাঠাল যে, আপনার নামে পাঁচ টাকা মানি অর্ডারে পাঠালাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, টাকা পাওয়ার পর পাওনা টাকার রশিদ এবং চিঠির উত্তর একসাথে লিখে পাঠাব, এর মাঝে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বুঝলাম না কি কারণে যেন টাকা আসলো না, তাই মনে করলাম চিঠির উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেই।

১৫৮। তরিকুন নাজাত পৃ. ১০৮

এর মাঝে আরো কয়েকদিন এভাবেই কেটে গেল। এরপর তার প্রশ্নের উত্তর লিখলাম। উত্তরে এ কথাও লিখলাম যে, একই চিঠিতে, টাকা পাঠানোর সংবাদ এবং প্রশ্নের উত্তর চাওয়া ঠিক নয়, কারণ এতে প্রাপক- প্রেরক উভয়েই সমস্যার সম্মুখীন হয়।

আদব: কোনো এক জায়গা থেকে সীলযুক্ত খামের ভেতর আমার নামে পঞ্চাশ টাকা আসলো; কিন্তু খাম খোলা ছাড়া টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য জানা সম্ভব নয় যে, কোন উদ্দেশ্যে কে টাকা পাঠিয়েছে। আবার চিন্তা করছিলাম, চিঠি খুলে যদি এমন কোনো উদ্দেশ্যের কথা লেখা থাকে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যার কারণে বাধ্য হয়ে ওই টাকা পরবর্তীতে ফেরত পাঠাতে হবে অথবা তার উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে লেখা না থাকার কারণে আমাকে আবার সে ব্যাপারে খোঁজ খবর জানাতে হবে। সেগুলো খোঁজ খবর নিতে গিয়ে অযথায় আবার টাকাগুলো আমার কাছে আমানত রাখতে হবে।

আবার যদি ফেরত দিতে যাই তাহলে অযথা আমাকে আরো কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে হবে এবং বর্ধিত একটা ঝামেলা পোহাতে হবে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, আমার সাথে পূর্ব যোগাযোগ ছাড়াই আমার যাওয়ার জন্য টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ আমি অসুস্থতা অথবা ব্যস্ততার কারণে যেতে পারিনি। অথবা টাকাটা কি কাজের জন্য খরচ করব, সে কথা লেখা না থাকার কারণে আমাকে পত্র মারেফতে আবারো জানতে হচ্ছে। অথবা আমি তো জানার জন্য ঠিকই পত্র পাঠিয়েছি, কিন্তু তার উত্তর লিখতে অনেক দিন বিলম্ব হচ্ছে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে তার মুখাপেক্ষি হতে হয়। আর যাদের ব্যস্ততা বেশি তারা এ সমস্ত কারণে ব্যথিত হয়, আবার কেউ আছে তারা কষ্ট পায়। তাই আমি এত ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাম না খুলে টাকাটা ফিরিয়ে দিলাম। কারণ যে এভাবে টাকাটা পাঠিয়েছে, সে যদি আমার মতো মৌলভী হয়, তাহলে তার টাকা আবশ্যকীয়ভাবে ফিরিয়ে দেয়া, আর যদি আমার মত না হয়, তাহলে তার টাকা স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে দেয়াই উচিত।

এজন্য যে, যার কাছে টাকা পাঠাবে তার কাছে পূর্ব অনুমতি না নিয়ে শুধু টাকা পাঠিয়ে দেয়া আদৌ উচিত নয়। বরং টাকা পাঠানোর পূর্বে অনুমতি নিবে, যদি অনুমতি দেয় তারপর টাকা পাঠাবে। অথবা মানি অর্ডারের কাগজে প্রেরকের নাম ঠিকানা স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিবে, যাতে করে প্রাপক নিশ্চিত হতে পারে। অতঃপর তার মন চাইলে সে গ্রহণ করবে, অথবা মন চাইলে ফিরিয়ে দিবে।

আদব: এই আদবের অধীনে চিঠি পত্রের আরো জরুরি কিছু নিয়ম নীতি লেখা হলোঃ

১. চিঠির লেখার বিষয়বস্তু অত্যন্ত পরিস্কার এবং স্পষ্ট হওয়া চাই।

২. চিঠিতে নিজের বিস্তারিত ঠিকানা লেখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ প্রাপকের জন্য আবশ্যক নয় যে, প্রেরকের ঠিকানা সে মুখস্ত করে রাখবে।

৩. যদি পূর্বের চিঠির কোনো কথা পরের চিঠিতে লেখা প্রয়োজন হয়, তাহলে পূর্বের চিঠির কথাগুলোতে দাগ দিয়ে চিহিত করে দিবে। অতঃপর এ চিঠির কথাগুলোতে দাগ দিয়ে চিহিত করে দিবে। অতঃপর এর চিঠির সাথে পাঠিয়ে দিবে। তাহলে পূর্ব পরের কথা বুঝার জন্য প্রাপকরেক কষ্ট করতে হবে না। কেননা অনেক সময়, পূর্বের চিঠির কথা মোটেও স্মরণ থাকে না।

৪. এক চিঠিতে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর চাইবে না, যার উত্তর দেয়া উত্তরদাতার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। চার পাঁচটা প্রশ্নই একসাথে অনেক বেশি। এগুলোর উত্তর পাওয়ার পর, বাকি প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীতে চাইবে।

৫. যার মাধ্যমে চিঠি পাঠাচ্ছো সে যদি কর্মব্যস্ত লোক হয়, তাহলে তার মাধ্যমে সংবাদ অথবা সালাম পৌঁছানো থেকে বিরত থাকবে। এমনিভাবে যারা সম্মানিত বা নিজের থেকে বয়সে বড় তাদেরকেও এমন দায়িত্ব দিবে না। যা তোমার জানার দরকার, সেই মূল বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে লিখে দিবে। প্রাপকের জন্য যে কাজ করা উপযোগী নয়, তাকে সেই কাজের নির্দেশ দেয়া বড় ধরনের অন্যায়।

৬. নিজ প্রয়োজনে কারো বিয়ারিং খামে চিঠি পাঠাবে না।

৭. বিয়ারিং খামে উত্তর তলব করবে না, কারণ অনেক সময় পিয়ন উত্তর তলবকারীকে না পেয়ে সে চিঠি ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এতে উত্তরদাতার উপর অনর্থক জরিমানা লাগে।

৮. উত্তরের চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো অভদ্রতার পরিচয়। এজন্য যে, হেফাজতের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত চিঠি এবং রেজিস্ট্রিবিহীন চিঠি সমান। তবে রেজিস্ট্রি চিঠির ক্ষেত্রে এটুকু নিশ্চিত থাকা যায় যে, প্রাপক তা নিশ্চিত পাবে। নিজের মুরুব্বীদের এরকম চিঠি না পাঠানো, কারণ এর অর্থ হলো, তাকে মিথ্যার ব্যাপারে সন্দেহ করা। এটা বড় ধরনের বে-আদবি।

এ ধরনের সামাজিক বিষয়ের আরো অনেক আদব বেহেস্তী জেওরের ১০ খন্ডে লেখা হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিবে। অচিরেই আরো কিছু আদব বেহেস্তী জিওর থেকে উল্লেখ করা হবে। ইনশাআল্লাহ। এসব আদবের সারমর্ম হলো সর্বদা নিজের মাঝে এই ফিকির রাখবে যে, আমার কথা কাজ অন্যের জন্য বোঝা, অথবা অস্থিরতার অথবা সংকীর্ণতার কারণ হচ্ছে না তো? যদি কখনো

নিজের কাছে মনে হয় যে, আমার কাজ কথা অন্যের জন্য বোঝা বা কষ্টের কারণ হচ্ছে, তখন সেগুলো থেকে বিরত থাকবে। এটাই হলো সুন্দর সামাজিকতার মূল কথা। যে ব্যক্তি সর্বদা এটাকে স্মরণ রাকবে, সে ব্যক্তি এই সামাজিক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। এজন্য এ বিষয়ের আলোচনা আর বৃদ্ধি করা হলো না।

তবে এই নিয়মের অধীনে সফলতা অর্জনের জন্য আরো কিছু কাজ করতো হবে। তা হলো কথা বলা অথবা কাজ করার পূর্বে একটু ভেবে নিতে হবে যে, আমার এই কথা বা কাজ অন্যের কষ্টের কারণ হবে কিনা? যখন এভাবে চলবে তখন ভুল কম হবে। কিছু দিন পর তা নিজের অভ্যাসে গড়ে উঠবে। পরবর্তীতে আর চিন্তা করতে হবে না এবং সেগুলো নিজের স্বভাবে পরিণত হবে।

চিঠি-পত্রের আরো কতিপয় আদব

মানি অর্ডারের রশিদে টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য লিখে দেবে

১. থানভী রহ. বলেন, অনেকে এমন আছে যারা মানি অর্ডারে টাকা পাঠায়, কিন্তু রশিদে কোনো কিছু লিখে না যে, কি উদ্দেশ্যে টাকা পাঠিয়েছে- হাদিয়া হিসেবে, নাকি খানকার জন্য, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। এখন যদি সে টাকা গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটা আমানত হিসেবে রেখে দিয়ে চিঠির অপেক্ষায় থাকতে হয়। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, চিঠিই আসে, তখন অযথা এক ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়। আর বাড়তি এক ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি হয়। এজন্য এ ধরনের মানি অর্ডার আমি ফিরিয়ে দেই।

উত্তরের চিঠি রেজিষ্ট্রি করে পাঠাবে না

২. উত্তরের চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো অভদ্রতার পরিচায়ক। এতে প্রাপককে অসম্মান করা হয়। কারণ তখন ধারণা করা হয় যে, যাতে করে সে চিঠি পাওয়ার বিষয় অস্বীকার করতে না পারে যার কারণে এই চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো হয়েছে।[১৫৯]

১৫৯। হুসনে আজিজ খ. ১ পৃ. ৩৬

কারো অনুমতি ছাড়া তার চিঠি দেখা ও পড়া নিষেধ

অনুমতি ছাড়া অন্যের চিঠি দেখা জায়েয নেই। তবে এই বিধান ওই সময় যখন নাজায়েযের কারণগুলো পাওয়া যাবে। যদি কখনো নাজায়েযের কারণসমূহ পাওয়া না যায়, তখন দেখা জায়েয। অন্যের চিঠি নাজায়েয হওয়ার কারণ হলো, যার চিঠি তার ক্ষতিসাধন হওয়া। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অর্থাৎ: প্রকৃত মুসলমান সেই যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

এই জায়গায় যার চিঠি তার ক্ষতি হলো, সম্ভবত চিঠিতে এমন কোনো বিষয় লেখা আছে, যা অন্যের কাছে প্রকাশিত না হোক। এখন তার চিঠি দেখার কারণে তা প্রকাশ হয়ে গেল এবং সে ক্ষতির সম্মুখীন হলো। যদি তার চিঠি না দেখতো তাহলে সে এই ক্ষতির সম্মুখীন হতো না।

উপরোক্ত যদি কোন ক্ষতি নাও হতো তাহলে তো অনর্থক বেকার একটা কাজ হতো। কারণ চিঠি দেখার মাঝে তো তার কোনো লাভ নেই। আবার না দেখলে কোনো ক্ষতিও নেই। অনর্থক কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

অর্থ: মুমিন তারাই যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে।

যদি কখনো অন্যের চিঠি দেখার দ্বারা এ সমস্যার সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ অন্যের ক্ষতি না হয়, গোপন বিষয় প্রকাশ না পায় এবং অনর্থক কাজ না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নাজায়েযের সেই বিধান আর অবশিষ্ট থাকবে না, বরং সেই অবস্থায় অন্যের চিঠি দেখা মুস্তাহাব।

যেমন মা-বাবার জন্য নিজ সন্তানের চিঠিপত্রের নেগরানি করা। শিক্ষক ও মুরুব্বীদের জন্য নিজ ছাত্রদের চিঠি দেখা। এমনিভাবে সরকারপ্রধানের জন্য নিজ প্রজাদের কথাবার্তা এবং কাজ কর্মের খবর রাখা এগুলো শুধু জায়েযই নয় বরং জরুরি। রাসূল সা. হযরত হাতিব ইবনে আবি বলতা রাযি. এর চিঠি যে নিয়ে যাচ্ছিল, তার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তার মাঝে ঐ তিন ধরনের খারাপি ছিলো না।

যদি চিঠি দেখা সর্বাবস্থায় নিষেধ বলা হয়, তাহলে হাজারো ফিৎনা ফাসাদের দরজা উন্মোচিত হয়ে যাবে। যার সারসংক্ষেপ হলো, স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়া। এজন্য শরীয়ত প্রয়োজনের সময় অন্যের চিঠি দেখা অনুমোদন করেছে, আবার অপ্রয়োজনে বারণ করেছে। যদি মা-বাবা, ছেলে সন্তানের চিঠি

পত্রের খবর নিতে না পারে, উস্তাদ ছাত্রদের কথাবার্তার কিছু বলতে না পারে এবং সরকার প্রজারেদর বিষয়ে খোঁজ রাখতে না পারে, তাহলে দুনিয়ার নেজাম ঠিক থাকবে না।[১৬০]

বিয়ারিং খামে চিঠি পাঠাবে না

৩. হযরতের কাছে কেউ বিয়ারিং খামে চিঠি পাঠিয়ে উত্তর চাইলে তিনি ওই চিঠির উত্তর দিতেন না। জনৈক ব্যক্তি হযরতকে জিজ্ঞাসা করল, রেয়ারিং খামে প্রেরিত চিঠির উত্তর আপনি দেন না কেন? অথচ প্রেরক আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। আপনি খামে উত্তর পাঠিয়ে দিলেই তো পারেন। হযরত উত্তরে বললেন, আমি আগে এরূপই করতাম, তবে অনেকে এমন আছে যারা বিয়ারিং খাম পাওয়ার কারণে চিঠি ফিরিয়ে দেয়, যার খরচ পরবর্তীতে আমাকেই বহন করতে হয়। যার কারণে বিয়ারিং খামে উত্তর পাঠানো আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমি কেন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাব? লোকটি বলল, হযরত তাহলে আপনি আপনার ঠিকানা না লিখলেই তো এই ঝামেলায় পড়তে হয় না। উত্তরে হযরত বললেন দেখ, যদি ঐ লোকটি আবার ফিরিয়ে দেয় তাহলে আমার ঠিকানা না থাকার কারণে পিয়ন আমাকে পেল না, আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম না। কিন্তু সরকার তো ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সরকারের ক্ষতি করা কতটুকু আমার জন্য বৈধ।[১৬১]

চিঠির ভাষা পরিস্কার এবং লেখাগুলো সুন্দর হস্তাক্ষরের হওয়া চাই

৪. জনৈক ব্যক্তি হযরতের কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। সে চিঠির লেখাগুলো ছিলো অনেক হালকা কালিতে, যা সীমাহীন কষ্ট করে পড়তে হয়। চিঠির উপরের ঠিকানাও এরূপভাবে হালকা কালিতে লেখা, হযরত চিঠিটা ফিরিয়ে দিলেন, কারণ তা পড়াই যাচ্ছিল না। ঠিকানার অংশ কেটে নিয়ে চিঠির খামের উপর আটা দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। যদি খুব কষ্ট করা হতো, তাহলে সেটা পড়া যেত। কিন্তু হযরত সেই চিঠি পড়লেন না। বললেন, লোকজন যে কেন এরকম হয়ে গেছে, তারা সর্বদা অন্যকে কষ্ট দিতে ভালোবাসে। যদি অন্যকে আমার প্রয়োজনে কাজ করানোর দরকার হয়, তাহলে সে কাজ যথাসম্ভব সহজভাবে যেন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।[১৬২]

---

[১৬০] । মাজালিসুল হিকমাত পৃ. ১৮৩-১৮৫
[১৬১] । কামালাতে আশরাফিয়া খ. ৪ পৃ. ৮৭
[১৬২] । কামালাতে আশরাফিয়া আংশ ১, পৃ. ১৫৮

মাদরাসার দোয়াত এবং কলম নিজের কাজে ব্যবহার না করা

৫. একজন মুহতামিম হযরতের কাছে বিধান জানতে চেয়ে লিখলেন, আমি মাদরাসার দোয়াত এবং কলম নিজের চিঠি লেখার কাজেও ব্যবহার করি না। হযরত বললেন, যথাসম্ভব মাদরাসার জিনিসপত্র নিজের কাজে ব্যবহার করা হতে বেঁচে থাকার মাঝেই সতর্কতা।[১৬৩]

সংক্ষেপে উত্তর দেয়া কঠিন কাজ

৬. হযরত বলেন, সংক্ষিপ্ত আকারে চিঠির উত্তর লেখা অনেক কঠিন কাজ, কারণ উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি এদিকেও খেয়াল রাখতে হয় যাতে কোনো অংশের উত্তর বাদ পড়ে না যায়।[১৬৪]

প্রাপককে সকল প্রকার ঝামেলামুক্ত রাখা আবশ্যক

৭. থানভী রহ. বলেন কারো একটি চিঠি আমার নিকট আসলো। তিনি উত্তরের জন্য ফিরতি খাম না পাঠিয়ে পাঁচ পয়সার একটি টিকেট পাঠিয়ে দিলেন। আমি অধিকাংশ সময় এরকম করতে সকলকে বারণ করে থাকি এবং বলি, ফিরতি জবাবের জন্য টিকেট না পাঠিয়ে খাম পাঠিয়ে দিতে। এতে উত্তরদাতাকে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় না। কারণ টিকেট ছোট হওয়ার কারণে অনেক সময় সেটা হারিয়ে যায়। আর সেটা খোঁজাখুজি করতো গিয়ে অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হয়। আর খাম বড় হওয়ার কারণে সাধারণত সেটা হারিয়ে যায় না।

লোকটি পরবর্তী কোনো সময় এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলল, খাম পাঠালে চিঠির ওজন বেড়ে যায় এবং ডাক খরচ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে টিকেট পাঠানোর দ্বারা ওজন বৃদ্ধি পায় না এবং খরচ কম লাগে। আমি তাকে বললাম এটা কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নয়। তুমি এটা কিভাবে ভাবলে যে, তোমার একটু খরচ বাঁচাতে গিয়ে তুমি অন্যকে অস্থির করে তুলবে, অপরের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে? শরীয়তের দৃষ্টিতে এরকম কাজের কতটুক বৈধতা আছে?[১৬৫]

কাগজ অপচয় না করা

৯. হযরত এক চিঠির অর্ধেকের মাঝে উত্তর লিখলেন বাকি অর্ধেক ছিড়ে নিজের কাছে রেখে দিয়ে বললেন, এই অর্ধেক কাগজ তাবীজ লেখার কাজে ব্যবহৃত

---

[১৬৩] । আল কালামুল হাসান পৃ. ২৩

[১৬৪] । আল কালামুল হাসান পৃ. ১৪৮

[১৬৫] । আল ইফাযাত খ. ৮ পৃ. ২৪৩

হবে। অন্যথায় এই অর্ধেক অপচয় হবে। তবে তিনি এমন ব্যক্তির চিঠি থেকে কেটে রাখতেন, যার এ কথা জানা রয়েছে যে, কাগজের বাকি অংশ হযরত কেটে রেখে দিবেন, যারা নতুন আসতেন অথবা যাদের হযরতের ব্যাপারে এরকম ধারণা নেই, তাদের চিঠির পুরো কাগজই তিনি ফিরিয়ে দিতেন।[১৬৬]

ফায়েদা: এরূপ চিঠির উত্তর দেয়ার পর বাকি অংশকে কেটে নিজের কাছে রেখে দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অপচয় থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়া।

নিজের প্রয়োজনে ফিরতি খাম পাঠিয়ে দেবে

১০. আমি যদি নিজের প্রয়োজনে আমার ছাত্রের কাছেও চিঠি লিখি, তাহলে তার কাছেও ফিরতি খাম পাঠিয়ে দেই। কারণ আমি সর্বদা এটা মনে করি, সে যে আমার কাজ সম্পাদন করে উত্তর লিখবে এটাই তো অনেক বেশি। আবার টিকেট বা খামের বোঝাও তার উপর চাপিয়ে দেয়া কিভাবে জায়েয হবে? নিজের কাজের জন্য ফিরতি খাম বা টিকেটের বোঝা প্রাপকের উপর চাপিয়ে দেয়া অযৌক্তিক। আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আমাকে বার বার বলে থাকে, আমাদের কাছে ফিরতি খাম পাঠানোর প্রয়োজন কি? আমি তাদেরকে বলি, দেখ নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে আমাকে থাকতে দাও।[১৬৭]

উপাধি লেখার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা চাই

১১. প্রতিটি কাজেই বাড়াবাড়ির পরিণাম অশুভ। জনৈক ব্যক্তি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি এর উপাধি লিখতে গিয়ে লিখেছে- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ যখন এই সংবাদ সাহেবের কানে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, এটা কেমন মূর্খতা যে, ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতাও তার নেই।[১৬৮]

সাধারণ শিক্ষিতরা আলেমদের সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা উত্তম

১২. হযরত বলেন, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারা উলামায়ে কিরামদের সাথে চিঠির মাধ্যমে ইসলাহী সম্পর্ক রাখবে, এতে করে দিন দিন নিজের অন্তরের পরিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ দ্বীনের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর দীনের উপর চলা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।[১৬৯]

---

[১৬৬]। হুসনুল আজিজ পৃ. ২৪৮
[১৬৭]। কামালাতে আশরাফিয়া অংশ ১ পৃ. ১৬৬
[১৬৮]। হুসনুল আজিজ খ. ৪ পৃ. ২১০
[১৬৯]। হুসনুল আজিজ খ. ৪ পৃ. ২১০

চিঠি অতি সংক্ষেপ না করা

১৩. চিঠি লেখার ক্ষেত্রে এরকম সংক্ষিপ্তভাবে লিখবে না, যাতে বুঝাই কঠিন হয়ে যায়। যে তোমার থেকে বড় তাকে সম্বোধন করে লেখার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে।[১৭০]

এক চিঠিতে একাধিক বিষয় না লেখা

১৪. জনৈক ব্যক্তি একই চিঠিতে কয়েকটি বিষয়ে জানতে চেয়ে হযরতের কাছে প্রশ্ন করলেন, হযরত চিঠির উত্তরে লিখলেন। এক চিঠিতে একাধিক বিষয়ে লেখা আদৌ উচিত নয়।[১৭১]

একটি ভ্রান্ত আকীদার সংশোধন

১৫. হযরত বলেন, এক ব্যক্তির চিঠি আমার কাছে আসলো, চিঠির ঠিকানার উপর দিয়ে লেখা আছে তর এই আকীদা ছিলো, যেই জিনিসের উপর এটা লেখা থাকবে, সেটা সংরক্ষিত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, উক্ত বাক্যটি চিঠির উপর লেখা থাকার কারণে সেটা আর হারানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরকম বিশ্বাস রাখা শিরক। মূর্খ ব্যক্তি বড়দের ব্যাপারে এরকম নানা ঘটনা তৈরি করে রেখেছে। একটা ঘটনা রয়েছে এক ব্যক্তির দেয়ালে এক সময় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে। সে উক্ত দেয়ালে এই কবিতাটি লিখে দিলো-[১৭২]

بحق حضرت معروف کرخی * بماندسالھادیوار ترقی

প্রাপকের ভাষায় চিঠি লেখা জরুরি

১৬. হযরত কথা-বার্তার একপর্যায়ে বলেন, বর্তমান সমাজের অবস্থা অত্যন্ত দুরূহ। জনসাধারণ উলামায়ে কিরামদের খুব ছোট নজরে দেখে। এক ব্যক্তির একটি চিঠি আমার কাছে আসলো। সে জানে আমি ইংরেজি জানি না। এরপরেও লোকটি আমার কাছে ইংরেজি ভাষায় চিঠি লিখেছে। তার উদ্দেশ্য হেয়প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তার উত্তর লিখলাম আরবি ভাষায়। সেও যেন বুঝে নেয় যে, উত্তর প্রদানকারীও আমার প্রতি খেয়াল করেনি, যেমনিভাবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমিও প্রশ্নকারীর খেয়াল করিনি।

---

[১৭০] । আল ইফযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৭ পৃ. ৪৫৯

[১৭১] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা ৭/৪৫৯

[১৭২] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৬ পৃ. ২৬

কিছুদিন পর লোকটি আবারো একটি চিঠি আমার কাছে আসলো। এবার সে চিঠিতে লিখেছে হযরত আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি ভুলক্রমে ইংরেজিতেই চিঠি পাঠিয়েছি। এখন তার বাস্তবতা বুঝে এসেছে। এই সমস্ত লোকেরা হুজুরদের বোকা, নির্বোধ, ছোট এবং সমাজের বোঝা মনে করে। কিন্তু যখন হুজুরের আসল অবস্থা দেখে তখন বুঝে আসে যে, এরা নিবোর্ধ বা বোকা নয়, প্রকৃত চালাক এরাই।

এরকম মুক্ত চিন্তার অধিকারী সুশিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমার মন চায় যে, তাদের মস্তিস্ক ধোলাই করি। যাতে করে বুঝে আসে যে, মোল্লা মৌলভীদের মস্তিস্কের প্রখরতা আছে। এ রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু স্বশিক্ষিত আর মুক্ত চিন্তার অধিকারী লোকদেরই এই ধারণা নয়, বরং সমাজের সাধারণ জনগণ পর্যন্ত হুজুরদের ব্যাপারে এরকম ধারণা পোষণ করে।

উলামায়ে কেরামদের কাছে তারা এসে চাকর বাকরদের মতো আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা হুজুরদের কাছে এসে বলে, মৌলভী সাহেব একটি তাবিজ দিন। কি প্রয়োজনে তাবীজ নিবে তা কিন্তু বলে না। কারণ তাদের জানা আছে কি প্রয়োজনে তাবীজ নিব, এটা তারাই আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিবে। এরপর মৌলভী সাহেব নরম ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করে। এরকমভাবে জনসাধারণ হুজুরদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু আমি এধরনের লোকদের বলি, তুমি কি বাজারে গিয়ে দোকনির কাছে বলে, কোনো জিনিসের নাম না নিয়েই আমাকে একটি জিনিস দিন। যখন দোকানির কাছে তোমার বলা সম্ভব হয় না, তখন আমার কাছ এসে শুধু তাবীজ চাও কিভাবে? কি প্রয়োজনে তোমার তাবীজ লাগবে, তা বলতে কি কষ্ট লাগে? যখন এভাবে আমি বলি তখন হুশ ফিরে পায়, শুভবুদ্ধির উদয় হয়।[১৭৩]

একাধিক বিষয়ে লিখতে হলে পৃথক পৃথক চিঠি লিখা

১৭. জনৈক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি চিঠি আমার কাছে পৌছলো। যা এমন দুটি পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর উপর লেখা ছিলো, যার দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে মাঝখানে এমন কোনো চিহ্নও নেই যার দ্বারা উভয়টির মাঝে পার্থক্য করা যায় যে, চিঠি দুটি দুই বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়েছে। তাই হযরত বললেন বর্তমান মানুষের অবস্থা এতই বেশি খারাপ হয়ে গেছে যে, তারা চিঠিপত্রের দুটি বিষয়বস্তুর মাঝেও পার্থক্য করে না। যার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়

---

[১৭৩]। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাঅ খ. ৫ পৃ. ৪৪

যে, এখানে প্রথম বিষয়বস্তুর শেষ হয়ে গেছে। এরপর থেকে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শুরু হয়েছে, এটা খুবই খারাপ অভ্যাস।[১৭৪]

প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ হওয়া চাই

১৮. প্রশ্ন এমনভাবে করবে, যেটা সংক্ষিপ্ত হবে এবং অর্থবহও হবে। অনেক লোক এমন আছে, যারা কোনো বিষয়ে জানতে চেয়ে এমন সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন লিখে যে, ওই সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ধারণা না থাকলে শুধু প্রশ্ন দেখে উদ্দেশ্য বুঝে উঠা কখনো সম্ভব নয়। যার পরিণাম হয়, প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বুঝার জন্য বার বার পড়তে হয়। এজন্য আমি সব সময় বলে থাকি, কোনো বিষয়ে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলে প্রশ্ন সংক্ষিপ্তভাবে লিখবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে তা থেকে উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝে আসে।[১৭৫]

জরুরী কোনো বিষয়ে জানতে হলে ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে দেবে

১৯. অনেকের অভ্যাস আছে, যদি জরুরি কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন পড়ে তাহলেও সে ডাকযোগে চিঠি পাঠায় না, বরং যাতায়াত করে কোনো লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে হযরত বলেন, যে চিঠি আমার কাছে কারো হাতে পৌঁছে, সে চিঠির জবাব আমি অতি তাড়াতাড়ি দেই না। কারণ এরকম চিঠির ব্যাপারে আমার ধারণা হলো জবাব আস্তে ধীরে পাঠালেও সমস্যা হবে না। যদি অতি প্রয়োজনীয় হতো তাহলে টাকা খরচ করে ডাক যোগে পাঠাতো।[১৭৬]

লেখার আদবসমূহ

২০. অধিকাংশ লেখক এবং বক্তাগণ এমন হন যে, যা কলমে আসে তাই লিখে দেয়, যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। এটুকুও ভ্রুক্ষেপ করে না যে, আমার লেখা বা কথার দ্বারা অন্য মানুষ ব্যথিত হয় কি-না। এরকম করা কখনো কোনো আদর্শবান মানুষের কাজ হতে পারে না।[১৭৭]

যদি কেউ এমন হয় যে, কলমে যা আসে তাই লিখে ফেলে। তার লেখা দ্বারা অন্যের কষ্ট হলো কি-না সেদিকে লক্ষ্য করে না। এরূপ মানুষদের জন্য আল্লাহর

---

[১৭৪] । আল ইফাযাত খ. ৬ পৃ. ৩৮৯
[১৭৫] । মাকালাতে হিকমত পৃ. ৪২১
[১৭৬] । মাকালাতে হিকমত পৃ. ২৬৫
[১৭৭] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৬ পৃ. ৪৯

শাস্তি অবধারিত। কারণ তার লেখার অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্যকে কষ্ট দেয়ার অধিকার নেই।[১৭৮]

যেহেতু খারাপ অভ্যাস এবং কুআচরণের কারণে অন্যের কষ্ট হয়, তাই সেগুলো পরিত্যাগ করবে। লেখালেখির ক্ষেত্রেও খুব খেয়াল রাখতে হবে, অন্যের অবাস্তব কোনো দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে আল্লাহর শাস্তি নিজের উপর নিয়ে আসবে না।[১৭৯]

খামের ভেতর কাগজ রাখার আদব

২১. আমি তো এটুকুর প্রতিও খেয়াল রাখি যে, খামের ভেতর চিঠি (অর্থাৎ লিখিত কাগজটি) কীভাবে রাখবো, যাতে করে কাগজটি এলোমেলো হয়ে না যায়। কেননা এলোমেলোভাবে রাখলে কাগজে ভাজ পড়ে যাবে। এজন্য সুন্দর করে ভাজ করে তারপর চিঠি খামের ভিতর রাখি। কেননা কারো যেন সামান্যতম অস্থিরতার সৃষ্টি না হয়।[১৮০]

বর্ণনার ক্ষেত্রে খুব সর্তকতা অবলম্বন করা চাই

২২. সতর্কতা এটাই যে, কোনো কথার বর্ণনা নিজের সাথে সম্পৃক্ত করবে না; বরং বর্ণনার ভঙ্গিতেই লিখে দেবে। উদাহরণস্বরূপ, এভাবে লিখবে যে, এ কথা অমুক ব্যক্তি বলেছেন, অথবা আমি অমুক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি।[১৮১]

বিষয়বস্তুর পরিমাণ

২৩. যারা চিঠিতে লম্বা প্রশ্ন লিখে তাদের উত্তর পাঠাতে বিলম্ব হয়। কারণ এরকম লম্বা প্রশ্নের উত্তর লিখতে প্রচুর সময় ব্যয় হয় এবং প্রচুর কষ্টও হয়। ছোট ছোট অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর লেখা যে পরিমাণ কষ্টের কাজ নয়, লম্বা ও বড় একটি প্রশ্নের উত্তর লেখা তার চেয়ে অনেকগুণ কঠিন। দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বড় বড় প্রশ্ন আর চিঠি লেখার চেয়ে দ্রুত ছোট ছোট প্রশ্ন এবং চিঠি লেখাই উত্তম।[১৮২]

চিঠি একেবারে সংক্ষেপে লিখবে না

২৫. লেখালেখির ক্ষেত্রে যেমন সংক্ষিপ্ততা পরিত্যাগ করা চাই, ঠিক তেমনি বিশদ বিবরণও পরিত্যাগ করা চাই। যেখানে যে পরিমাণ লিখলে পাঠক

১৭৮। জাদিদ মালফুজাত পৃ. ২২৪
১৭৯। আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ. ১৬
১৮০। আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৪ পৃ. ৫৭২
১৮১। হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ৫৫৭
১৮২। হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ৫৬০

ভালোভাবে বুঝতে পারবে, সেখানে সে পরিমাণই লিখবে। কমও নয় আবার বেশিও নয়।[১৮৩]

চিঠির উপর ভরসা না করে মানি অর্ডারের রশিদে বিস্তারিত লিখবে

২৬. শুধু চিঠির উপর ভরসা করে মানি অর্ডারের রশিদে টাকার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে কিছু না লেখা আমার কাছে অপছন্দনীয়। যদিও চিঠিতে টাকার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে লেখা আছে। কারণ অনেক সময় চিঠি পৌঁছে না, আবার পৌঁছলেও অনেক দেরিতে পৌঁছে। ওই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টাকা আর রশিদ পৃথকভাবে রেখে চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যা অত্যান্ত কষ্টকর। অথচ তার চেয়ে ভালো হলো, মানি অর্ডারের রশিদে টাকার বিস্তারিত বিবরণ লিখে দেবে। অন্যের কষ্ট হয়, এমন কাজ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।[১৮৪]

নারীরা মাহরাম পুরুষের অনুমতি ছাড়া চিঠি লিখবে না

২৭. আমি এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করি যে, নারীরা মাহরাম পুরুষের অনুমতি ছাড়া কোনো চিঠি আমার কাছে পাঠাবে না। যদি মাহরাম পুরুষের অনুমতি ও স্বাক্ষর ছাড়া কোনো চিঠি পাঠিয়ে দেয়, আমি সে চিঠির উত্তর দেই না। উত্তর ছাড়াই ফিরিয়ে দেই, আমি চাই কোনো নারীই যেন মাহরাম পুরুষের অনুমতি ছাড়া চিঠি লেখার সাহস না পায়। কারণ এরূপ কঠোরতার কারণে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।[১৮৫]

ফাতাওয়া চাওয়ার আদবসমূহ

১. যখন আমল করার জন্য কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন দেখা দিবে, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়, তখন সেই মাসআলাটি এমন এক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করবে এবং জানবে যার উপর তোমর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা আছে এবং তুমি মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করো যে, তার কাছে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

২. শুধু মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে, মাসআলার দলিল জিজ্ঞাসা করবে না।

৩. তার কাছে তুমি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তার কাছে জানার পর অপ্রয়োজনে অন্য আরেকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করবে না।

৪. এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার পরেও যদি জবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ থেকে যায়, অথবা তার জবাবের উপর যদি তোমার পূর্ণ আস্থা না আসে,

---

[১৮৩] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা খ. ৭ পৃ. ৪১৩

[১৮৪] । হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ২০৪

[১৮৫] । কামালাত অংশ-১

তাহলে সেক্ষেত্রে এরূপ গুণের অধিকারী অন্য আরেকজন আলেমের কাছে জেনে নিবে। যদি দ্বিতীয়জন প্রথমজনের অনুরূপ জবাব দেয়, তাহলে এখন তাতে সন্দেহ না করে আমল করবে। আর যদি দ্বিতীয়জন প্রথমজনের বিপরীত জবাব দেয়, তাহলে প্রথমজনের জবাবটি দ্বিতীয়জনকে অবহিত করবে। তবে খুব লক্ষ্য রাখবে দ্বিতীয়জনের জবাব প্রথমজনকে অবহিত করাবে না। এরপর তুমি নিজে মনস্থির করে চিন্তা করবে। এখন যে জবাবের দিকে তোমার মন ধাবিত হবে, সেই জবাবের উপর আমল করবে। তবে স্বরণ রাখতে হবে, এ কাজ ওই সময় করবে, যখন জিজ্ঞাসা করার জন্য আর কোনো আলেম থাকবে না এবং তুমি নিজের উপর আস্থাবান যে, দুই জওয়াবকে বিশ্লেষণপূর্বক সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। এ আদবগুলো লিখিতভাবে ফতাওয়া চাওয়া, অথবা মৌখিকভাবে ফাতাওয়া চাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। লিখিতভাবে ফতোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে আরো কিছু আদবের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। নিম্নে আরো কিছু আদব লেখা হলো যেগুলোর প্রতি লিখিত আকারে ফাতাওয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

৫. প্রশ্নের লেখাগুলো সুন্দর হস্তাক্ষরে ও স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

৬. প্রশ্নপত্রে নাম ঠিকানা পরিস্কার করে লিখবে। যদি কয়েকবার একই জায়গায় ফতোয়া চাওয়া প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে প্রত্যেকবারই প্রশ্নপত্রে প্রশ্নকারী নাম ঠিকানা লিখবে।

৭. যতদূর সম্ভব অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা প্রশ্নে লেখা হতে বিরত থাকবে।

৮. ফিরতি উত্তরের খাম অবশ্যই টিকেট রেখে দিবে, তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। পরবর্তীতে ধীরে সুস্থে উত্তর প্রদান করে তোমার ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিবে। আর যদি তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করে, তাহলে তো তুমি টিকেট ফেরতই পেলে।

৯. প্রশ্ন যদি একাধিক হয় তাহলে নম্বর দিয়ে প্রশ্ন লিখবে। প্রশ্নের একটি অনুলিপি নিজের কাছে রেখে দিবে এবং প্রাপককে জানিয়ে দিবে যে, প্রশ্নের অনুলিপি আমার কাছে আছে, শুধু নম্বর দিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখলেই হবে। অযথা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।[১৮৬]

ব্যাপক প্রচলিত কিছু ভুল

১. অনেকে এমন আছে, যারা একটা মাসআলা কয়েক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে, অনেক সময় উত্তর ভিন্ন ভিন্ন আসার কারণে কোনটি গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণ

১৮৬। ইসলাহে ইনক্বিলাব খ. ১

করতে গিয়ে প্রশ্নকারীকে পেরেশানির সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর তার চাহিদা মতো যেটা হয় সেটার উপর আমল করে। অনেকের এ কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা মতো উত্তর না আসে, প্রশ্নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। যখন তার অনুরূপ উত্তর পেয়ে যায়, তখন সে আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে না। এরকম যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাদের শেষ পরিণাম হয় মারাত্মক ভয়াভহ। দ্বীনদারী তাদের মাঝে বাকি থাকে না, দ্বীনকে মনের অনুগামী করে নেয় এবং হাসি ও খেলার বস্তুতে পরিণত করে।

২. সমাজের কিছু লোকজন এমন আছে, যারা এক আলেম যে উত্তর দিয়েছে সে উত্তরটি অন্য আরেকজন আলেমের কাছে গিয়ে বলে। মানুষ হিসেবে যেহেতু স্বভাব সবসময় একই মতো থাকে না, তাই যখন তার ব্যাপারে কোনো কিছু বলে ফেলে, তখন সে তার কথাটি আবার প্রথমজনের কাছে গিয়ে বলে। তার কথা শুনে হয়তোবা সেও তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলে ফেলেছে, অথবা সে নিজে থেকেই কোনো কিছু বানিয়ে বলেছে। এরকমভাবে এক পর্যায়ে বড় ধরনের এক ফিতনা সৃষ্টি হয়, যা কখনোই উচিত নয়। এরকম বদ অভ্যাস যাদের আছে তাদের জন্য উচিত হলো, আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং যার সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

৩. আরেকটি বড় ধরনের ভুল হলো, লোকজন অপ্রয়োজনীয় মাসআলা জিজ্ঞাসা করে থাকে। আবার অনেক লোক তো এমন আছে, যারা আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এরকম আজে বাজে প্রশ্নও করে।

৪. বড় ধরনের একটি ভুল হলো, অনেক পার্থিব শিক্ষিত লোকজন মাসআলা জানার পাশাপাশি, তার দলিল কি তাও জানার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। অথচ বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় যে, দলিল জানার জন্য দীনি মাদরাসায় নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া করা জরুরি, অন্যথায় সাধারণ শিক্ষিত লোকদের জন্য দলিল বুঝা আদৌ সম্ভব নয়। যদি উত্তর প্রদানকারী বুঝবে না মনে করে দলিল না দেয়, তাহলে উত্তরদাতার সাথে খারাপ আচরণ করে, অথবা তাকে দলিল বলতে বাধ্য করে।

৫. অনেক লোকজন মাসআলা নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দেয়। নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ফাতাওয়া নেয়া শুরু করে এবং ফাতাওয়া অন্যের মতের বিপরীত দেখিয়ে দলিল পেশ করে। অপরজনও নিজের মতের স্বপক্ষে দলিল দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করতে থাকে। এভাবে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দেয়।[১৮৭]

---

[১৮৭] । ইসলাহে ইনকিলাব

অধ্যায়-১৪

মসজিদের আদবসমূহ

আদবঃ অনেক লোক এমন আছে, যারা মসজিদের এমন জায়াগায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে অন্যের বের হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। উদারহণস্বরূপ, দরজার সামনে অথবা পূর্বদিকের দেয়ালের সাথে ঘেঁষে। যার ফলে পেছনের দিক দিয়ে যেতে পারে না, জায়গা না থাকার কারণে। আর সামনের দিক দিয়ে যেতে পারে না গুনাহের ভয়ে। এরূপ কখনো করবে না, বরং পশ্চিম দিকের দেয়ালের সাথে কোনো এক কোণায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে।

আদবঃ অনেকে এমন আছে, যারা অপ্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির পিঠের পেছনে গিয়ে বসে, অথবা অন্যজনের পিঠের পেছনে নামাযের নিয়ত করে। যদি সামনের নামাযরত ব্যক্তি নামায থেকে ফারিগ হয়ে উঠতে চায়, তখন পেছনে নামাযরত ব্যক্তি থাকায় উঠতে পারে না, যার কারণে নিরুপায় হয়ে চুপচাপ তাকে বসে থাকতে হয়। এতে সে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে। তাই কখনোই এরূপ কাজ করবে না।

আদবঃ মসজিদে এসে অন্যের জুতা সরিয়ে নিজের জুতা রাখবে না। কারণ প্রথমে যে যেখানে জুতা রেখেছে, পরবর্তীতে এসে ওই স্থানে জুতা না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়বে। অপ্রয়োজনে কাউকে অস্থির করে তোলা বা কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

মসজিদের আরো কতিপয় আদব

১. অনেক লোক এমন আছে, যারা মসজিদে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকের পেছনে এসে নিয়ত করবে। দ্বিতীয়ত, এমন করার দ্বারা তার সামনের লোকটি আটকে পড়ে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাম না ফিরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সামনের লোকটি উঠতে পারে না। এটা বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।[১৮৮]

২. অনেকে সর্তকতা অবলম্বন না করেই মসজিদে বসে অযু করে নেয়। অথচ অযুর পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে যে সমস্ত পানি পড়ে সেগুলোকে উলামায়ে কিরাম

---

[১৮৮]। হুকুকে মুআশারাত পৃ. ৬৮

নাপাক বলেছেন। আর যদি পবিত্রও ধরে নেয়া হয়; তাহলেও অযুর পানি মসজিদে ফেলা, মসজিদের আদব পরিপন্থী। যার কারণে শরীয়তের বিধান হলো, কাপড় ধোয়ার পর, কাপড়ের নিংড়ানো পানি যেন মসজিদে না পড়ে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। রাসূল সা. এর অযুর ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়ার পরেও তিনি কখনো মসজিদে বসে অযু করেননি। তাহলে আমাদের জন্য কিভাবে জায়েয হতে পারে?[১৮৯]

৩. মু'তাকিফ অর্থাৎ যিনি ইতিকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান করছেন, তার জন্য মসজিদে বসে বায়ু নির্গত করা জায়েয নেই। এজন্য প্রস্রাব-পায়খানার মতো মসজিদের বাইরে চলে যাবে। অতঃপর নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে মসজিদে আসবে।[১৯০]

৪. শুধু যাতায়াতের জন্য মসজিদ ব্যবহার করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামগণ বলেন যে, এটা মাকরূহ। যদি হঠাৎ কখনো এরূপ হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তা অভ্যাসে পরিণত করবে না। মসজিদের সর্বোচ্চ সম্মান করা চাই। আজকাল মানুষদের মাঝে মোটেও অনুভূতি নেই। এ বিষয়গুলোর প্রতি তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না।[১৯১]

৫. নামাযে ব্যবহারের জন্য চাটাই যথেষ্ট, কার্পেট বা উন্নত মানের মুসাল্লা ব্যবহারের বিশেষ কোনো উপকার নেই। আমি এগুলোকে অপচয় মনে করে থাকি। এগুলো ধনী লোকদের কাজ। এগুলোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট লৌকিকতা রয়েছে। এগুলোতে কোনো সওয়াব হবে কি না তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।[১৯২]

৬. যে সমস্ত কাজ দুনিয়ার জন্য করা হয়ে থাকে। সেগুলোর বিশেষ কোনো সওয়াব নেই। এমন কাজ করে সওয়াবের আশা করা বিদ'আত। এরূপ কাজ মসজিদে বসে করা অনুচিত।[১৯৩]

৭. যে সমস্ত তাবীজ লিখে টাকা নেয়া হয়, সে সমস্ত তাবীজ মসজিদে লেখা অনুচিত। কারণ এটা ব্যবসার মতো হয়ে যায়। আর যদি টাকা নাও নেয়া হয়, তারপরেও তা মসজিদে বসে না লেখাই ভালো। এজন্য যে, এটা তো দুনিয়াবী কাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।[১৯৪]

---

[১৮৯] । দাওয়াতে আবদিয়ত খ. ২, ২৫৬
[১৯০] । কালিমাতুল হক পৃ. ৭৬
[১৯১] । আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ. ২৯৯
[১৯২] । হুসনুল আজিজ পৃ. ১৬৬
[১৯৩] । তা'মীমুত তা'লীম পৃ. ৩১
[১৯৪] । তালীমুত তালীম পৃ. ৩১

৮. যে সমস্ত শিক্ষক অথবা মৌলভী সাহেব বেতনের বিনিময়ে বাচ্চাদের পড়ান, তাদের জন্যও উচিত হলো মসজিদে না পড়ানো। এমনিভাবে যারা টাকার বিনিময়ে লেখালেখি করেন, অথবা যেই দর্জি টাকার বিনিময়ে সেলাই করেন, তাদের জন্য উচিত হলো, এ সমস্ত কাজ মসজিদে করবে না।[১৯৫]

৯. ইতিকাফকারী ব্যতীত অন্য কেউ মসজিদে বসে ক্রয় বিক্রয় করবে না, চাই তা যত ছোটই হোক না কেন।

১০. প্রয়োজন ছাড়া অযথা মসজিদের উপরে উঠা বে-আদবী। ফুকাহায়ে কিরামগণ খুব কঠোরভাবে তা থেকে নিষেধ করেছেন।[১৯৬]

১১. মসজিদের নির্ধারিত ইমাম সাহেব আজানের পর অন্য মসজিদে যাবে না, যদি জামাআতের জন্য লোক না হয়, তাহলে তিনি একাকী নামায আদায় করে নিবে। কারণ কোনো মসজিদ সমৃদ্ধ করা জামাআতের সাথে আদায় করার চেয়ে শ্রেয়।[১৯৭]

১২. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করলে পঁচিশগুণ সওয়াব। আর জামে মসজিদে নামায আদায় করলে পাঁচশতগুণ সওয়াব পাওয়া যাবে। এই ফযিলতের আশায় মহল্লাবাসীদের জন্য জায়েয নেই যে, তারা মহল্লার মসজিদে নামায আদায় না করে জামে মসজিদে চলে যাবে। যদি এরূপ করে তাহলে তারা গুণাহগার হবে।

কারণ এক্ষেত্রে পরিমাণের দিক বিবেচনায় যদিও মহল্লাওয়ালদের সওয়াব কম, তবুও মহল্লাবাসীর উপর ওয়াজিব আপন মহল্লার মসজিদ আবাদ করা। এখন তারা মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করার দ্বারা দুই ধরনের সওয়াব অর্জন করছে। এক. মসজিদে নামায আদায়ের সওয়াব। দুই. মসজিদ আবাদ করার সওয়াব।

আর যদি মহল্লার লোকেরা জামে মসজিদে চলে যায়, তাহলে এক ধরনের সওয়াব অর্জন করছে, আর তা হলে মসজিদের নামায আদায় করার সওয়াব। আর মসজিদ আবাদ করবে ঐ এলাকার লোকজন। সেই দিক বিবেচনায় মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করার সওয়াবও কম নয়।[১৯৮]

---

[১৯৫] । তালীমুত তালীম পৃ. ৩১
[১৯৬] । হুসনুল আজিজ পৃ. ১৩০
[১৯৭] । হুসনুল আজিজ পৃ. ১৯.১১
[১৯৮] । আনফাসে ঈসা. পৃ. ৩৭৮

১৩. মসজিদের আদবসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব হলো মসজিদ নির্মাণে কখনই হারাম মাল লাগাবে না। চাই তা হারাম পন্থায় উপার্যিত টাকা পয়সা হোক, অথবা জিনিসপত্র হোক, অথবা জমিন হোক।[১৯৯]

১৪. মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, অথবা গল্পগুজব করাও বে-আদবী।[২০০]

১৫. দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস যেমন বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, তামাক ইত্যাদি পান করে মসজিদে প্রবেশ করবে না। এগুলো পান করা থেকে বিরত থাকবে। যদি কেউ পান করেই ফেলে, তাহলে ভালো করে মুখ পরিস্কার করে অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহারের পর মসজিদে আসবে।[২০১]

১৬. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জুমআর দিনে মসজিদে সুগন্ধির ধোয়া দেয়া মুস্তাহাব।

ফায়েদাঃ হাদীস শরীফে জুমআর দিনের কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশ শুধু জুমআর দিনের জন্যই নয়, বরং যে কোনো দিন হতে পারে। তবে হাদীসের মাঝে জুমআর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, ঐ দিন নামাযি বেশি হয় এবং বিভিন্ন স্তরের লোকজন আগমন করে। এজন্য জুমআর দিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সেটা যে কোনো দিন হতে পারে এবং যে কোনো সুগন্ধি যেমন আতর, আগরবাতি বা অন্যান্য কোনো সুগন্ধি হতে পারে।

১৭. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তুমি কাউক দেখ যে, সে মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করছে, তাহলে তাকে বলে দাও আল্লাহ তাআলা তোমাকে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করুন। আর যদি কাউকে দেখ যে, সে বাইরে কোনো জিনিস হারিয়ে এসে তালাশের উদ্দেশ্যে মসজিদে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করছে, তাহলে তুমি তাকে বলো যে, আল্লাহ তাআলা তোমার হারানো জিনিস আর ফিরিয়ে না দিন।[২০২]

ফায়েদাঃ মসজিদে ঘোষণা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেহেতু মসজিদ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে, তাই সেখানে ঘোষণা করলে কেউ না কেউ তার সন্ধান দিতে সক্ষম হবে। আর বদ দোয়া দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকে সতর্ক করা এবং এ কথা বুঝানো যে, মসজিদ আল্লাহর ঘর আর তা নির্মাণ করা হয়েছে একমাত্র ইবাদতের জন্য, বাইরের হারানো জিনিসের ঘোষণা দেয়ার জন্য

---

[১৯৯] । হায়াতুল মুসলিমীন
[২০০] । হায়াতুল মুসলিমীন
[২০১] । হায়াতুল মুসলিমীন
[২০২] । আবু দাউদ

নয়। তবে যদি এমন কথা বলার দ্বারা ফিৎনা, ফাসাদ বা ঝগড়া বিবাদের ভয় থাকে, শুধু মনে মনে বলবে, মুখে উচ্চারণ করবে না।[২০৩]

১৮. যখনই সুযোগ পাবে মসজিদে গিয়ে বসে থাকবে এবং সেখানে গিয়ে দীনি কাজে বা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকবে। যদি সমাজের সকল স্তরের লোকজন এ কথাগুলো অনুসরণ করে চলে, তাহলে সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হবে এবং ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।[২০৪]

১৯. অনেক লোকজন এমন আছে যারা মসজিদের পাখা হাতে নিয়ে নিজ কামরায় চলে যায়, আর মনে মনে ধারণা করে, এতে আর বড় ধরনের কি সমস্যা আছে? এটা তো ছোটখাটো একটা পাখাই। এমনিভাবে মসজিদের বদনা নিয়ে নিজ কামরায় চলে যায় এবং এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে থাকে। অথচ এগুলো বড় ধরনের অন্যায়। কারণ এগুলোর অধিকার তো সকল মুসল্লিদের সাথে।[২০৫]

এমনিভাবে মসজিদের বদনা লোটা এবং অন্যান্য সামানাদি যেগুলো ওয়াকফের সম্পদ। এগুলোর সাথে সকলের অধিকার জড়িত। এগুলো বাসাবাড়ি বা নিজ কামরা অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা মারাত্মক অন্যায়। অনুরূপভবে মসজিদের বদনার উপর সকলের আগে মেসওয়াক ইত্যাদি রেখে দখল করে রাখাও ঠিক নয়, কারণ এরূপ করার দ্বারা অন্যজন সেটা থেকে উপকৃত হতে পারে না। আর এটা না-জায়েয।[২০৬]

২০. কানপুরে একবার দুটি ছেলে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসলো। মসজিদে বসে তারা দু'জন পরস্পরে ইংরেজীতে কথা-বার্তা বলছিলো। কোনো একজন লোক তাদেরকে বলল, ভাই মসজিদে ইংরেজী কথা-বার্তা বলা উচিত নয়। তারা লোককে জিজ্ঞাসা করল, কেন? মসজিদের ইংরজিতে কথা-বার্তা বলা কি গুনাহের কাজ? অতঃপর তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য একজন কর্মচারীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো। আমি বললাম, যদিও না জায়েয নয়, কিন্তু অবশ্যই তা মসজিদের আদব পরিপন্থী। জনসাধারণ আদবকে খুব সাধারণ বিষয় মনে করে থাকে। অথচ আদবের গুরুত্ব কিন্তু কম নয়।[২০৭]

---

[২০৩]। হায়াতুল মুসলিমিন
[২০৪]। হায়াতুল মুসলিমিন
[২০৫]। হুসনুল আজিজ খ. ২ পৃ. ৪৩৯
[২০৬]। মাকালাত পৃ. ৪০
[২০৭]। হুসনুল আজিজ পৃ. ৪৭৫

সতর্কতা: আদব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদব বর্জন করা সাধারণ বিষয় নয়। হারাম, মাকরূহ, জায়েয, নাজায়েয মানুষ তখনই তালাশ করে যখন অন্তরে আদবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না। আর যখন মানুষের অন্তরে আদবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, মহব্বত, ভালোবাসা থাকে, তখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ শোনামাত্রই নিজের মস্তক ঐ নির্দেশের সামনে অবনমিত করে। হারাম, হালাল, জায়েয, নাজায়েযের তালাশের পিছনে পড়ে না। এই অভ্যাস হলো সাহাবায়ে কিরাম রা. এর। সাহাবারে কিরাম কখনোই হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েয, তালাশের পিছনে পড়েননি। নির্দেশ পেয়েছেন তো আমল শুরু করে দিয়েছেন, আবার নিষেধ করা হয়েছে তো, তখন তা থেকে বিরত থেকেছেন।[২০৮]

২১. জনাবে রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশের জন্য উম্মতকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

২২. এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

সুবহানাল্লাহ! রাসূল সা. এর কি আশ্চর্যজনক মু'জিজা যে, তিনি প্রতিটি কাজের জন যথোপযোগী দোয়া উম্মতকে শিখিয়েছেন। আখেরাতের নিয়ামত অর্জনের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হয়, তাই তিনি আল্লাহর রহমত তলবের দোয়া শিক্ষা দিলেন, আর মসজিদ থেকে বের হয় দুনিয়ার নিয়ামত অন্বেষণের জন্য, তাই তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের দোয়া শিক্ষা দিলেন। পার্থিব নিয়ামত কে ফজল এই জন্য বলা হয় যে, দুনিয়ার নিয়ামত হলো আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত দান। আসল দান হলো আখেরাতের নিয়ামত। তিনি তা মৃত্যুর পর আখেরাতে বান্দাকে দান করবেন। যার কারণে তিনি দুনিয়ার নিয়ামতকে ফজল দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

২৩. মসজিদের হাকীকত কী? মসজিদের হাকিকত হলো এটা আল্লাহ তাআলার দরবার এবং রাজসিংহাসন। তাই এর আদবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাজার ঘাটের মতো এখানে উচ্চঃস্বরে কথাবার্তা বলবে না। অযথা শোরগোল, হৈ হুল্লা করবে না এবং সর্বদা তার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর রাখবে।[২০৯]

---

[২০৮]। হুসনুল আজিজজ খ. ৪ পৃ. ৪৭৬
[২০৯]। আল কালামুল হুসন পৃ. ২৬

২৪. অনেক লোকজন এমন আছে যারা মসজিদে এসে অন্যের জুতা এদিক সেদিক সরিয় দিয়ে সুবিধা মতো জায়গায় নিজের জুতা রেখে মসজিদে প্রবেশ করে। আমি এরূপ করারকে নাজায়েয মনে করি।[২১০]

২৫. সাহাবায়ে কিরাম রাযি. মসজিদের আদব ইহতিরাম কেমন করতেন, তার একটি নমুনা হলো, একবার দুই ব্যক্তি মসজিদের ভিতর উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিলো। হযরত উমর রা. তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, যদি তোমরা বাইরের মুসাফির না হতে, তাহলে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম।

أَتَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা কি মসজিদে নববীতে মসজিদের আদব ক্ষুণ্ন করে, উচ্চঃস্বরে কথা বলার জন্য এসেছে?

পাঠক একটু ভেবে দেখুন হযরত উমর রা. কি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন?

কারো সন্দেহ হতে পারে যে, উচ্চস্বরে কথা না বলার নির্দেশ শুধু মসজিদের নববীর জন্য, অন্য মসজিদের জন্য নয়? কিন্তু এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়, কারণ রাসূল সা. সকল মসজিদকে নিজের বলে দাবি করে ইরশাদ করেন-

فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

তোমার কখনো-ই আমার আমাদের মসজিদের সন্নিকটেও আসবে না। এই হাদীসে তিনি সকল মসজিদকে নিজের জন্য দাবি করেছন। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, পূর্বের নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীর জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং সকল মসজিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ।[২১১]

ഇ ശ്ച ര

---

[২১০] । হুসনুল আজিজ পৃ. ৩২৩
[২১১] । আদাবুল মাসাজিদ

অধ্যায়-১৫

ব্যবহারিক জিনিসপত্রের আদবসমূহ

আদব: কোনো জিনিস যদি একাধিকজন ব্যবহার করে, তাহলে প্রত্যেকে ব্যবহারের পর জিনিসটি যথাস্থানে রেখে দিবে। তাহলে পরবর্তীতে যারা ব্যবহার করতে আসবে, তাদেরকে অযথা সমস্যায় পড়তে হবে না।

আদব: অনেক জায়গায় শোয়া অথবা ঘুমাবার জন্য চৌকি থাকে না। এরকম জায়গায় কখনো চৌকি নিয়ে আসলে, কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পরেই সেটা এক সংরক্ষিত জায়াগায় রেখে দিবে, যাতে করে অন্যের হাঁটা চলায় কষ্ট না হয়।

আদব: যে জায়গায় অন্যের জুতা রাখা আছে, সে রাখা জুতাগুলো সরিয়ে নিজের জুতা রেখে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। কারণ যেখানে যার জুতা রাখা আছে, সেটা তার অধিকার। পরবর্তীতে সে এসে ঐ জায়গায় জুতা তালাশ করবে। যদি যথাস্থানে জুতা না পায় তাহলে অস্থির হয়ে পড়বে।

আদব: একদা আমার মাদরাসার কোনো একটি কিতাবের প্রয়োজন হলো, যেটা আমার এক বন্ধুর কাছে আমানত ছিলো। সে তখন মাদরাসায় উপস্থিত ছিলো না। এই জন্য তিনি যেই জায়গায় কিতাব রাখেন সেই জায়গায় তালাশ করতে বললাম, তার পরেও পাওয়া গেল না। যার কারণে আমি নিজেই কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর দেখতে পেলাম যে, এক ছাত্র সেখানেই বসে কোনো এক কিতাব পড়ছে। ঐ কিতাবের নিচে সে কিতাবটি রেখেছে। কিতাবটি তার কিতাবের নিচে হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছিল না। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, দেখ তোমার কারণে কয়েক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, তুমি অন্যের কিতাব অনুমতি ছাড়া নিজের কিতাবের নিচে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, তোমার এ কাজের কারণে কিতাবটি যথাসময়ে পাওয়া গেল না, আবার এতগুলো মানুষ পেরেশান হয়ে গেল, সামনে থেকে কখনোই এরূপ কাজ করবে না।

আদব: বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য অনেকে বিল্ডিংয়ের ছাদের নালার মুখ রাস্তার দিকে করে থাকে, যা মূলত আদৌ উচিত নয়। কারণ এর দ্বারা পথচারীগণ কষ্ট

পায়। যদিও কেউ কেউ কোনো কারণে মুখে কোনো কিছু বলে না, কিন্তু তোমার তো এই বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা দরকার।

আদব: শরীর এবং কাপড় দুর্গন্ধ হতে দিবে না। যদি কাপড় ধৌত করার কোনো লোক না থাকলে তাহলে নিজেই ধুয়ে দিবে।

আদব: কারো কোনো জিনিস অন্যের হাতে পৌঁছানোর প্রয়োজন হলে দূরে থেকে ছুড়ে মারবে না, বরং কাছে গিয়ে তার হাতেই পৌঁছিয়ে দিবে।

আদব: রাস্তায় চৌকি, পিড়ি, ইট অথবা অন্য কোনো থালা-বাটি রাখবে না, যার দ্বারা অন্যের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে।

আদব: ফলের খোসা বা বিচি অন্যের উপর নিক্ষেপ করবে না।

ব্যবহারিক জিনিসপত্রের আরো কিছু আদব

১. মানুষের মাথার দিক থেকে কোনো ভারী জিনিসপত্র বা খাবার, পানি দিবে না এবং বহন করে নিয়ে যাবে না। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, হাত থেকে ছুটে তার উপর পড়ে গিয়ে সে আহত হবে।

২. কাপড় সেলাই করতে গিয়ে যদি কখানো সুই আটকে পড়ে, তাহলে কখানোই দাত লাগিয়ে খুলবে না। এজন্য যে, অনেক সময় সুই ভেঙে তালু বা মুখে ফুটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. সুই অথবা এ জাতীয় কোনো জিনিসের কাজ শেষ করে, তা নির্ধারিত জায়গায় রেখে দাও। কারণ পড়ে থাকার কারণে অন্যের শরীরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৪. চাকু বা এ জাতীয় কোনো জিনিস দ্বারা দাত খেলাল করবে না।

৫. পাথার, ইট, বালি যেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ থাকে, সেখানে সাদারণত সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থাকে। এ কারণে সেগুলো খুব বুঝে শুনে উঠাবে, যাতে করে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত না হও।

৬. ঠান্ডার সময় মোটা এবং বেশি কাপড় পরিধান করবে। অধিকাংশ মহিলাদের স্বভাব, তারা ঠান্ডার সময়েও মোটা কাপড় পরিধান করে না। যার কারণে অধিকাংশ সময় ঠান্ডা লাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়।

৭. রেশম এবং পকরেম কাপড়ের ভাজে নিমের পাতা অথবা কাফুর রেখে দিবে, তাহলে কাপড়ে পোকা ধরবে না।

৮. যখন বিছানায় শোয়ার জন্য যাবে, তখন কোনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঝেড়ে নিবে, কারণ হতে পারে কোনো বিষাক্ত পোকামাকড় বিছানার ভিতর রয়েছে।

৯. খাবার থেকে ফারিগ হওয়ার পর খাবারের বাটি উঠিয়ে তারপর নিজে উঠবে।

১০. খাবারের অংশ এদিক সেদিক ফেলে রাখবে না। যেখানে পড়ে থাকবে, সেখান থেকে উঠিয়ে নিবে এবং পরিস্কার করে খাওয়া সম্ভব হলে খেয়ে নিবে আর নিজে খাওয়া সম্ভন না হলে কোনো প্রাণীকে খাইয়ে দিবে।

১১. জ্বলন্ত আগুনের কয়লা এদিক সেদিক ফেলে রাখবে না। আগুন নিভিয়ে রাখবে, অথবা জুতা দিয়ে পায়ে পিশে ফেলবে, যাতে তার মাঝে আগুনের চিহ্নও না থাকে।

১২. জ্বলন্ত বাতি খালি স্থানে রাখবে না।

১৩. পায়খানা অথবা এরূপ কোনো স্থানে বাতি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে হলে খুব সতর্কতার সাথে নিয়ে যাবে। যাতে করে কাপড়ে আগুন লেগে না যায়।

১৪. চীনামাটি বা কাচের জিনিসপত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করবে না, কারণ সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়।

১৫. প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সর্বদা নিজের সাথে রাখবে।

১৬. রেল অথবা এরূপ কোনো সফরে অপরিচিত লোকের দেয়া কোনো কিছু খাবে না। কারণ, অনেক অসৎ উদ্দেশ্যের লোকেরা বিষক্রিয়াযুক্ত বা নেশাযুক্ত খাবার খাইয়ে, মাতাল করে সমস্ত সামানাদি নিয়ে চলে যায়।

১৭. রেলের সফরে খুব খেয়াল রাখবে, তুমি যে পর্যায়ের ভাড়ার টিকেট করেছ ঐ পর্যায়ের সিটেই বসবে। তার চেয়ে উন্নতমানের ছিটে বসবে না।

১৮. যখন রেলের সফর করার প্রয়োজন হবে, তখন রেলের টিকেট এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খুব হেফজতে রাখবে, অথবা বড় যে আছে তাকে দিবে। সফরকালীন সময়ে বেপরোয়া হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে না। অপরিচিত কোনো নারীকে তোমার মনের কথা খুলে বলবে না। নিজের স্বর্ণালংকারের কথা অন্যের কাছে বলবে না। অপরিচিত লোকের দেয়া কোনো কিছু যেমন পান, মিঠাই ইত্যাদি ভক্ষণ করবে না। স্বর্ণালংকার পরে সফর করবে না, বরং সফরের সময় সেগুলো খুলে রাখবে। যখন কাঙ্খিত জায়গায় পৌছে যাবে, তখন সেগুলো পরিধান করবে।

১৯. মেয়েদের নিয়ে সফর করার সময় যদি গাড়িতে মেয়েদের বসার জায়গা আর পুরুষদের বসার জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে যে স্টেশনে তোমরা নামবে, মেয়েরা ঐ স্টেশনের নাম শুনে অথবা ঐ স্টেশনের নাম লেখা দেখেই নেমে যাবে না। কারণ অনেক শহর তো এমনও আছে যেই শহরে দুই তিনটি স্টেশন থাকে। হতে পারে নাম শুনে তুমি এক স্টেশনে নামলে আর পুরুষ অন্য স্টেশনে নামল, তখন উভয়েই সমস্যার সম্মুখীন হবে। এজন্য উচিত হলো, মেয়েরা সর্বদাই পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। যখন নিজ ঘরের পুরুষ আসবে, তখন এক সাথে অবতরণ করবে। এতে করে উভয়ে ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে।

২০. সফরের সময় প্রয়োজনীয় কিছু খরচা সাথে রাখবে।

২১. শিক্ষিত নারী-পুরুষগণ সফর করার সময় অবশ্যই একটি মাসআলার কিতাব, কিছু কাগজ ও পেন্সিল সাথে রাখবে, যাতে করে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে।

২২. যদি তুমি ঋণী হও, তাহলে যখনই সুযোগ হবে, যে পরিমাণ সম্ভব হবে পরিশোধ করে দিবে।

২৩. যেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তুমি লজ্জিত হবে, সেখান থেকে ঋণ নিবে না এবং এ পরিমাণ ঋণও কাউকে দিবে না, যে পরিমাণ সে পরিশোধ না করলে তোমার কষ্ট হয়।

২৪. কোনো বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া হাতে বানানো ওষুধ সেবন বা ব্যবহার করবে না। বিশেষভাবে এ জাতীয় ওষুধ চোখে ব্যবহার করা আদৌ উচিত নয়।

২৫. কারো কাছ থেকে কোনো জিনিস চেয়ে নিয়ে আসলে খুব সতর্কতার সাথে রাখবে, যাতে করে কোনো ক্ষতি সাধন না হয়। কাজ শেষ করার পর সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে পৌঁছে দিবে। এই আশায় রেখে দিবে না যে, যার জিনিস সে এসে নিয়ে যাবে। কারণ মালিক কিভাবে জানবে যে, তোমার কাজ শেষ। দ্বিতীয়ত, এমনও হতে পারে যে, সে লজ্জার কারণে তোমাকে কিছু বলছে না, অথবা তুমি যে এ জিনিস নিয়ে এসেছ সে ঐ কথা ভুলেই গেছে। এরপর যখন তার প্রয়োজন পড়বে তখন সে অযথায় পেরেশান হয়ে পড়বে।

২৬. অন্যের জিনিস যেমন বাটি, চাকু ইত্যাদি, যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিবে। যদি ঘটনাক্রমে তখন পৌছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলোকে নিজের জিনিসপত্রের সাথে রাখবে না; বরং

পৃথকভাবে রেখে দিবে, যাতে করে সেটা নষ্ট না হয়। এমনিভাবে অনুমতি ছাড়াই কারো জিনিস ধরা গুনাহের কাজ।

২৭. অন্যের জিনিস তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবে না। যদি কখনো এরূপ হয়ে যায়, তাহলে যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দিবে। যাতে করে ঐ জিনিসের মালিক খুজতে গিয়ে অযথা পেরেশানির সম্মুখীন না হয়।

২৮. নিজের প্রতিটি জিনিসের জন্য জায়গা নির্ধারিত করে রাখবে। প্রতিটি জিনিসই ব্যবহারের পর যথাস্থানে রাখবে। এতে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে না।[২১২]

২৯. অনেক লোক এমন আছে তারা চাবি এদিক সেদিক ফেলে রাখে। এটা বড় ধরনের ভুল।

৩০. এ পরিমাণ বোঝা তুমি উঠাবে যে পরিমাণ বোঝা বহন করতে পারবে। সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বহন করবে না। আমি এমন অনেক লোকদের দেখেছি, যারা শৈশবে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বহন করার কারণে, সারা জীবন কষ্ট করতে হয়েছে। বিশেষভাবে মেয়েরা, তারা সর্বদা ভারী বোঝা বহন করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ তাদের শরীরের জোড়া খুব দুর্বল হয়ে থাকে।[২১৩]

৩১. হাসি তামাশায় কারো উপর পাথর ছুড়বে না এবং গুলি মারবে না, কারণ অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে দাঁত বা চোখে লেগে যেতে পারে।

৩২. মজলিসের ভিতর দিয়ে কোনো ধারালো অস্ত্র যথা বটি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে ধারের দিক ঘুরে নিজের দিকে করে নিবে, যাতে করে অসর্তকতাবশত কারো শরীরে লেগে না যায়।

৩৩. ধারালো অস্ত্র উঁচু করে কারো দিকে ইশারা করবে না। কেননা হতে পারে, হাত থেকে পড়ে গিয়ে কেউ আহত হবে।

৩৪. তলোয়ার, চাকু খোলা অবস্থায় কারো হাতে দিবে না। হয়ত বন্ধ করে দিবে, অথবা জামিনের উপর রাখবে,. সে তুলে নিবে।

৩৫. যদি কোনো অভাবী লোক কঠোর প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে তার কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করতে চায়, তাহলে সুযোগ মনে করে অতি অল্প দামে ক্রয় করবে না বরং তাকে তুমি যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে, আর যদি ক্রয় করতেই হয়, তাহলে উচিত মূল্যে ক্রয় করবে।

---

[২১২]। রহমাতুল্লিমীন পৃ. ৭৯

[২১৩]। বেহেস্তী জেওর খ. ১০

৩৬. যে গাছের ছায়ায় পথিক বা কোনো প্রাণী আরাম করে এবং সে গাছের তুমি মালিক নও, এমন গাছ কখনো কেটে ফেলবে না। কারণ তা কেটে ফেললে পথিক ও আল্লাহর মাখলুক কষ্ট পাবে এবং এটা শাস্তির কারণ হবে। এজন্য এরকম কাজ থেকে বাঁচা খুবই জরুরী।

৩৭. খাবার রান্না করার জন্য কাউকে আগুন দিয়ে সহযোগিতা করার সওয়াব হলো খাবার দান করার সমপরিমাণ। এমনিভাবে কাউকে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে সহযোগিতা করার সওয়াবও ঐ পরিমাণ।

৩৮. যেখানে সচারাচর পানি পাওয়া যায়, সেখানে কাউকে পানি পান করানোর সওয়াব হলো এক গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ। আর যেখানে সচরাচর পানি পাওয়া যায় না সেখানে কাউকে পানি পান করানোর সওয়াব হলো কোনো মৃত মানুষকে জীবিত করার সমপরিমাণ।

৩৯. এমন ছাদের উপর ঘুমাবে না, যার পাশে বর্ডার নেই। কারণ সেখান থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

৪০. কিছু রোদ কিছু ছায়ার মাঝে বসবে না।

৪১. উপুর হয়ে ঘুমাবে না।

৪২. যদি হাত থেকে কোনো লোকমা জমিনে পড়ে যায়, তাহলে সেটা তুলে পরিস্কার করে খেয়ে নিবে। অহংকার, দম্ভ করবে না। এটা তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে নিয়ামত হিসেবে দেয়া হয়েছে। তোমার মতো অনেকে আছে যারা তা পায়নি।

৪৩. যে সমস্ত খাবার আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া যায়, সে সমস্ত খাবার তিন আঙ্গুলে দিয়ে খাবে। খাবারের পর আঙ্গুলে লেগে থাকা অংশগুলো খুব পরিস্কার করে খাবে। যখন বরতনের খাবার শেষ হয়ে যাবে, তখন বাসন পরিস্কার করে খাবে, কারণ এতে বরকত রয়েছে।[২১৪]

৪৪. ঘরের প্রতিটি জিনিস নির্ধারিত জায়গায় রাখবে। পরিবারের সকলেই এ অভ্যাস গড়ে তুলবে, যে জিনিস যেখান থেকে নিবে, ব্যবহারের পর পুনরায় ঐ জিনিস যথাস্থানে রাখবে, যাতে করে আরেক জনের প্রয়োজন হলে খোজাখুজি বা কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

৪৫. যে জিনিস তোমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের সেটিও নির্ধারিত জায়গায় রাখবে, যাতে করে প্রয়োজনের সময় তুমি হাত দিলে সহজেই পেয়ে যাও।

---

[২১৪] । তা'লীমুদ্দীন

৪৬. কারো সামনে কোনো লিখিত কাগজ বা কিতাব থাকলে উঠিয়ে দেখবে না। কারণ হতে পারে ঐ কাগজে গোপন কোনো বিষয় লেখা রয়েছে অথবা কিতাবের ভিতর গোপন কোনো বিষয় লেখা কাগজ রয়েছে, যা প্রকাশ পাওয়া তার মালিক অপছন্দ করছে।

৪৭. যেখানে লোকজনের সমাগম সেখানে কাপড় বা কিতাবাদি ঝাড়বে না। কারণ সেগুলোতে যে ময়লা বা মাটি আছে সেগুলো তাদের মুখে বা চোখে পড়বে, যা বিরক্তির কারণ। তাই দূরে গিয়ে নিরাপদ কোনো জায়াগায় পরিস্কার করবে।

৪৮. একাধিক মালিকানার জিনিস খরিদ করবে না, কারণ তাতে যথাসম্ভব ঝগড়া বিবাদের সম্ভবনা থাকে। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

৪৯. যতদূর সম্ভব দূর থেকে কোনো জিনিস চাইবে না, কারণ তাতে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৫০. প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার বাড়িওয়ালাদের উপর এ ব্যাপারে খুব কঠোরতা করবে যে যদি কারো বাড়ি থেকে খাবার আসে তাহলে খাবার তাৎক্ষণিক ঢেলে রেখে বাটি ফিরিয়ে দিবে।[২১৫]

ꪶ ꪴꪫ ꪵ

২১৫। তারজীহুল আখেরা

অধ্যায়-১৬

ওয়াদা করার আদবসমূহ

আদব: জালালাবাদের কোনো এক মাদরাসার মক্তব বিভাগের একজন শিক্ষক অসুস্থ হলে মাদরাসার মুহতামিম সাহেব দু-চার দিনের জন্য একজন শিক্ষক চেয়ে আমার কাছে আবেদন করলেন। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার কথায় কেউ যেন বাধ্য না হয়। এজন্য একজনকে বললাম আপনি এখানের সকল উপস্থিতিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যদি কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তার যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে একজন যাকের আমার অনুমতি সাপেক্ষে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল।

এ কথার পর মুহতামিম সাহেব চলে গেলেন। যে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়েছিলো সে পরের দিন আমার কাছে এসে আপত্তি জানাল যে, আমি যেতে পারছি না। আমি ঐ যাকেরকে বললাম, এই ওজর আপনি মুহতামিম সাহেবের কাছে করুন। যেহেতু আমার অনুমতি নিয়ে আপনি তার কাছে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এখন না গেলে সে মনে মনে ভাববে, আপনার যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু আমি নিষেধ করার কারণে আপনি যাননি। আপনি কি আমাকে দোষী বানাতে চাচ্ছেন? এটা কি ধরনের মন্দ কথা।

আপনি এখনি জালালাবাদ চলে যান, সেখানে গিয়ে মুহতামিম সাহেবকে বলুন যে, তিনি আমাকে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত সমস্যায় এখানে অবস্থান করতে পারছি না, এরপর লোকটিকে আমি পাঠিয়ে দিলাম। অন্যকে অযথায় দোষী বানানো এটা কিরূপ মন্দ স্বভাব।

ওয়াদার আরো কতিপয় আদব

থানভী রহ.-এর ওয়াদা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

১. জনৈক মহিলা হযরতের কাছে সুরমা চেয়েছিলো। হযরত সুরমা দেয়ার অঙ্গীকার করে এ কথা বললেন না যে, ঠিক আছে এনে দিব; বরং বললেন, কোনো ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে আমি দিয়ে দিব। সে সুবাদে মহিলা যোহরের

নামাযের পর সুরমা নেয়ার জন্য এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিলো। হযরত বোতল থেকে সুরমা বের করে তাকে দিয়ে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার মাঝেই শান্তি। মানুষের অবস্থা তো এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা শৃঙ্খলাকে এখন বিশৃঙ্খলা মনে করে। যদি আমি বলে দিতাম যে, ঠিক আছে আমি সুরমা এনে দিব, আর কাজের ব্যস্ততার কারণে ভুলে যেতাম আর সে আমাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিত আর আমি আবারো ভুলে যেতাম। এভাবে অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ হতো। আর সময়ও নষ্ট হতো। কিন্তু এখন নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করার কারণে খুব সহজেই কাজ সম্পাদিত হয়ে গেছে।[২১৬]

ওয়াদা মত না আসার পরিণাম ও ঋণ থেকে বেঁচে যাওয়া

২. হযরত বলেন, আমাদের গ্রামে বাহরম বখশ নাকে একজন বৃদ্ধ লোক ছিলো। সে একবার এক কৃষকের কাছে তরকারির কিছু বীজ চেয়েছিলো। সে বললল, আগামী পরশু এসো। ঘটনাক্রমে সে সময়মতো আসতে পারল না। কয়েকদিন বিলম্ব হয়ে গেল, এরপর আসলো। কৃষক খুব কষ্ট করে ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলল, আমি আপনাকে বীজ দিতে পারব না। বাহরাম বখশ বলল, কেন ভাই, আপনি তো আমাকে বীজ দেয়ার ওয়াদা করেছেন। কৃষক বললেন, আমি আপনাকে কোন দিন দেয়ার ওয়াদা করেছিলাম? বাহরাম বখশ বললেন, গত পরশু। কৃষক বললেন, যখন আপনি আপনার প্রয়োজনের জিনিস সময়মতো গ্রহণ করা থেকে এত দেরি করেছেন তাহলে এটা পরিশোধ করার ব্যাপারে যে কি পরিমাণ দেরি করবেন তো আল্লাহই ভালো জানেন।[২১৭]

ওয়াদা পূরণ এবং বন্ধুদের পীড়াপীড়ির নমনীয় জবাব

৩. হযরত যখন আন্তারা নামক স্টেশন থেক সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তখন তার বন্ধু বান্ধবগণ ও ভক্তকুল সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলো। কেউ একদিন কেউ অর্ধ দিন, আবার কেউ দু-এক ঘন্টার মেহমান হওয়ার জন্য হযরতকে আবেদন জানালেন। মোটকথা তারা এমনভবে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলেন যে, হযরত তাদের কথার জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হযরত অবশেষে বাধ্য হয়ে বললেন, আপনাদের মেহমান হওয়াতে আমার তো কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু পূর্ব থেকেই প্রোগ্রাম করা আছে যে, আগামী মঙ্গলবার দিন খাজা আজিজুল হাসান সাহেব

২১৬

২১৭। হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ২৪

নামক এক বুযুর্গ এলাহাবাদ আগমন করবেন, আমাকে সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। আমি আপনাদের মনের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় আন্তরিকভাবে মর্মাহত। কিন্তু যেহেতু তাদের সাথে আমার অঙ্গীকার হয়েছে, এ কারণে আমাকে সেখানে যেতেই হবে। তবে এতটুকু করা যেতে পারে যে, আপনারা সকলেই মঙ্গলবার এলাহাবাদে আসেন, এসে খাজা আজিজুল হাসান সাহেবকে সবকিছু খুলে বলেন। তিনি যদি সকল প্রোগ্রাম মুলতবি করে আমাকে আসার অনুমিত দেন, তাহলে আমি পুনরায় এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে আপনাদের সকলের বাড়িতে মেহমান হব। তবে শর্ত হলো খাজা সাহেবের উপর কেউ চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন না। এখানের প্রত্যেক এলাকা হতে একজন প্রতিনিধি আমার সাথে চলুন এবং তার সাথে আলোচনা করে তাকে রাজি করুন। এরপর যা সিদ্ধান্ত হবে, আমি তার উপরই আমল করব। দ্বিতীয়ত, দু-একটা প্রোগ্রামের জন্য আমি এত কষ্ট করতে পারব না। কমপক্ষে পাঁচটি প্রোগ্রাম থাকতে হবে। যদি এই সকল শর্ত আপনারা মেনে নিতে পারেন, তাহলে আমি আসতে প্রস্তত।[২১৮]

ഇ ৩%ഇ ৫২

[২১৮]। হুসনুল আজিজ খ. ৪ পৃ. ১৮৬

অধ্যায়-১৭

অপেক্ষা করার আদবসমূহ

আদবঃ যদি কারো অপেক্ষায় বসে থাকো, তাহলে এমন জায়গায় এমন অবস্থায় বসে থাকবে না যে, সে দেখলেই বুঝে ফেলে, তুমি তার অপেক্ষায় বসে আছ। কারণ এর দ্বারা অযথাই তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে এবং তার কাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে। এজন্য তার চোখের আড়ালে দূরে কোনো জায়াগায় গিয়ে বসে থাকবে। যখন সে কাজ থেকে ফারিগ হবে, তখন গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

আদবঃ কিছু লোকের বদ অভ্যাস আছে, তারা নিজের প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির নিকট গিয়ে, তার পিছনে বসে গলায় আওয়াজ করতে থাকে। উদ্দেশ্য হলো তার গলা পরিস্কারের আওয়াজ শুনে সে তার দিকে মনোনিবেশ করবে, তখন নিজের প্রয়োজনের কথা তার কাছে ব্যক্ত করবে। এটা অত্যন্ত মন্দ পদ্ধতি। এর দ্বারা তার কষ্ট হয়; বরং তার চেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, তার সামনে গিয়ে বসবে এবং যা বলা প্রয়োজন তা বলে দিবে। তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবে ঐ সময় যখন তোমার তীব্র প্রয়োজন হবে। তা না হলে সাধারণ প্রয়োজনে এরূপ করবে না। বরং যখন তিনি কাজ থেকে ফারিগ হয়ে তোমার কাছে আসবে তখন তোমার যা বলার বলবে।

আদবঃ অযীফা পাঠ করা অবস্থায় কারো অতি সন্নিকটে বসবে না। কারণ এতে তার একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে এবং অযীফা পাঠে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তবে নিজ জায়গায় বসে থাকাতে কোনে সমস্যা নেই।

অপেক্ষা করার আরো কতিপয় আদব

১. যদি তুমি কোনো ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকো, আর সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তার নজরের আড়ালে এমন জায়গায় অবস্থান করবে, যাতে করে সে তোমাকে না দেখে। কারণ যদি সে তোমাকে দেখে, তাহলে তার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। অতঃপর যখন সে তার কাজ থেকে ফারিগ হবে, তখন তুমি তার কাছে এসে যা বলার বলবে।[২১৯]

---

[২১৯]। দাওয়াত মাকালাত খ. ২ পৃ. ২৬৯

২. প্রতিদিন আমার কাছে যে সমস্ত চিঠি আসে সেগুলোর জওয়াব লিখে আমি ঐ দিনই পাঠিয়ে দেই, এর কারণ দুটি- এক. আমি আমার দায়িত্ব থেক মুক্ত হতে চাই। অর্থাৎ যদি এটা রেখে দেই তাহলে আস্তে আস্তে আমার উপর বোঝা হয়ে যাবে। দুই. যে চিঠি পাঠিয়েছে, সে যেন সময় মতো জবাব পেয়ে যান, অপেক্ষা করে তাকে কষ্ট করতে না হয়। কাউকে কোনো কাজে অপেক্ষার প্রহর গোনানো ঠিক নয়। কারণ অপেক্ষা করা অনেক কষ্টের কাজ।[২২০]

৩. যদি কেউ কোনো জায়গায় সফরের ইচ্ছা করে, তাহলে যথাসময়ের পূর্বেই স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার মাঝেই সতর্কতা। স্টেশনে বসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে, এতেই আরাম। কারণ সময়মতো না গেলে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় গাড়ি না পওয়ার সম্ভবনাও থাকে।[২২১]

৪. অনেকে মুসাফাহার জন্য এসে এমন জায়গায় বসে থাকে, তাকে দেখলে আমার অনুভব হয়ে যে, সে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। এতে আমার অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং কাজের মাঝে ব্যাঘাত ঘটে। কারণ তার অবস্থা দেখে মনে হয় যে, লোকটি আমাকে কিছু বলার জন্য অথবা কোনো প্রয়োজনে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যখন তার কাছে যাওয়া হয়, তখন মুসাফাহা করে চলে যায়। ব্যস্ত লোকদের কাছে গিয়ে এরূপ করা আদৌ উচিত নয়, বরং তার নজরের আড়ালে কোনো জায়গায় গিয়ে বসে থাকবে। যখন কাজ থেকে ফারিগ হবে তখন মুসাফাহা করবে।[২২২]

ᑲ ଓଃ ଔ ᑕ

২২০। মালফুজাতে আশরফিয়া পৃ. ২৮৮

২২১। আল ফজলু ওয়ালওয়াসাল পৃ. ২১৯

২২২। আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ. ২৩৮

অধ্যায়-১৮

ঋণ দেয়া-নেয়ার আদবসমূহ

আদবঃ যার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হবে যে, তার কাছে ঋণের আবেদন করলে বিভিন্ন সমস্যা থাকার পরেও সে তোমাকে ঋণ দেয়া থেকে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না এমন ব্যক্তির কাছে ঋণের আবেদন করবে না। তবে হ্যাঁ যদি তুমি নিশ্চিত হও যে, তার সমস্যা হলে তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিবে, তাহলে তার কাছে ঋণের আবেদন করতে কোনো সমস্যা নেই।

অন্যকে কিছু বলা বা কোনো নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবে। এমনিভাবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবে। বর্তমান সময়ে মানুষেরা এগুলোর পতি মোটেও খেয়াল করে না। অর্থাৎ বিষয়গুলোকে সাধারণ মনে করে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না।

ঋণ সংক্রান্ত আরো কতিপয় আদব

১. যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকবে। একান্ত প্রয়োজনে কখনো ঋণী হয়ে গেলে, যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে দিবে। কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার পর একেবারে চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থাকবে না। যদি ঋণদাতা তোমাকে মন্দ বলে, তাহলে সে কথা শুনে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। কেননা তার বলার অধিকার আছে।[২২৩]

২. যদি তুমি কারো কাছে ঋণী হও, অথবা অন্য কেউ তোমার কাছে আমানত রাখে, অথবা তোমার কাছে কোনো ব্যক্তির কিছু পাওনা থাকে, তাহলে সেগুলো ডায়েরিতে ওসিয়ত আকারে লিখে রাখবে, যাতে কোনো দুর্ঘটনায় তোমার ওয়ারিশগণ তা আদায় করে দিতে পারে।

৩. মন্দ জিনিস দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না ; বরং এই হিম্মত রাখবে যে, তুমি যেই রকম গ্রহণ করেছ, তার চেয়ে আরো উন্নত জিনিস দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে। তবে নেয়ার সময় এই অঙ্গীকার করবে না।

৪. যখন তুমি কারো ঋণ পরিশোধ করবে, তখন ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণদাতার জন্য মঙ্গলের জন্য দোয়া করবে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

---

[২২৩]। তালীমুদ্দীন পৃ. ৬৬

৫. যদি তোমার ঋণ গ্রহীতা দরিদ্র হয়, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে তার উপর কঠোরতা করো না। তাকে কিছু দিনের জন্য সুযোগ দাও, অথবা তার ঋণ ক্ষমা করে দাও। কারণ পার্থিব জগতের এই সামান্যতম ঋণ ক্ষমা করে দেয়ায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তোমার বড় বড় অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।[২২৪]

৬. যদি তোমার ঋণগ্রহীতা, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যকে বুঝিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করো। অযথা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তোমার ঋণ গ্রহীতাকে কষ্টে নিপতিত করো না।[২২৫]

৭. যারা প্রয়োজন বশবর্তী হয়ে আমার কাছ থেকে ঋণ গহণ করে এবং পরবর্তীতে সুযোগ হলে তার একাংশ আদায় করতে আসে, আমি তখন তাকে আমার নিজের কাছে বসাই এবং যে পরিমাণ সে পরিশোধ করেছে, তা ডায়েরিতে লিখে তা দেখিয়ে দেই যে, তুমি এই পরিমাণ পরিশোধ করেছ আর এই পরিমাণ বাকি রয়েছে, যাতে করে পরবর্তীতে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হয়। আর তাৎক্ষাণিক লিখে রাখি। কারণ এমনও তো হতে পারে যে, পরবর্তীতে লেখার কথা স্মরণ থাকে না।[২২৬]

৮. যারা অভাবি দরিদ্র তাদের জন্য অন্যের মাল নিজের কাছে আমানত না রাখাই ভালো। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, প্রয়োজনের সময় খরচ হয়ে যাবে, যদিও নিয়ত থাকে যে, সুযোগ হলে আদায় করে দেবে ; কিন্তু পরবর্তীতে সেই সুযোগ নাও আসতে পারে। ঠিক তেমনিভাব যথাসম্ভব ঋণও না নেয়া চাই, আর যদি প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে নিতেই হয়, তাহলে দ্রুত পরিশোধ করে দেয়া চাই। কারণ যখন একজন দুজন করতে করতে পাওনাদারের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে তখন ঋণ পরিশোধ করার নিয়ত আর বাকি থাকবে না। তখন মনে করতে থাকবে সবগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া তো আর সম্ভব নয়, এখন তো মানুষের কাছে অপমানিত হতেই হবে, তখন আর দু একজনেরটা পরিশোধ করে কি হবে।[২২৭]

৯. আমার নিকট যার আমানত আছে, তার কাছে আমি কখনোই ঋণ চাই না, অথবা এমন ব্যক্তির কাছেও ঋণ চাই না, যার ব্যাপারে আমার জানা আছে যে, সে আমার নিকট তার টাকা আমানত রাখার জন্য আসবে। আর আমি যে জানি সে সম্পর্কেও সে অবহিত। আমি এমন ব্যক্তির কাছে ঋণ চাই, যে নির্দ্বিধায়

---

[২২৪]। তালীমুদ্দীন পৃ. ৪৫
[২২৫]। তালীমুদ্দীন পৃ. ৬৫
[২২৬]। আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ. ২৮৩
[২২৭]। মাকালাতে হিকমত পৃ. ২০৮

নিঃসংকোচে আমাকে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, আর এতে তার উপর কোনো ধরনের প্রভাবও পড়বে না। এই বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। তোমাকে কেউ মহব্বত করে, অথবা ভালোবাসে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তুমি তার কাছ থেকে হীনস্বার্থ উদ্ধার করা কি ঠিক হবে? আদৌ এরূপ করা উচিত নয়। যে তোমার প্রতি খেয়াল রাখে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে তুমিও তার প্রতি খেয়াল রাখো, তার এই দুর্বলতার সুযোগে তার সাথে অসৎ ব্যবহার করো না। তার কাছ থেকেই উপকৃত হও, যে তোমাকে তার সমস্যার কথা পরিস্কার করে বলে দিতে পারে, বা তোমাকে ঋণ না দেয়ার কথাও নির্দ্বিধায় বলতে সক্ষম হবে। যে লোক চক্ষুলজ্জায় বা সংকোচের কারণে কোনো কিছু বলতে পারবে না তার কাছে তুমি তোমার ঋণের কথা ব্যক্ত করবে না।[২২৮]

১০. কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে তা তোমার ডায়েরিতে ভালো করে লিখে রাখবে, আবার যখন পরিশোধ করবে তখনও লিখে রাখবে।[২২৯]

১১. ঋণ বড় ভয়াবহ ব্যাপার। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে ব্যক্তি ঋণকে অপছন্দ করে না সে শেষপর্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। যে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকে, সে বড় হতভাগ। নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্তে বসে থাকাও নির্লজ্জতার পরিচয়। সুতরাং কখনো ঋণী হয়ে গেলে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করার ফিকির করবে।[২৩০]

১২. যদি তুমি ঋণগ্রস্ত হও এবং তোমার দেয়ার সামর্থ থাকে, তাহলে তা পরিশোধ না করে বাহানা করা বড় ধরনের অন্যায়। যেমন কিছু মানুষের অভ্যাস আছে, তারা পাওনাদার বা শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে অযথা হয়রানি করে। কখনো বলে আগামীকাল এসো, আগামী কাল আসলে আবার বলে পরশু এসো, এরকমভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। নিজের ও পরিবারের সকল খরচই চালায়, প্রয়োজনাদি মিটায়, কিন্তু অন্যের পাওনা আদায় করতে চরম গাফলতি করে।[২৩১]

ൟ ൣ ൠ ൡ

---

[২২৮]। হুসনুল আজিজ খ.১ পৃ. ২৬৩
[২২৯]। আল ইযাফাত খ. ৭ পৃ. ২৩৯
[২৩০]। মাকালাত খ. ৩৬৩
[২৩১]। বয়ানাত পৃ. ৭

অধ্যায়-১৯

সেবা শুশ্রূষা ও সমবেদনার আদবসমূহ

আদবঃ যেটুকু জায়গায় শরীয়ত পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছে, এমন জায়গায় কোনো জখম বা ঘা হলে এ কথা জিজ্ঞাসা করবে না যে, কোথায় জখম বা ঘা হয়েছে।

আদবঃ রোগীর কাছে বা তার আত্মীয়স্বজনের কাছে নৈরাশ্যের কোনো কথা বলবে না এবং এমন কোনো কথাও বলবে না যারা দ্বারা সে ব্যথিত হয় এবং অন্তর ভেঙে যায়; বরং তাদের সান্তনা দিবে এবং আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে, ইনশাআল্লাহ অচিরেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, কোনো ধরনের দুঃখ কষ্ট থাকবে না ইত্যাদি।

আদবঃ কারো অসুস্থতা পেরেশানি বা দুঃখ দুর্দশার সংবাদ শোনা মাত্রই নিশ্চিত না হয়ে তা প্রচার করা শুরু করে দিবে না। বরং আগে ভালোভাবে যাচাই করে নিশ্চিত হও, এরপর সেই সংবাদ বাস্তব হলে পরবর্তীতে অন্যের কাছে বলো। বিশেষ করে যার অসুস্থতার কথা শুনেছ, তার আত্মীয় স্বজনের কাছে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কখনোই সংবাদ দিবে না। কারণ যদি সংবাদটি পরবর্তীতে অবাস্তব প্রমাণিত হয় তাহলে অযথায় একজনকে পেরশানি করা হবে। আর তাছাড়া যে সংবাদ দিলো তার প্রতি খারাপ ধারণা করা হবে, তার কথা পরবর্তীতে অন্যরা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

সেবা-শুশ্রুষা ও সমবেদনার আরো কতিপয় আদব

১. শরীয়ত অসুস্থ ব্যক্তিকে ওষুধ গ্রহণ করার শুধু অনুমোদনই করেনি বরং উদ্বুদ্ধ করেছে। এইজন্য কখনো অসুস্থ হলে, ওষুধ গ্রহণ করাই ভালো।

২. হারাম জিনিস ওষুধ হিসেবে কখনোই ব্যবহার করবে না।

৩. শরীয়ত অনুমোদন করে না এমন তাবীজ, ঝাড় ফুক গ্রহণ করবে না।

৪. অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য কারো সামনে নজরানা পেশ করা অথবা কারো নামে মান্নত মানা শিরকের প্রকার।

৫. যদি কেউ এমন অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়, যা থেকে লোকজন ঘৃণা করে, তাহলে তার জন্য উত্তম হলো লোকজন থেকে দূরে থাকা। যাতে তার কারণে অন্যরা কষ্ট না পায়।

৬. অসুস্থ ব্যক্তিকে খাবারের জন্য বেশি চাপ প্রয়োগ করবে না।

৭. অনেক মানুষের অভ্যাস আছে, তারা অসুস্থ ব্যক্তির কাছে অনর্থক, আজে বাজে কিচ্ছা কাহিনী বলতে থাকে, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির সকল বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যা আদৌ উচিত নয়। এতে অসুস্থ ব্যক্তির কষ্ট হয়।

৮. এমনিভাবে পত্র বা টেলিফোন মারফতে দূরের আত্মীয়স্বজনকে সাধারণ অসুস্থতার ব্যাপারে সংবাদ জানাবে না। কারণ অনেক সময় এই সাধারণ খবর শুনে তারা মারাত্মকভাবে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

৯. আমি আমার অসুস্থতার সংবাদ কাউকে পত্র মারফতে জানাই না। কারণ অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে কি লাভ? অনর্থক কিছু পেরেশানি বাড়ানো হয়। পরম্পরে চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে কিছু সুওয়াল জবাব হয়। একদিক থেকে লেখা হয় কি অবস্থা? কিভাবে সুস্থ হলেন? অন্য দিক থেকে এর জবাব আসে এতে অনর্থক কিছু সময় নষ্ট হয়। অথচ এতে মোটেও কোনো লাভ নেই। আর যদি সাধারণ ছোটখাটে কোনো অসুস্থতা হয়, তাহলে তো জানানোর প্রশ্নই আসে না। কারণ একপর্যায়ে এমন প্রকট অবস্থা দাড়িয়ে যায় যে, না-শুকরি পর্যন্ত পৌছে যায়। তবে হ্যাঁ, অনেকে আছে তারা শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায় যদি তাকে বাস্তব অবস্থা জানানো না হয়, তাহলে মনক্ষুণ্ন হবে। এজন্য বাধ্য হয়ে তাদেরকে জানাতে হয়। তবে এক্ষেত্রে তাদেরকে পূর্ববতী কোনো অসুস্থতার কথা জানাই না। এতে লাভ কি ? অনর্থক সময় ব্যয় হয়।

অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষার আরো কতিপয় আদব

ইসলামী সামাজিকতায় এক মুসলমান ভাইয়ের উপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার হলো ইয়াদত, তথা অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রূষা করা। এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আদব রয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে অনেকে আছে তারা বাড়াবাড়ি করে, আবার অনেকে শিথিলতা করে যা আদৌ উচিত নয় ; বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা দরকার।

১. অনেক লোকজন এমন আছে যারা অসুস্থকে দেখতে গিয়ে তার হাল পরছিও করে না। এটা সীমাহীন পর্যায়ের শিথিলতা। এরূপ কখনোই করবে না। কমপক্ষে অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

২. অনেকে তো আছে যারা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা জানতে গিয়ে এ পরিমাণ প্রশ্ন করে, যার কারণে রোগীর কষ্ট হয়। এটা চরম বাড়াবাড়ি। এটাও পরিত্যাজ্য। রোগীকে দেখতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না, কারণ এর কারণে রোগীর কষ্ট হয়। তবে হ্যা, কারা যদি অবস্থান করায় আরাম হয়, তাহলে তার কথা ভিন্ন। অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। অপ্রয়োজনে তার কাছে বসে থাকার কারণে অনেক সময় তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারে না এবং অনর্থক তার কষ্ট হয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا فَلْيُخَفِّفْ جُلُوْسَهُ

অর্থ: যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রুষা করতে যায়, সে যেন সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করে।|

৩. অনেক ডাক্তার এমন আছে যারা অসুস্থ ব্যক্তি বা তার আত্মীয়স্বজনকে বলে দেয় যে, দু-চারদিনের মাঝে রোগী মারা যাচ্ছে। এতে দু ধরনের খারাবি রয়েছে। এক. অযথা রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন পেরেশান হয়ে পড়ে। দুই, এর দ্বারা চিকিৎসার প্রতি আর তাদের আগ্রহ থাকে না।[২৩২]

৪. মানুষজন তার সাথী সঙ্গী বন্ধু বান্ধব ও মুরুব্বীদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য যায় না। অথচ এটাও করা দরকার।[২৩৩]

৫. এমনিভাবে তারা নিকট আত্মীয় স্বজনের জানাযায় অংশগহণ করে, কিন্তু অপরিচিত অন্য মুসলামন ভাইয়ের জানাজায় অংশ নেয় না, অথচ অপরিচত মুসলামন ভাইয়ের জানাযায়ও অংশগ্রহণ করা দরকার।[২৩৪]

৬. মানুষের ধারণা এত বেশি খারাপ হয়ে গেছে যে, তারা আরেকজনের কাজ কারবার মন্দ ধারণা পোষণ করে। আমি কোন রোগিকে দেখতে গিয়ে মনে মনে খেয়াল করলাম যে, সূরা ইয়াসিন পড়ে তাকে ফুঁ দিব। কিন্তু ভয় পেলাম যে, তার আত্মীয়স্বজনগণ মনে করবে যে, আমি তাকে মৃত ভেবে তার উপর সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে ফু দিচ্ছি অথবা পরবর্তীতে যদি মারা যায়, তাহলে তারা বলবে মৌলভী সাহেবের সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করার কারণে আমাদের রোগী মারা গেছে। তাই সূরা ইয়াাসিন আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করলাম।[২৩৫]

---

[২৩২]। হুসনুল আজিজ পৃ. ৩২
[২৩৩]। মাকালাতে হিকমত পৃ. ২৬৬
[২৩৪]। মাকালাতে হিকমত পৃ. ২৬৬
[২৩৫]। মাকালাতে হিকমত পৃ. ২৬৬

সমবেদনার আরো কতিপয় আদব

উর্দূ ভাষায় তা'জিয়াহ শব্দের অর্থ সমবেদনা জানানো। কিন্তু বর্তমান যেভাবে সমবেদনা জানানো হয়, তা সমবেদনা হয় না। বরং আরো চিন্তিত করে তোলা হয়।

সমবেদনার প্রচলিত পদ্ধতি

১. এখন লোকজন নিজেদের চিন্তা পেরেশানি বাড়ায়। বার বার পূর্বের ঘটনা স্মরণ করে, আর তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। আবার যারা সান্তনা দেয়ার জন্য বা সমবেদনা জানানোর জন্য আসে সেও ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আদৌ উচিত নয়। আর এটাকে কখনোই সমবেদনা বলা যায় না বরং শাস্তি বলতে হবে।

২. বর্তমানে পরিবেশ তো এমন হয়ে গেছে যে, সমবেদনা বলতে যা বুঝে আসে তা হলো, ব্যথিত ব্যক্তির কাছে বসেই কান্নাকাটি জুড়ে দেয়া অথবা কান্নার ভান ধরা এবং এরকম কিছু কথা বার্তা বলা যে, তোমার এ সংবাদ শুনে আমি আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। তোমার উপর অনেক বড় একটা ঝুকি এসেছে, যা সয়ে উঠা অনেক সহজ কথা নয়। এ কথাগুলো শুনে ব্যথিত ব্যক্তির অন্তর সান্তনা তো পায়ই না, বরং তার অন্তর ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে নারীদের মাঝে এই অভ্যাসগুলো ব্যাপক। তারা কেনো ব্যথিত ব্যক্তির কাছে বসা মাত্রই অনর্থক আজে বাজে কথা-বার্তা বলা আরম্ভ করে দেয়। এক্ষত্রে আমার ফাতোয়া হলো, ঐ সময় এমন কথা-বার্তা শোনা এবং শোনানো কোনোটাই ঠিক নয়। আর এরকম কথা-বার্তা শোনা শারীরিক ও ধার্মিক উভয় দিক থেকে ক্ষতি।[২৩৬]

৩. আজকাল অবস্থা তো এমন যে, যারা ব্যথিত ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাতে আসে, তারা এসে ঐ ব্যক্তির নিকট ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানতে চায়, বিশেষ করে নারীরা। তারা এসে ব্যথিত ব্যক্তির গলা ধরে কান্নাকটি আরম্ভ করে দেয়। তাদের সাথে আরো কয়েকজন এসে শরিক হয়। এখন অবস্থা দাঁড়াল যে, তাদের অবস্থা দেখে ব্যথিত ব্যক্তির কষ্ট আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। যারা সমবেদনা জানাতে এসেছে, তাদের কষ্ট তো একটা, আর এই ব্যক্তির কষ্ট কয়েকগুণ। আমি এ কথাগুলো বানিয়ে বলছি না, সমবেদনার এই পদ্ধতিগুলো বর্জনীয়।[২৩৭]

---

[২৩৬]। আস সবরু ওয়াসালাত পৃ. ৩০

[২৩৭]। আল মারাবিত পৃ. ৪৫

৪. যে লোক যুবক অবস্থায় মারা যায়, তাকে স্বজনদের সমবেদনা জানাতে গিয়ে অধিকাংশ লোক বলে থাকে, হায়! যুবক মানুষ এত তাড়াতাড়ি মারা গেল। এখনো তো ছোট বাচ্চাই রয়ে গেছে। এখন তো যাওয়ার বয়সই হয়নি।

তাদের জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে বড় শক্তিশালী এবং জ্ঞানী। কাকে কখন মৃত্যু দিতে হবে। কাকে কতদিন বেঁচে রাখতে হবে, তার ইলম আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। তার ফয়সালার বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বড় ধরনের বেআদবি এবং তার শানের আদব পরিপন্থী। এজন্য তার ফয়সালার বিরুদ্ধে কোনো কথা-বার্তা খুব চিন্তা করে বলা দরকার এবং শব্দের ব্যবাহারও খুব সতর্কতার সাথে করা উচিত।[২৩৮]

সবমেবদনার উদ্দেশ্য

সমবেদনার মূল উদ্দেশ্য হলো, শোকাহত মর্মাহত ব্যক্তিকে সান্তনা দেয়া, সমবেদনা জানানো এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াব করা। এই কাজগুলো মূলত সুন্নত। এছাড়া যত কাজ আছে যেমন দূর দরাজ থেকে মেহমানদের আগমন করা, দশমী চল্লিশা পালন করা এবং সেগুলোতে শরিক হওয়া ইত্যাদি কাজগুলো অনর্থক এবং বেহুদা। এগুলো থেকে বিরত থাকা এবং সমাজর লোকদের বেঁচে থাকা জরুরি।[২৩৯]

স্থানীয় লোকদের শোক পালন করা

শোকপালনের জন্য শরীয়ত তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে। এরপর শোকপালন করা মূলত শরীয়তের নির্দেশ লঙ্ঘন করা। এজন্য স্থানীয় লোকদের জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা জায়েয নেই। কারণ এখন শোক পালন করার অর্থ হলো, নিজে নিজেই জখম করে তাতে মলম লাগানো।

বাহিরের লোকদের জন্য শোক পালন করা

তবে যে সকল আত্মীয় স্বজন শহরের বাইর থেকে আসবে, তাদের জন্য তিনদিন পরেও শোক পালন করার অনুমতি আছে। কারণ যে দূরে আছে সে বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত না হওয়ার কারণে অথবা সরাসরি প্রত্যক্ষ না করার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হয়নি। পরবর্তীতে সে যখন ভালোভাবে জেনেছে, বা

---

[২৩৮]। আল ইযাফাত খ. ৫ পৃ. ৩৭০

[২৩৯]। তাসহীল খ. ১ পৃ. ৩০১

প্রত্যক্ষ করেছে, তখন তার অন্তর ব্যথিত হয়েছে। এ কারণে শরীয়ত বাইরের লোকদের জন্য তিনদিনের পরেও শোক পালন করার অনুমতি দিয়েছে। এমনিভাবে যদি সে শোক পালন না করে চুপচাপ থাকে, তাহলে পারিবারিকভাবেও সে লজ্জিত হবে, কারণ তখন ব্যথিত ব্যক্তি তার ব্যাপারে অভিযোগ করে অন্যের কাছে বলবে, আমি এতবড় একটা বিপদের সম্মুখীন হলাম, আমার ব্যথায় সে মোটেও ব্যথিত নয়। এমনকি একটু সান্ত্বনার কথা পর্যন্ত শোনাল না। সে অযথায় কেন আমার বাড়িতে আসলো? আসার কিইবা প্রয়োজন ছিলো। অন্যদিকে বাহির থেকে আগমণকারী আত্মীয় স্বজনগণও কোনো কিছু না বলে চুপচাপ থাকতে পারবে না। নিজের মনে অজান্তেই কমপক্ষে সান্তনা দেয়ার জন্য হলেও শোকাহত দু'চারটি শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে পড়বে, যার কারণে শরীয়ত বাহিরে থেকে আগমণকারী আত্মীয় স্বজনদের জন্য তিন দিন পরেও শোক পালনের অনুমতি দিয়েছে।

একটু লক্ষ্য করুন, শরীয়ত মানুষের প্রয়োজনের প্রতি কি পরিমাণ লক্ষ্য রেখেছে। যারা শহরের বাইরে থেকে আসবে তারা তিন দিন পরেও শোক পালন করতে পারবে। পক্ষান্তরে, যারা শহরেই অবস্থান করছে, তাদের জন্য তিন দিনের পর আর শোক পালনের অনুমতি প্রদান করেনি, যাতে উভয় দলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

এরপরেও আমাদের অনেক বুদ্ধিজীজি কোনো কোনো বিষয় নিয়ে বলে থাকেন যে, ইসলামের এই বিষয়টি ঠিক নয়। এখানে ইসলাম মানবতা লঙ্ঘন করেছে। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন, যে মানবতার প্রবর্তক সে কি মানবতা বুঝল না? যার জন্য প্রবর্তন করা হলো সেই কি ভালো বুঝল?[২৪০]

সমবেদনা জানানোর আদব

কোনো ব্যথিত মর্মাহত ব্যক্তিকে সববেদনা জানাতে এমন বিশেষ আত্মীয় স্বজনগণ যাবেন, যাদের দ্বারা সে সান্তনা লাভ করে। সকলেই যাবে না, বাকিরা পত্র বা টেলিফোন মারফতে সমবেদনা জানাবে।[২৪১]

যদি কোনো শোকাহত মর্মাহত ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাতে যাও, তাহলে তাকে এমন কিছু সান্তনার বাণী শোনাবে, যার দ্বরা পূর্বের খেয়াল তার অন্তর থেকে চলে যায়। কখনোই এমন কথা-বার্তা বলবে না, যা আজকাল বলা হয়ে থাকে

[২৪০] । আস সবরু ওয়াসসালত পৃ. ৩২-৩৩
[২৪১] । আনফাসে ঈসা পৃ ২৯৯

যেমন মৃত ব্যক্তির বিয়ের আগের কষ্টের কথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এমন কথার দ্বারা স্বজনদের কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।[২৪২]

শোক পালনের ক্ষেত্রে অযথা বাড়াবাড়ি করবে না। ফুকাহায়ে কিরামগণ এর জন্য তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছেন। এরপর শোক পালন করা আদৌ উচিত নয়। কেননা, এই সময়ের পর আর অন্তরে ব্যথা থাকে না।[২৪৩]

সমবেদনা জানানোর সঠিক পদ্ধতি

কাউকে সমবেদনা জানানোর সঠিক পদ্ধতি হলো, তার কাছে গিয়ে তাকে বিনম্র ভাষায় বলবে, ভাই যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, এখন কান্নাকাটি করে আর কি হবে? তোমার কান্নাকাটির কারণে সে তো আর জীবিত হবে না। আর সেগুলো তার কোনো উপকারেও আসবে না।

এখন তুমি এমন কাজ করো যা তার উপকারে আসে। তার ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করো। সেগুলোর সওয়াব তার জন্য পাঠিয়ে দাও। নফল ইবদাত করো, দান খয়রাত করো, সেগুলোর সওয়াব পৌঁছে দাও। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করো, আর মনে মনে এ চিন্তা করো যে, সে জান্নাতে চলে গেছে। সেখানে দুনিয়ার তুলনায় আরো অনেক আরাম আয়েশে আছে, অল্প দিনের মাঝে আমাদেরও সেখানে যেতে হবে। আমরাও সেখানে গিয়ে তার সাথে মিলিত হব।[২৪৪]

ꕥ ꕤ ꕥ

[২৪২] । আল ইয়াফাত খ. ৩ পৃ. ৬৮
[২৪৩] । হুসনুল আজিজ খ. ৩ পৃ. ১৬৭
[২৪৪] । আনফাসে ঈসা পৃ. ৩২৯

অধ্যায়-২০

প্রয়োজন উপস্থানের আদবসমূহ

আদব: যখন নিজের কোনো প্রয়োজন নিয়ে কারো কাছে যাবে, তখন সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিজের প্রয়োজনের কথা তার কছে ব্যক্ত করবে, তার জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায় থাকবে না। অনেক লোকজন এমন আছে তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোনো প্রয়োজনে এসেছেন কি? তাহলে বলে যে, না শুধু সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি। পরবর্তীতে সে যখন অন্য মনস্ক হয় বা কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, তখন বলে যে আমার কিছু কথা ছিলো। এরূপ করার দ্বারা যার কাছে এসেছে তার কষ্ট হয়।

আদব : যদি তুমি কারো কাছে নিজের দ্বীনি বা দুনিয়াবী প্রয়োজন নিয়ে যাও এবং সে তোমার ঐ বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহলে স্পষ্ট ভাষায় তার কাথার উত্তর দাও।

এমন এলোমেলো অগোছালো জবাব দিবে না, যাতে সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কারণ যদি তুমি এমন করো, তাহলে তোমার কথার দ্বারা ভুল বুঝার সম্ভাবনা আছে। অথবা ঐ কথার কারণে তার মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, সে তো তোমার জন্যই বিষয়টি যাচাই করছে। অথবা তাকে অবাস্তব কথা বলে অথবা বার বার প্রশ্ন করিয়ে বিরক্ত করার কি প্রয়োজন রয়েছে। এর মাঝে তো তার কোনো স্বার্থ নেই। যদি তুমি তাকে সঠিক ও সত্য কথা বলতে না পারো তাহলে তার কাছে তোমার প্রয়োজনই পেশ করার দরকার নেই। তুমি নিজেই তার কছে গেলে, আবার তাকে বিরক্ত করার অর্থ কি ?

আদব: যদি দ্বিতীয় বার কারো কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বলা দরকার হয়, তাহলে পুরোপুরি বলবে, প্রথম বার বলার উপর ভরসা করে কোনো কথা বাদ দিবে না, কারণ হতে পারে সম্ভবত তুমি শ্রোতার কাছে প্রথমবার যে কথাগুলো বলেছ তা স্মরণ নেই। অথবা অর্ধেক বা অসম্পূর্ণ বলার কারণে ভুল বুঝবে। অথবা বুঝতে না পারার কারণে শ্রোতার মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে।

আদব: এমন ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু চাইবে না, যার ব্যাপারে তুমি নিশ্চত যে, তার সমস্যা বা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে বারণ করতে পারবে না। যদিও তুমি সে জিনিসটি তার কাছে ধার হিসেবেই চাও না কেন? তবে হ্যাঁ, তুমি

যদি তার ব্যাপারে আস্থাবান হও যে, যদি তোমাকে ঐ জিনিস দেয়ার কারণে তার সমস্যা হয়, তাহলে নিঃসংকোচে তোমাকে দেয়া থেকে অস্বীকার করবে, অথবা না দেয়ার ব্যাপারে কোনো লৌকিকতার আশ্রয় নিবে না; বরং স্পষ্ট ভাষায় তোমাকে সেটা দেয়া থেকে বারণ করবে। তাহলে তার কাছে কোনো কিছু চাইতে বা প্রয়োজন পেশ করতে কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক এই বিষগুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে, কাউকে কোনো কাজের নির্দেশ দিতে এবং কারো সুপারিস করার ক্ষেত্রে, বর্তমানে লোকজন বিষয়গুলো খুব সাধারণভাবে নেয়।

আদব: যদি কারো বাড়িতে কোনো প্রয়োজনে যাও এবং বাড়িওলাকে কোনো প্রয়োজনের কথা বলতে হয়, উদাহরণস্বরূপ কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির কাছ থেকে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু চাইবে, তাহলে তোমার প্রয়োজনের কথা এমন এক সময় বলো যাতে সে তোমার প্রয়োজন পুরা করার জন্য কিছু সময় পায়।

কতক লোক এমন আছে, তারা বিদায় নেয়ার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে, এর দ্বারা যার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে, তার মাঝে এক ধনের সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয় এবং অস্থিরতা কাজ করে। কারণ তখন অল্প সময়, মেহমান বিদায় হওয়ার জন্যও প্রস্তুতি নিয়েছে, হতে পারে এত অল্প সময়ের মাঝে তার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হবে না। অথবা সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলো, তখন অসময়ে তুমি প্রয়োজন ব্যক্ত করার কারণে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে, এমন কোনো কাজ করবে না যার দ্বারা অন্যের মাঝে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়, আর শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা বৈধও নয়।

কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে খুব লক্ষ্য রাখবে, যে জিনিসটি তুমি তার কাছে চাচ্ছো সেটা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। তা না হলে তার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে, তবে এর জন্য সহজ পদ্ধিতি হলো, তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিস তাকে দিয়ে বলবে, হয়রত আপনি ব্যবহারের পর আমাকে দিয়ে দিবেন।

আদব: এক ব্যক্তি এসে আমার কাছে তাবিজের আবেদন করলো, আমি তাকে নির্দিষ্ট একটা সময় আসতে বললাম, লোকটি অন্য সময় এসে আমার কাছে আবারও তাবিজের আবেদন করে বললো, আপনি আমাকে তাবীজের জন্য আসতে বলেছিলেন আমি এখন এসেছি, কিন্তু লোকটি কখন আসতে বলেছি তা বলল না।

আমি তাকে বললাম, যখন আসতে বলেছি তখনই আসা দরকার ছিলো, অন্য সময়ে আসার কারণে কষ্ট হয়, অথবা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটে, যথাসময় না আসার কারণে এত সব ঝামেলা সৃষ্টি হলো। লোকটি এরূপ কথার কারণে নিজের আপত্তির কথা জানাল, আমি তাকে বললাম, যেরূপ তোমার ব্যস্ততা আছে, তেমনিভাবে আমার তো এখন ব্যস্ততা রয়েছে। এটা কিভাবে হতে পারে যে, সর্বদা আমি একটা কাজেই ব্যস্ত থাকব, নিজের আর কোনো কাজ নেই।

প্রয়োজন উপস্থাপনের আরো কতিপয় আদব

১. হযরত বয়ানের এক ধারাবাহিকতায় বলেন : অঞ্চলভেদে আবার কখনো ব্যাপকভাবে কিছু প্রচলন রয়েছে, সেগুলোকে কেউ খারাপ দৃষ্টিতে দেখে না, বরং সেগুলো ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে, উদাহরণস্বরূপ কোনো অপরিচিত মানুষের কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করা, ভারী বোঝা কোনো পথচারী থেকে উঠিয়ে নেয়া। স্টেশনে অপরিচিত মানুষকে অল্পসময়ের জন্য নিজের সামান দেখতে বলে নিজের প্রয়োজনে যাওয়া, গ্রামে প্রয়োজনের কারণে অনেক সময় একজন অন্যজন থেকে দুধ চেয়ে নেয়। অথবা গরমের সময় আঁখ যেখানে মাড়াই করা হয়, যেখান থেকে আঁখের রস পান করা ইত্যাদি। যে এলাকায় বা অঞ্চলে এগুলো চাওয়ার প্রচলন রয়েছে, সে এলাকায় এগুলোর সুওয়াল করা জায়েয আছে।[২৪৫]

২. যার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন আছে, অথবা যে ব্যক্তির সাথে আমার ব্যক্তিগত কোনো কাজের সংশ্লিষ্টতা থাকে, আর সে ব্যক্তি যদি কোনো প্রয়োজনে আমার কাছে আসে অথবা ঘটনাক্রমে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তাহলে আমি তাকে আমার কাজের ব্যাপারে নিদে দেই না এবং ভানও ধরি না এবং তার কাছে গিয়েই আমি আমার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করি, কারণ এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এরূপ করার কারণে সে ব্যক্তি নিজের কোনো প্রয়োজনেও আমার কাছে আসবে না। আর মনে মনে ভাববে যে, আমি গেলেই তো সে আমাকে কাজের নির্দেশ প্রদান করে।[২৪৬]

---

[২৪৫] । মাজলিসে হিকমাত পৃ. ১০৬

[২৪৬] । আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়া পৃ. ৬৮

অধ্যায়-২১

খানা খাওয়ার আদবসমূহ

আদবঃ খাবারের সময় এমন কোনো কিছুর নাম নিবে না যার দ্বারা আহারকারীর বমির উদ্রেক হয়। কারণ অনেকের স্বভাব দুর্বল হয়ে থাকে। যার কারণে সে খাবার খেতে পারে না।

আদবঃ যেখানে লোকজন বসে খাবার খাচ্ছে, বা কোনো প্রয়োজনে বসে কথাবার্তা বলছে, সেখানে থুথু ফেলবে না এবং নাক পরিস্কার করবে না। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে পাসে উঠে গিয়ে নিজের প্রয়োজন সেরে নিবে।

আদবঃ খাবারের সময় যদি তরকারির প্রয়োজন হয়, তাহলে খানা খাচ্ছে এমন ব্যক্তির সামনে থেকে বাটি উঠিয়ে আনবে না, বরং অন্য কোনো বাটিতে নিয়ে আসবে।

আদবঃ দস্তারখানার উপর অনেক সময় চিনি বা লবণ রাখা থাকে। খাদেম এসে এমন জোরে বাতাস করতে থাকে যে, সেগুলো বাটি থেকে উড়ে যেতে শুরু করে। আবার অনেক সময় চামচ দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উড়ে পড়ে, সুতরং যারা খাদেম হবে তাদের এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখা দরকার এবং সতর্কতার সাথে কাজ করা জরুরি।

খানা খাওয়ার আরো কতিপয় আদব

১. খাবারের পূর্বে এবং পরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিবে, যাতে করে কোনো ধুলা বালি লেগে না থাকে এবং কুলিও করে নিবে।

২. বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবে এবং ডান হাতে খাবে।

৩. বেশি গরম খাবার খাবে না, এতে শারীরিক এবং বিশেষ করে পাকস্থলির ক্ষতি হয়।

৪. অত্যন্ত নমণীয় হয়ে খাবার খাবে, অহংকারীদের মতো চেয়ার টেবিলে বসে বা হেলান লাগিয়ে খাবার খাবে না।

৫. সকলেই এক সাথে খাবার খাবে, এতে খাবারের মাঝে বরকত হয়।

৬. সর্বদা নিজের সামনে থেকে খাবার খাবে, তবে হ্যাঁ যদি খাবারের পাত্রে বিভিন্ন রকম খাবার থাকে উদহরণস্বরূপ কয়েক ধরনের ফল বিভিন্ন স্বাদের ফল ফলাদি হয়, তাহলে তোমার চাহিদা অনুযায়ী যেটা ইচ্ছা, যেখান থেকে ইচ্ছা উঠিয়ে নিয়ে খেতে পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই।

৭. যদি খাবার কম হয় এবং লোকজন বেশি হয়, তাহলে সকলে মিলে মিশে অল্প অল্প করে খেয়ে নিবে, এমন করবে না যে, একজন পেটপুরে খেয়ে নিল আর অন্যজন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকল।

৮. খেজুর আঙ্গুর মিষ্টি প্রভৃতি জিনিস যদি কয়েকজন মিলে খায় তাহলে একটা একটা করে উঠিয়ে খাবে, দুইটা বা তার থেকে বেশি উঠনো খারাপ এবং মন্দ স্বভাব।

৯. যে সমস্ত খাবার উঠানোর জন্য সকল আঙ্গুল লাগানোর প্রয়োজন হয় না, সেগুলো খাবারের সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে উঠিয়ে খাবে এবং খাবারের পর আঙ্গুলগুলো চেটে পরিস্কার করে খাবে।

১০. যদি খাবার খাওয়ার সময় হাত থেকে ছুটে লোকমা পড়ে যায়, তাহলে সেই অংশটুকু উঠিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নিবে। পরিত্যক্ত খাবার উঠিয়ে খাওয়াকে লজ্জিত মনে করা অথবা তা খারাপ দৃষ্টিতে দেখা মারাত্মক অন্যায় এবং তাকাব্বুর, এক্ষেত্রে কখনোই তাকাব্বুর বা অহংকার করবে না, এটা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, এ মহা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা সকলকে দান করেন না।

১১. তোমার খাবারের চাহিদা না থাকার পরও যদি তোমার সাথীর সাথে খাবার খেতে বসো, তাহলে সে খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অল্প অল্প করে খাবার খেতে থাকবে, যাতে করে তোমার উঠে যাওয়ার কারণে সে ক্ষুধার্তই থেকে না যায়। যদি একান্ত প্রয়োজনে তোমাকে উঠে যেতেই হয় তাহলে তার কাছে তোমার আপত্তির কথা জানিয়ে উঠে যাবে।

১২. যদি পাত্রের খাবার শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাত্র ভালোভাবে পরিস্কার করে খাবে, কারণ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ঐ খাবারে বরকত রয়েছে।

১৩. খাবার থেকে ফারেগ হয়ে প্রথমে দস্তারখানা উঠিয়ে নিবে, এরপর নিজে উঠবে, দস্তারখানা রেখে নিজে উঠে যাওয়া খাবারের আদব পরিপন্থী কাজ।

১৪. যদি তরকারি বা খাবারের কোনো জিনিসে মাছি পড়ে, তাহলে তার অপর ডানাকে খাবারের মাঝে ডুবিয়ে দিবে, এরপর যদি মন চায় তাহলে খেয়ে নিবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ মাছির এক ডানাতে অসুস্থতা রয়েছে আর অন্য ডানাতে রয়েছে সুস্থতা। যখন কোনো খাবার বা এ জাতীয় জিনিসের উপর তার অসুস্থতার ডানা ডুবে দেয়, পরবর্তীতে অন্য ডানা ডুবিয়ে দেয়ার কারণে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

১৫. স্বর্ণ চাদির পাত্রে খাবার খাওয়া হারাম।

১৬. খাবারের জিনিসপত্র কারো নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, খুব ভালোভাবে ঢেকে নিয়ে যাবে, যাতে করে তাতে কোনো ধুলা বালি না পড়ে।

১৭. পানীয় জিনিসপত্র খাবার শুরু করার সময় পড়বে বিসমিল্লাহ, আর শেষ করে বলবে আলহামদুলিল্লাহ।

১৮. খাবার শেষ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, এমনিভাবে পানি পান করার পরেও। কারণ এগুলো হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য নিয়ামত।

১৯. কোনো কারণ ছাড়াই অযথা বাম হাতে বা দাঁড়িয়ে খাবার খাবে না।

২০. এক নিঃশ্বাসে পানি পান করবে না, নিঃশ্বাস নেয়ার সময় গ্লাস মুখ থেকে সরিয়ে নিবে।

২১. যেই গ্লাসের একদিক ফাটা সেই দিকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে না, বরং অন্য দিকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে, অন্যথায় মুখে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২২. পানি পান করার পর যদি অন্যকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে দিবে, যে তোমার ডান পাশে আছে। অতঃপর সে পানি পান করা শেষ করলে তার ডান পাশের জনকে দিবে, এভাবে সকলেই পানি পান করবে।

২৩. মসক বা কলসে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে না। এমনিভাবে যে পাত্র থেকে একবার অনেক পানি চলে আসার সম্ভাবনা আছে তাতেও মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে, এজন্য যে একেবারে পানি এসে তোমার শরীর ও কাপড় ভিজে যাবে।

যেই পাত্রের মুখ খোলা থাকে সেই পাত্রেও মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে না। কারণ সম্ভাবনা আছে, যেকোনো বিষাক্ত পোকা মাকড় বা বিষাক্ত সাপ পাত্রের মুখ খোলা পেয়ে তাতে ঢুকে গেছে।

২৪. খানা খাওয়ার সময় গোস্তের হাড্ডি, মাছের কাঁটা ও তরকারির বর্ধিত অংশ এক জায়গায় ফেলবে, এদিক– সেদিক ও একাধিক জায়গায় ফেলবে না, এরপর সুযোগ মতো তা ময়লা ফেলার নির্ধারিত জায়গায় ফেলে দিবে।[২৪৭]

২৫. যদি কেউ লবণ বা খাবারের কোনো কিছু চায়, তাহলে কোনো পাত্রতে এনে দিবে, হাতে করে দিবে না। কারণ এতে অনেকের ঘৃণার উদ্রেক হয়।[২৪৮]

২৬. খাবারের জিনিসপাত্র সর্বদা ঢেকে রাখবে, যদিও দস্তারখানে খাবারের জিনিসপাত্র দেয়া হোক না কেন? তবে হ্যাঁ যদি তাৎক্ষণিক খাবারের জন্য আসে তাহলে ভিন্ন কথা।

---

[২৪৭]। বয়ানাত খ. ১০. পৃ. ৪

[২৪৮]। বয়ানাত খ . ১০ পৃ. ৫

অধ্যায়-২২

ইস্তিঞ্জার আদবসমূহ

আদবঃ ইস্তিঞ্জার জন্য প্রস্রাবখানায় গিয়ে দেখতে পেলাম এক তালিবে ইলম তার হাজত সারছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে তার হাজত থেকে ফারিগ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন অনেক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন সামনে গিয়ে দেখি সে কুলুক নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বুঝানোর জন্য বললাম কুলুক নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কি প্রয়োজন ছিলো? এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় কুলুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে, তাহলে আর একজন তার প্রয়োজন সারতে পারত।

কারণ অনেকে হয়তোবা জায়গা খালি হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অথচ তুমি কুলুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে সে সংকোচবোধ করছে, এজন্য যে, একজন থাকা অবস্থায় আরেকজন আসতে ইতস্তত বোধ করে। সামনে থেকে আর কখনো এমন করবে না।

আদবঃ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে মানুষ চলাচলের রাস্তায় ইস্তিঞ্জা করার পদ্ধতি এবং কুলুক ব্যবহারের নিয়ম শিখাচ্ছে। তাকে সর্তক করে বললাম, যতদূর সম্ভব লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে ইস্তিঞ্জা করার নিয়ম কানুন শিক্ষা দাও।

ইস্তিঞ্জার আরো কতিপয় আদব

১.যদি কখনো মাঠে-ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে লোকালয় থেকে দূরে, মানুষের চক্ষুর আড়ালে চলে যাবে। যাতে করে জনসাধারণ দেখতে না পায় এবং বসার সময় জমিনের কাছাকাছি গিয়ে সতর খুলবে।

২.প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন জায়গায় বসবে, যার পিছনে আড়াল রয়েছে। যদি কোন কিছুর আড়াল না থাকে তাহলে কমপক্ষে বালুর স্তুপ করে নিবে।

৩.মানুষ চলাচলের রাস্তায় অথবা গাছের ছায়ার নিচে বাত কার্য সম্পাদন করবে না।

৪.বর্জ্য ত্যাগ করার সময় চুপ থাকবে, কোনো কথাবার্তা বলবে না।

৫. কোনো ছিদ্রে বা গর্তে প্রস্রাব করবে না, কারণ সেটাতে যদি কোনো বিষাক্ত পোকামাকড় থাকে, তাহলে তা তোমাকে দংশন করবে।

৬. যেই পানি প্রবাহমান নয় সেটা যত বেশিই হোক না কেন তাতে প্রস্রাব করবে না।

৭. কোনো সমস্যা ছাড়া অযথা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না।

৮. এমন জায়গায় প্রস্রাব করবে যেখান থেকে প্রস্রাবের ছিটা উড়ে এসে শরীরে বা কাপড়ে না লাগে এবং এক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে অধিকাংশ মানুষের কবরের আজাব হয় প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে।

৯. গোসলখানায় কখনোই প্রস্রাব করবে না। পায়খানা করা তো আরও মারাত্মক।

১০.প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় মুখ বা পিঠ কিবলার দিকে করবে না। এমনিভাবে চন্দ্র, সূর্য বা প্রবল বায়ুর দিকেও মুখ করবে না।

১১.পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশের সময় এই দোয়া পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

এবং বের হয়ে পড়বে-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَذْهَبَ عَنِّىْ الأَذَى وَعَافَنِىْ

১২. পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা রাখবে, আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখেবে।

১৩. আংটি বা তাবীজ যেগুলোতে আল্লাহ বা আল্লাহর রাসূলের নাম লেখা আছে, পায়খানাতে প্রবেশের পূর্বেই সেগুলো খুলে ফেলবে।

১৪. ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না।

১৫. সর্বনিম্ন তিনটি ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে। ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পর পানি দিয়েও ইস্তিঞ্জা করে নিবে।

১৬. ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত পানি পায়খানার পা-দানির উপর ফেলবে না। বরং ব্যবহৃত পানি ফেলার জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করে নিবে।

১৭. হাড্ডি, কয়লা বা নাপাক কোন জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না।

১৮. পুরুষেরা পায়খানায় পানি নিয়ে যাবে না, বরং ঢিলা নিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য জায়গায় গিয়ে শৌচকার্য সম্পাদন করবে।

১৯. পায়খানায় বাতি নিয়ে প্রবেশ করলে খুব সতর্ক থাকবে, যাতে করে শরীরে বা কাপড়ে লেগে না যায়। অনেকের ব্যাপারে শোনা গেছে যে, তারা আগুন লেগে মারা গেছে। আর যদি বাতি কেরোসিন তেলের হয়, তাহলে তো আরও মারাত্মক।

২০. খাজা আজিজুল হাসান সাহেব রহ. বলেন, ইস্তিঞ্জার ব্যাপারে আমার বড় ধরনের সন্দেহ হয়, আর তা থেকে পরিপূর্ণ পরিস্কার হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এরপর একটু ঘষা দিলে আবার কিছু না কিছু বেরিয়ে আসে। এরপর হযরত বলেন, তোমরা কখনোই এরূপ করবে না। সাধারণভাবে ইস্তিঞ্জা করে তারপর ধুয়ে ফেলবে, কারণ "আওরিফুল মাআরিফ" নামক কিতাবে লেখেন ইস্তিঞ্জার জায়গার অবস্থা হলো পশুর ওলানের মতো, যতক্ষণ তুমি ঘষতে থাকবে ততক্ষণ তা থেকে কিছু না কিছু বের হতেই থাকবে। আর যদি এমনিই ছেড়ে দাও তাহলে তা থেকে কিছুই বের হবে না।[২৪৯]

২১. এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে হযরতকে বললেন, হযরত আমরা ঢিলা দ্বারা যখন ইস্তিঞ্জা করি, তখন প্রস্রাবের দু-এক ফোঁটা লাগার সাথে সাথেই তো কুলুখটি নাপাক হয়ে হয়ে যায়, এরপর তো নাপাক কুলুখ দ্বারা ইস্তিঞ্জা হয়। অথচ ফুকাহায়ে কেরামগণের নাপাক কুলুখ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

উত্তরে হযরত বললেন, নাপাক ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা নিষেধ হওয়ার অর্থ হলো একবার যে ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয়েছে অর্থাৎ একবার ব্যবহার করার পর দ্বিতীয়বার ঐ ঢিলার মাঝে নাপাকি পরিস্কার করার যোগ্যতা বাকি থাকে না।

তবে অব্যবহৃত ঢিলা যখন প্রথমবার ব্যবহার করা হবে, তখন পূর্ণ নাপাকি পরিস্কার করার পূর্ব পর্যন্ত তার মাঝে পরিস্কার করার যোগ্যতা অব্যাহত থাকে। দু-এক ফোঁটা প্রস্রাব লেগে যাওয়ার দ্বারা তার পরিস্কার করার যোগ্যতার মাঝে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। তবে হ্যাঁ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার সময় তার মাঝে সে যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।[২৫০]

২২. আমি নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যার কারণে ইস্তিঞ্জার ঢিলা ব্যবহার করার সময়ও যেটা বড় সেটা প্রথমে ব্যবহার করি। এরপর ছোটটা, এরপর সর্বশেষ সবচেয়ে ছোটটা।[২৫১]

---

[২৪৯]। কামালাতে আশরাফিয়া খ. ১পৃ.৪৩
[২৫০]। মারাকাত পৃ.১৭২
[২৫১]। আনফাসে ঈসা খ.২ পৃ ৫৭২

২৩. শরীয়তই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যা উম্মতের জন্য ছোট থেকে ছোট কোন কাজ কিভাবে সম্পাদন করতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। আর ফুকাহায়ে কেরামগণ তা বুঝে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি শীতের মৌসুমেও ইস্তিঞ্জা করার সময় ঢিলা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর গরমের মৌসুমে ঢিলা ব্যবহারের কি পদ্ধতি হবে তাও শিক্ষা দিয়েছেন।

২৪. ফুকাহায়ে কেরামগণ লিখেন ঢিলা দ্বারা পুরুষের জন্য পায়খানার স্থান পরিস্কার করার পদ্ধতি হলো গরমের মৌসুমে অর্থাৎ যে সময় অন্ডকোষ ঝুলে থাকে তখন প্রথম ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনে নিয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় ঢিলা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে আনবে। এমনিভাবে তৃতীয় ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনে নিয়ে যাবে। আর শীতের মৌসুম অর্থাৎ যেই সময় অন্ডকোষ সংকোচিত হয়ে থাকে তখন প্রথম ঢিলা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে, আর দ্বিতীয় ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, আর তৃতীয় ঢিলা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

আর নারীরা সর্বদা প্রথম ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, দ্বিতীয় ঢিলা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে, আর তৃতীয় ঢিলা দ্বিতীয় ঢিলার বিপরীত অর্থাৎ সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ অন্যথায় তাদের লজ্জাস্থানে লেগে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[২৫২]

ஐ ઉஐ ঙ

---

[২৫২]। নূরুল ইয়াহ

অধ্যায়-২৩

ছাত্রদের পালনীয় আদবসমূহ

আদব: কোনো এক তালিবে ইলম আমার কাছে এসে কোনো এক নারীর জন্য প্রসব-বেদনার তাবীজ চাইল। আমি তাকে বললাম, তালিবে ইলমের জন্য উচিৎ নয় যে, সে দুনিয়াবী কোন কাজে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যদি কেউ এরকম কাজের নির্দেশ করে তাহলে তাকে বিনম্র ভাষায় আপত্তি জানিয়ে বলবে, ভাই এটা আদব পরিপন্থী।

আদব: এক তালিবে ইলম মাদরাসা থেকে কাগজ চেয়ে একটি দরখাস্ত লিখে আরেক তালিবে ইলমের হাতে পাঠিয়ে দিলো। দরখাস্তকারীকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন তুমি অন্যের হাতে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলে? উত্তরে সে বলল, আমার অন্য কোনো কাজের ব্যস্ততা থাকায় আমি তার হাতে পাঠিয়েছি। এর পর তাকে বুঝিয়ে বলা হলো, ভাই তুমি সর্বদা এখানে অবস্থান করো। সাধারণ কোনো একটা কাজের জন্য তুমি তোমার প্রয়োজনের কাজটা অন্যের হাতে করে নিচ্ছ এটাতে বড় ধরনের অভদ্রতার পরিচায়ক। তবে হ্যাঁ, যদি লজ্জা শরমের কারণে তার হাতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে এটা একটা গ্রহণযোগ্য কারণ হতো। তুমি তোমার প্রয়োজনের কাজটা অন্যের মাধ্যেমে সম্পাদন করানোর কারণে মারাত্মক অন্যায় করেছে। এর দ্বারা তুমি যার কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছ তাকে তোমার সমপর্যায়ের মনে করেছ, যা নিতান্তই মন্দ। তাই আগামী থেকে এই বিষয়গুলোর প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর দ্বিতীয় তো এর দ্বারা তুমি নিজের মাঝে খেদমত গ্রহণ করার স্বভাব সৃষ্টি করেছ এবং মনিবের স্বভাব তোমার মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এর শাস্তি হলো আগামী আরও চারদিন তোমার দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। চার দিন পরে নিজ হাতে দরখাস্ত নিয়ে আসবে, তখন তোমার দরখাস্তের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। অবশেষে চারদিন পরে সে আবারও দরখাস্ত নিয়ে আসলো এবং আনন্দচিত্তে তার দরখাস্ত গ্রহণ করা হলো।

আদব: এক তালিবে ইলম অন্য আরেকজনের মাধ্যমে আমার কাছে একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করল আর সে নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপে চুপে তা শুনতে থাকল। ঘটনাক্রমে আমি তা দেখে ফেললাম। আমি তাকে ডেকে ধমক দিয়ে

বললাম, চোরের মত গোপনে দাঁড়িয়ে অন্যের কথা এভাবে শোনার অর্থ কী? কেউ কি তোমাকে এখানে আসতে বারণ করেছে? আর যদি সরাসরি তা জানতে লজ্জাবোধ করো তাহলে যাকে পাঠিয়েছ তার কাছ থেকে পরে জেনে নিতে। গোপনে কারও কথা শ্রবণ করা মারাত্মক অপরাধ, গুনাহের কাজ। কারণ এমনও হতে পারে যে, বক্তা এমন কোনো কথা বলার ইচ্ছা করেছে যে ব্যাপারে তুমি অবগত না হও। কিন্তু তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় সে অবগত না হওয়ার কারণে তা বলে ফেলল।

আদব: এক তালিবে ইলম বাজারে যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য এসে আমার ব্যস্ততা দেখে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল। তাই তাকে ডেকে বললাম, তোমার দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমার কষ্ট হচ্ছে। যখন তুমি আমাকে ব্যস্ত দেখেছ তখন তোমার উচিৎ ছিলো পাশেই এক স্থানে বসে যাওয়া। এরপর আমি যখন ফারিগ হই তখন তোমার প্রয়োজনের কথা বলা।

আদব: মাদরাসার কোন একটি কিতাব আমার প্রয়োজন হলো, যেটা আমার এক বন্ধুর কাছে আমানত ছিলো। সে ঐ সময় উপস্থিত ছিলো না। আমি খাদেমকে দিয়ে তার কামরায় খোজ করালাম। না পাওয়ায় আমি নিজেই খোঁজার জন্য গেলাম, তাও পেলাম না।

হঠাৎ কারও নজর এক ছাত্রের উপর পড়ল, যে ওখানেই বসে কোনো কিতাবের তাকরার করছিলো। আর সে মাদরাসার ঐ কিতাবটি তার কিতাবের নিচে হেলান লাগিয়ে রেখেছিলো যার কারণে সেটা দেখা যাচ্ছিল না। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন পাওয়া গেল। পাওয়ার পর ঐ ছাত্রকে ধমক দিয়ে বললাম, অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করা তো এমনিতেই নাজায়েয। এরপর তুমি সেটাকে তোমার কিতাবের নিচে রেখেছ। যার কারণে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খোঁজাখোজি করে এতগুলো মানুষ অস্থির হয়ে পড়েছে। খুব খেয়াল রাখবে, সামনে থেকে আর কখনো এরূপ করবে না।

আদব: এক তালিবে ইলম, উদাহরণস্বরূপ যায়েদ অন্য আরেকজন তালিবে ইলম যথা উমরের সাথে আসরের পর মাঠে ঘোরাফিরা করার জন্য আমার কাছে অনুমতি নিতে আসলো। তবে ঐ তালিবে ইলম অর্থাৎ উমরের সাথে বকর নামে কম বয়সী আরেক জন তলিবে ইলম উস্তাদের অনুমতি সাপেক্ষে পূর্ব থেকেই ঘোরাফিরা করার জন্য বাইরে যেত, আর যায়েদের সাথে বকরের চলাফেরা মেলামেশা করা আমাদের কাছে অনুপযুক্ত ছিলো। এজন্য যায়েদের অনুমতি গ্রহণ করার সময় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন ছিলো, যাতে জেনে বুঝে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেত। কিন্তু যায়েদ তা না করে শুধু বাইরে যাওয়ার

অনুমতি প্রার্থনা করল আর অবস্থার বাকি অংশ ইচ্ছায় অথবা অসতর্কতা বশত গোপন করল। যদি আমার বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ না হতো, তাহলে অনুমতি চাওয়ার অবস্থা দেখে আমি তাকে অনুমতি প্রদান করতাম আর এর কারণে বড় ধরনের একটি ধোকার সম্মুখীন হতাম। ঘটনাক্রমে বিষয়টি আমার মনে পড়ল, যার কারণে আমি যায়েদকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমরের সাথে অন্য কেউ বিকেলে ঘোরাফিরা করার জন্য বাইরে যায় কি না?

উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ তার সাথে বকর যায়। এরপর আমি তাকে বললাম, এ কথা তুমি কেন আমার কাছে গোপন করলে? তার এই অপরাধের কারণে আমি তাকে ধমকালাম এবং পরবর্তীতে তাকে বুঝিয়ে বললাম, এসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকো। তুমি যাকে বড় মনে করো অথবা নিজের জন্য কল্যাণকামী মনে করো তার কাছে কোনো ধরনের ছলচাতুরি, মিথ্যা বা ধোকার আশ্রয় গ্রহণ করবে না।

আদব: একজন ছাত্রকে মাদরাসার এক খাদেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে এখন কি করছে? তালিবে ইলম তাৎক্ষণিক উত্তর দিলো সে এখন শুয়ে আছে। পরে জানতে পারলাম সে নিজ কামরায় জাগ্রত আছে। তারপর ছাত্রকে বললাম, প্রথমত, তুমি একটি ধারণাপ্রসূত বিষয়কে সুনিশ্চিত মনে করে সংবাদ দিয়ে একপ্রকার ভুল করেছ। যদি কোনো বিষয় সুনিশ্চিতভাবে জানা না থাকে, তাহলে সম্বোধনকারীকে ধারণাপ্রসূত হয়েই উত্তর দেয়া অর্থাৎ এভাবে বলবে যে, সম্ভাবত শুয়ে আছে।

আর একথা বলার সময় গলার স্বরটা ও নিম্নগামী করবে। যাতে করে তোমার কথা বলার অবস্থাতেই বুঝে আসে যে, এ ব্যাপারে তোমার সুনিশ্চিতভাবে জানা নেই। বস্তুত তার চেয়ে ভাল এভাবে বলে দেয়া যে, আমার জানা নেই, আমি দেখে জানাচ্ছি। এরপর দেখে সেই বিষয়ে সংবাদ দিবে।

দ্বিতীয়ত এর মাঝে আরেকটি খারাপ দিক হলো যদি পরবর্তীতে আমি তার জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি জানতে না পারতাম এবং এই খেয়ালেই থাকতাম, যে সে শুয়ে আছে, তাহলে অনর্থক আমার দীর্ঘ একটা সময় নষ্ট হতো। আর এমন ব্যক্তিকে বিশেষ প্রয়োজনেও ঘুম থেকে জাগ্রত করা এটা তার উপর একধরনের জুলুম করা। অথচ তার অতিব প্রয়োজন আবার সে জেগেও আছে, আর তার কারণে আবার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আমার অন্য দিকে মনের মাঝে একধরনের অস্থিরতারও সৃষ্টি হয়।

আর যে অবাস্তব এই সংবাদ দিয়েছে তার উপর একধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই জন্য উচিত হলো যদি কেউ কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে

ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকলে বলবে। আর জানা না থাকলে বলে দিবে আমার জানা নেই। অথবা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তারপর বলবে।

আদবঃ কথা-বার্তা বলার সময় বক্তা যে দলিলের মাধ্যমে কোনো বিষয় খণ্ডন করছে, অথবা কোনো দাবির বিপরীত প্রমাণ পেশ করছে, সে বিষয়কে তোমার কোনোরূপ কথা বা প্রশ্ন থাকলে তা বলতে সমস্যা নেই। তবে হুবহু সেই দাবি এবং দলিলের পুনরাবৃত্তি করা মুখাতিব বা সম্বোধনকারীকে কষ্ট দেয় এবং তাদের বিরক্তির সৃষ্টি করে। এরূপ কখনোই করবে না। এই ছোট ছোট বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরি।

আদবঃ যদি কোনো বড় ব্যক্তি তোমাকে কোনো কাজের নিদের্শ করে, তাহলে তা সম্পাদন করার পর অবশ্যই তাকে অবহিত করবে, কারণ অনেক সময় সে কাজ হলো কি না তা জানার অপেক্ষায় থাকে।

আদবঃ যদি কেউ তোমাকে কোনো কিছু বলে তাহলে তার কথা খুব গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করবে। যদি কোনো কথা বুঝে না আসে তাহলে তাৎক্ষণিক দ্বিতীয়বার বিষয়টি বক্তার কাছ থেকে বুঝে নিবে। না বুঝে শুধু অনুমানের উপর কোনো কাজ করবে না। অনেক সময় ভুল বুঝে কাজ করার দ্বারা যে ব্যক্তি কাজের নির্দেশ দিয়েছে তার কষ্ট হয়।

আদবঃ যখন তুমি কোনো বড় ব্যক্তির সাথে থাকবে তখন তার অনুমতি ছাড়া নিজ থেকে কোনো কাজ করবে না।

আদবঃ কোনো এক তালিবে ইলমের একজন মেহমান আসলো, যে এর পূর্বে আরো একবার এসেছিলো এবং সে সময় সে অন্য কোনো জায়গায় অবস্থান করেছিলো। তবে তার ইচ্ছার কথা কাউকে জানাল না যে, সে এবার এখানে অবস্থান করবে, এজন্য তার জন্য খানাও পাঠানো হলো না। পরবর্তীতে যখন তাকে দেখা গেল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে তার জন্য খাবার চাইল তখন তাকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, এরকম সময়ে নিজের অবস্থার কথা পূর্বেই প্রকাশ করে দেয়া উচিত। কারণ তুমি বলা ছাড়া তো এটা জানা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তো তুমি এর পূর্বে অন্য জায়গায় অবস্থান করেছ।

ছাত্রদের পালনীয় আরো কতিপয় আদব

১. এক তালিবে ইলম তার কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য অল্প সময়ের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত লিখল। হযরত তাকে বললেন, অল্প সময়ের ছুটির জন্য দরখাস্ত লেখার কী প্রয়োজন ছিলো, মৌখিক ছুটি গ্রহণ করতে পারতে আর

যে সময় তুমি দরখাস্ত লিখতে ব্যয় করেছ সে সময় কিতাব মুতালা'আ করতে পারতে এবং ছবক পড়তে পারতে। এর দ্বারা তুমি নিজে উপকৃত হতে। আর যদি সেই আত্মীয় এসে তোমার সাথে সাক্ষাত করতো তাহলে এটা আরো বেশি ভালো হতো।[২৫৩]

২. একজন তালিবে ইলম কোনো কিছু নিয়ে এসে দেখতে পেল যে, হযরত চিঠি বা কোনো কিছু লিখছে। হযরতের ফারিগ হওয়ার অপেক্ষায় সে ঐ জিনিসটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। হযরত কিছুক্ষণ পর ঐ তালিবে ইলমকে বললেন, ঐ জিনিসটি সামনে রেখে দিতে সমস্যা কি? আমার হাতে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছো কেন? এটা তো মহিলাদের অভ্যাস, তাদের কাছে যদি বদনাও চাওয়া হয়, তাহলেও সেটা হাতে এনে দিবে।

এমনিভাবে জনৈক ব্যক্তি আছরের পর হযরতের কাছে এসে একটি চিঠি তার হাতে দিতে চাইলে, হযরত তাকে সতর্ক করে বললেন, যখন সামনে রাখার সুযোগ আছে তাহলে হাতে দেয়ার প্রয়োজন কি। এটা কি ফরজ নাকি?[২৫৪]

৩. এক তালিবে ইলম নামাযের ইকামত খুব উচ্চ আওয়াজে বলছিলো। হযরত তাকে সতর্ক করে বললেন, ইকামত এত উচ্চ আওয়াজে বলার কি প্রয়োজন। ইকামত তো শুধু মসজিদওয়ালাদের জন্য যা এতটুকু আওয়াজে বলাই যথেষ্ট যার দ্বারা মসজিদের মুসল্লিগণ শুনতে পায়। আর আযান মহল্লাওয়ালাদের জন্য। এজন্য আযান উচ্চ আওয়াজে বলতে হয় যাতে করে সকলেই শুনতে পায়।

এরপর নামায থেকে ফারেগ হয়ে দ্বিতীবার তাকে বুঝিয়ে বললেন, শরীয়তকে ভালোভাবে বুঝো। আযান মহল্লাবাসীদের জন্য আর ইকামত শুধু মসজিদের মুসল্লিগণের জন্য। তুমি এত উচ্চ আওয়াজে ইকামত বলছিলে যে, আমার কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেলো। তাহলে ইকামত কেন বললে আযানই বলতে।[২৫৫]

৪. জনৈক তালিবে ইলম ইশার জামাতে হযরতের পিছনে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতেহা পড়ছিলো। হযরত তার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জামাতের সাথে নামায পড়া অবস্থায় তুমি নিজে নিজে সূরা ফাতিহা পড়ছিলে কেন? উত্তরে তালিবে ইলম খুব নিচু

---

[২৫৩] । হুসনুল আজিজ পৃ. ২৩৩

[২৫৪] । হুসনুল আজিজ খ পৃ. ১৪০

[২৫৫] । হুসনুল আজিজ ২৫৬

স্বরে বলল, আমি যে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায আদায় করছিলাম এ কথা আমার স্বরণ ছিলো না। হযরত তাকে বললেন, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছি, ডানে বামে এত বড় জামাত, এরপরেও তুমি একা একা মনে করে নামায আদায় করছো! নামাযের মাঝে এরকম গাফিলতি। যার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হলো যে, সে পায়ের নিচে দিয়ে হাত বের করে কান ধরে কিছু সময় হাঁটতে থাকবে। এরপর তাকে বলা হলো, নামাযের মাঝে এরূপ গাফিলতি যে, এই খবরও নেই ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায আদায় করছো, না কি একাকী নামায আদায় করছো। আর এই মাসআলার প্রতি খেয়াল করা তো পরের কথা যে, ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়া জায়েয নাকি নাজায়েয। তুমি তো গাফিলতির সীমা ছাড়িয়ে গেছ।[২৫৬]

৫. উস্তাদ যে তারতীব বা নিয়মে পড়েন এবং যেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন হুবহু তার অনুসরণ করা চাই। উস্তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। দৃষ্টি থাকবে কিতাবের উপর, আর মনোযোগ থাকবে উস্তাদের কথার দিকে, ধ্যান – খেয়াল থাকবে সর্বদা উস্তাদের কথার দিকে।[২৫৭]

৬. অনেক তালিবে ইলম উস্তাদের কথার উপর পুনরাবৃত্তি করে প্রশ্ন করে থাকে যে, বিষয়টি এরকম? এরপর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়, অথচ এভাবে উস্তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। যেই প্রশ্ন করা দরকার সরসরি সেই প্রশ্ন করবে।[২৫৮]

৭. এক তালিবে ইলম, যে পানিপথ শহর থেকে খানকায় এসেছিলো কুরআন শিক্ষার জন্য, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি তোমার উস্তাদের অনুমতিক্রমে এখানে কুরআন শিক্ষার জন্য এসেছ, নাকি অনুমতি ছাড়াই তাকে অসন্তুষ্ট করে এসেছ? উত্তরে ঐ তালিবে ইলম বলল, আমি এখানে এসেছি আমার উস্তাদের অনুমতি সাপেক্ষে। তাকে বলা হলো তুমি কি তার ইজাজতনামা নিয়ে আসতে পারবে? উত্তরে তালিবে ইলম বলল, হ্যাঁ আমি আমার উস্তাদের ইজাজতনামা আনতে পারব।

তখন ঐ তালিবে ইলমকে বলা হলো, ভালো কথা। তাহলে তুমি যে এখানে এসেছ এটা তোমার উস্তাদের অনুমতিক্রমে এর একটি ইজাজতনামা নিয়ে আসো। এরপর হযরত বললেন, উস্তাদের ইজাজতনামা এজন্য চাওয়া হয়েছে

---

[২৫৬] । হুসনুল আজিজ পৃ. ১৩৯

[২৫৭] । হুসনুল আজিজ খ ১ .পৃ. ৪৫

[২৫৮] । হুসনুল আজিজ পৃ. ২৪৫

যে, যাতে করে তুমি তোমার কাছে ইচ্ছা স্বাধীন না হও, বরং যে কাজেই করবে
তা তোমার মুরব্বি, বড়দের ও উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে করবে। এতে
উস্তাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিজের অন্তরে সৃষ্টি হবে।[২৫৯]

৮. তালিবে ইলম সবর্দা উস্তাদের অনুসারী অনুগামী হবে, অর্থাৎ তালিবে
ইলমের নিজস্ব কোনো রায় নেই এবং তার কোনো স্বাধীনতাও নেই ; বরং তার
চলাফেরা উঠা বসা আচার আচরণ সবকিছু তার উস্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী
হবে।[২৬০]

৯. এক তালিবে ইলম, যে অন্যের কাছে ঋণী ছিলো, বিষয়টি অবহিত হওয়ার
পর তাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য কঠোরভাবে তাকিদ দেয়া হলো। অমুকের
কাছে যে ঋণগ্রস্ত ছিলাম তা আল্লাহর অনুগ্রহে পরিশোধ করেছি। পরবর্তীতে
খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে, সে কেবল দুই টাকা পরিশোধ করেছে আরো
দুই টাকা ঋণ তার উপর রয়ে গেছে। এই ডাহা মিথ্যার উপর অবহিত হওয়ার
পর হযরত তাকে বললেন, যাও এখান থেকে চলে যাও। এখানে মিথ্যুকদের
কোনো কাজ নেই।[২৬১]

১০. এক ছোট বাচ্চা সে আমাকে হাত পাখা দ্বারা বাতাস করছিলো। এক
মৌলভী কোথায় থেকে যেন এসে ঐ বাচ্চার কাছ থেকে পাখা নিয়ে বাতাস
করতে আরম্ভ করে দিলো, এই নিয়তে যে যাতে করে সে আমাকে অনেক জোরে
বাতাস করে। আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম, আপনি ঐ বাচ্চার কাছ থেকে
পাখা নিয়ে নিলেন কেন ? আপনি এই ধারণা করেছেন যে, তার চেয়ে আপনি
আর জোরে বাতাস করবেন ? আমি তাকে পাখা দ্বারা বাতাস করার জন্য নির্দেশ
দেই নি। বরং সে নিজে থেকেই বাতাস করছে তার আবেগের কারণে তাকে
বাতাস করা হতে বারণও করিনি। ঐ ছোট বাচ্চার হাত থেকে পাখা নিয়ে
আমার অনুমতি ব্যতিরেকে বাতাস করা শুরু করে দেয়া এটা আপনার জন্য
আদৌ উচিত হয়নি।

আর যার কাছ থেকে পাখা নেয়া হয়েছে, সে যদি দুর্বল এবং ছোট বাচ্চা হয়
তাহলে তো সেটা আরো বড় ধরনের অপরাধ। আপনি এখান থেকে চলে যান।
আপনি আপনার কাজে ব্যস্ত থাকুন, আপনার খিদমতের প্রয়োজন নেই। এরপর
হযরত বলেন, যদি তার শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলে সে এই বিষয়টিকে নিজের

---

[২৫৯]। আনসাফে ঈসা খ. ২ . পৃ . ৭১
[২৬০]। আল ইফাযাত পৃ . ৩২৬
[২৬১]। আল ইফাযাত খ ১ . পৃ . ৩০৫

সংশোধন হিসেবে ধরে নিবে আর যদি সঠিক বুঝবুদ্ধির অভাব হয় তাহলে আমাকে ভর্ৎসনা করবে।[২৬২]

১১. এক তালিবে ইলম হযরতের কাছে এসে বলল, হযরত সার্বিক দিক থেকে আমার অবস্থা শোচনীয়। মনের ভিতর বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম্য মানুষদের মতো অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। কারো সামান্য কথায় রাগ এসে যায়। এমনিভাবে অন্তরে শুধু গুনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, নেক কাজ করতে ভালো লাগে না। মনের ভিতর বিভিন্ন প্রকার খারাপ ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়।

তার কথাগুলো শ্রবণ করে হযরত বললেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো এবং ইবাদত বন্দেগী বাড়িয়ে দাও। পাশাপাশি আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে বেশি থেকে সময় অতিবাহিত করো তাহলে এই খারাপ ধ্যান-ধারণাগুলো ধীরে ধীরে অন্তর থেকে বিদায় নিবে। আর স্বরণ রাখবে মন যা চাইবে তা করা যাবে না।[২৬৩]

১২. একজন নতুন তালিবে ইলম হযরতের খিদমতে উপস্থিত হলে হযরত তাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু সে তার কথাগুলোর উত্তর দিতে পারল না। হযরত তাকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিলেন। ঐ তালিবে ইলম দ্বিতীয় দিন আবারো প্রথম দিনের মতো আসলো। হযরত তাকে আবারো সেই বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন সেদিনও সে কোনো জবাব দিতে পারল না। হযরত ঐ তালিবে ইলমের উপর রাগ হয়ে বললেন, যাও এখান থেকে উঠে যাও। কাউকে জিজ্ঞাসা করে এবং এসব বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তার পর আসবে। সে মজলিস থেকে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, হযরত এমন কাউকে পেলাম না যার কাছ থেকে বুঝে নেয়া যায়। হযরত তাকে বললেন, যাও কারো সাথে সম্পর্ক তৈরী করো, তার হাত পাও ধরো, এরপর তার কাছ থেকে শিখে আসো।[২৬৪]

১৩. এক তালিবে ইলম হযরতের চিঠিগুলো পোস্ট অফিসে আনা – নেয়ার খেদমত নিজের জিম্মায় নিয়েছিলো। একদিন ভুলবশত একটি চিঠি বিয়ারিং খামে চলে গেল। পরবর্তীতে সে অবগতি লাভ করার পর বলল, সম্ভবত পিয়ন চিঠি নিয়ে এখন রওনা দেয়নি, আমি দ্রুত পোস্ট মাস্টার বা পিয়নের কাছে গিয়ে চিঠি নিয়ে তাতে টিকিট মেরে দিব। হযরত তাকে বললেন যদি তোমাকে চিঠি

---

[২৬২]। মালফুজাত খ পৃ. ৫১
[২৬৩]। কামালাতে আশরাফিয়া খ.পৃ. ৪০
[২৬৪]। ফুয়ুজে রহমান পৃ. ২৮

দেয়, তাহলে সেটা তোমার উপর তার অনুগ্রহ। তালিবে ইলম বলল, হযরত আমার চিঠি আমি নিব এতে তার অনুগ্রহের কী আছে? আমি তো তার কোনো কিছু চুরি করছি না।

হযরত বললেন, দেখ পোস্ট অফিসের নিয়ম অনুযায়ী যখন কোনো চিঠি পোস্ট অফিসে যায় তখন তার উপর পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে একটি ডাক টিকিট মারা হয়, যার মূল্য এক টাকা। যদি পিয়ন ডাক টিকিট না মেরে আমার পরিচয়ের কারণে তোমাকে দেয় তাহলে সে তোমার উপর এক টাকার অনুগ্রহ করল, আর সরকারের এক টাকা লোকসান বা ক্ষতি হলো, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

স্মরণ রাখা দরকার, যদি কেউ তোমাকে তোমার কোনো একটি জিনিস উঠিয়ে এক বিগত পরিমাণ এগিয়ে দেয়, তাহলে তুমি এটাকেও নিজের উপর অনুগ্রহ মনে করবে। সর্বদা তার এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে। যতদূর সম্ভব কোনো অনুগ্রহ গ্রহণ করবে না, এরপরেও যদি কেউ তোমার উপর ছোট থেকে ছোট অনুগ্রহ করে, তাহলে সেটাকেও অনুগ্রহ মনে করে তার স্বীকৃতি প্রদান করবে। বর্তমানে কারো অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানকারী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কেউ অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করতে জানে না।

পূর্বোক্ত কথার অর্থ হলো যে, শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখো না; বরং জবানকে দিলের মতো করো অর্থাৎ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হিসেবে মুখ থেকে যেই কথা বের হলো সেটা যেন অন্তর থেকে বের হলো। কারণ বর্তমানে মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর সংখ্যা তো অনেক তবে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।[২৬৫]

১৪. তালিবে ইলমের মাঝে দরিদ্রতা, নিজেকে ছোট মনে করা ও অসহায়ের গুণের উপস্থিতি তার জন্য প্রশংসনীয়। এর বিপরীত ছলচাতুরী, চালাকি ও অন্যকে ধোকা দেয়া এসব গুণের উপস্থিতি হলো তার জন্য অপছন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।[২৬৬]

১৫. এক তালিবে ইলম বাড়ি থেকে খাবারের খরচের কথা বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা নেয়। তবে তার খাবারের জন্য ঐ পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় না। তার এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর হযরত তাকে বললেন, এই বিষয়ে

---

[২৬৫]। মাজালিসে হিকমাত পৃ. ২২৭

[২৬৬]। আল ইজাফাত খ ৪ .পৃ .১১৭

তোমার বাবাকে আমি অবহিত করব, কারণ এটি স্পষ্ট হারাম এবং এতে ধোকা রয়েছে।[২৬৭]

১৬. তালিবে ইলম যে কাজের জন্য মাদরাসায় এসেছে, তার বিপরীত কোনো কাজ করানো আমার কাছে মারাত্মক অপছন্দ।[২৬৮]

তালিবে ইলম যে কাজের জন্য মাদরাসায় এসেছে, সে কাজ তার কাছ থেকে আদায় করো। হযরত একবার এক তালিবে ইলমকে বললেন, তুমি যেহেতু তোমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করো না, তাই আগামীকাল থেকে আর ক্লাসে বসার প্রয়োজন নেই।[২৬৯]

১৭. যদি তুমি এলেম অর্জনের জন্য মাদরাসায় এসে থাকো তাহলে তুমি তালিবে দ্বীন হও। দ্বীনের সুরাতে দুনিয়া তলব করো না, অর্থাৎ ইলেম দ্বারা ধনসম্পাদ আর মানসম্মানের অন্বেষণকারী হয়ো না।[২৭০]

১৮. অনেকগুলো কিতাব পড়ে জ্ঞান অর্জনের নাম দ্বীন নয়। আদব আখলাক, আচার আচারণ সংশোধন করার এবং নিজের আমলসমূহ সুসজ্জিত করার নাম হলো দ্বীন। নিজের কাজ-কর্ম, চলাফেরা উঠ-বসা, লেনদেন, কথা-বার্তা, সবকিছুর সংশোধন করা চাই।[২৭১]

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল আমলের সংশোধন করা সর্বাবস্থায় ফরজ। তালিবে ইলমের জন্যও আমলের সংশোধন করা জরুরি।[২৭২]

১৯. দ্বীনের জ্ঞান জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে অর্জন করা আদৌ উচিত নয়। যে এই জ্ঞান অর্জন করবে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া চাই প্রথমে নিজের সংশোধন এরপর অন্যের সংশোধন।[২৭৩]

২০. যারা ইলম অন্বেষণকারী এবং যারা হক অন্বেষণকারী তাদের জন্য জনসাধারণের সাথে বেশি মেলামেশা হত্যাকারী বিষের মতো।[২৭৪]

২৬৭। মাকালাতে হিকমত পৃ.৪০৩
২৬৮। মাকালাতে হিকমত পৃ. ৪৯৮
২৬৯। মাকালাতে হিকমাত পৃ. ২৩০
২৭০। মাজলিছে হিকমাহ পৃ. ১৭৮
২৭১। মাজালিসুল হিকমাহ পৃ.২৫৮
২৭২। আনফাসে ঈসা খ ১. পৃ.৬৬
২৭৩। হুসনুল আজিজ খ ৪ পৃ. ২৭৩
২৭৪। মালফুজাত খ. ৩ পৃ. ১৬

২১. দুটি জিনিস তালিবে ইলেমদের জন্য মারাত্মক ভয়াবহ এবং হত্যাকারী বিষের মতো। যথা :

১. নিজের ভুল সংশোধন করার জন্য উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

২. নিজ শিক্ষকের উপর অনাস্থা এবং অপ্রয়োজনী প্রশ্ন।[২৭৫]

২২. যারা এখানে নিজের সংশোধনের জন্য অবস্থানের ইচ্ছা করে এসেছেন অথবা যে সমস্ত তালিবে ইলেমগণ মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার ইচ্ছায় এসেছেন, আমি তাদেরকে দুটি উপদেশ দিচ্ছি।

১। কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখবে না।

২। আবার কারো সাথে শত্রুতাও পোষণ করবে না।

যারা এই দুইটি কাজ করতে পারল, তারা তো কিছু অর্জন করল, আর যারা বেশি মহব্বত ভালোবাসায় পড়ে গেল তারা বঞ্চিত হলো।[২৭৬]

এই খানকায় তাদের অবস্থান করার অনুমতি আছে যারা মৃতের মতো থাকবে, অর্থাৎ যেভাবে নির্দেশ দেয়া হবে সেভাবেই চলবে, নিজের কোনো যুক্তি বা স্বাধীনতা উপস্থাপন করার জায়গা এটা নয়। আর যারা জীবিতদের মতো চলতে চায় তাদের এখানে কোনো কাজ নেই।[২৭৭]

২৩. আমি অনেক সময় মাদরাসার ছাত্রদেরকে এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণদেরকে বলে থাকি, তোমরা যদি দুটি কাজ করতে পারো, তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিব।

১. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।

২. কথা-বার্তা কম বলো এবং কিছু সময় নির্জনে আল্লাহকে স্বরণ করো।[২৭৮]

২৪. দুটি রোগ তালিবে ইলমদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

১. মাহাত্ম্য বা গৌরব অহংকার।

২. আর মনচাহি জিন্দেগি অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ।

---

[২৭৫] । আল ইজাফাত খ ৬. পৃ . ১৮৮

[২৭৬] । আল ইযাফাত খ ৪ . পৃ . ৩৪

[২৭৭] । আল ইযাফাত ৪. পৃ . ১৩২

[২৭৮] । মাজালিসূল হিকমাত পৃ. ৫৭

খুব কম তালিবে ইলমই এমন রয়েছে, যারা এই দুই ধরনের ব্যাধি থেকে মুক্ত। এ দুটি জিনিসই দ্বীনকে ধ্বংসকারী।[২৭৯]

২৫. যারা এখানে আছেন সকলেই সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তি। এই কারণে আপনাদেরকে প্রতিটি স্তরে তথা আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার– অচারণ, চলাফেরা সবকিছু দ্বীন অনুযায়ী হওয়া জরুরি, কোনোটার মাঝে যেন কমতি না থাকে। যদি কোনো একটির মাঝে কমতি এসে যায় তাহলে নিজে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, পাশাপাশি সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ সুন্দর তো ঐ ব্যক্তিকেই বলা হবে, যার হাত পা নাক, কান, চোখ সবকিছুই সুন্দর হবে। যদি সবকিছু সুন্দর হয়, কিন্তু চোখ অন্ধ তাহলে তাকে সুন্দর বলা হবে না, অথবা নাকটা কাটা তাহলে তাকে সুন্দর বলা হবে না। এমনিভাবে দ্বীন তো কেবল তাকেই বলা হবে, যে দীনের প্রতিটি শাখায় পরিপূর্ণ হবে।[২৮০]

২৬. যারা এখানে শুধু প্রথাগত তালিবে ইলম হওয়ার উদ্দেশ্যে পড়ছে, বাস্তবিক তালিবে ইলম হওয়ার ইচ্ছা নেই, যার মৌখিক বৈশিষ্ট্য এবং আবশ্যকীয় গুণ হলো নিজে সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি সমাজের কুসংস্কার বিদআত দূর করা। ঐ সমস্ত তালিবে ইলেমের নিজের সংশোধন তো দূরের কথা, আচার–আচরণেরও সংশোধন হয় না, কারণ তার তো সংশোধন হওয়ার ইচ্ছাই নেই। এজন্য যে, কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের ইচ্ছার বড় দখলদারিত্ব রয়েছে।[২৮১]

২৭. আমি যখন ছাত্রদের মাঝে আমলের কমতি দেখি, তখন মনে মনে চিন্তা করি যে, এটা শুধু ইচ্ছার কমতির কারণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল কথা হলো আমরা তো ইলম অর্জনের পিছনে সময় ব্যয় করি কিন্তু ইচ্ছা অর্জনের পিছনে তার ন্যূনতম সময়ও ব্যয় করি না। অনেক কিতাবাদি পড়ে শেষ করার পর চিন্তা করি এবং এ কথা বুঝে ফেলি, আমি তো এখন ইলম অর্জন করে ফেলেছি, এই ইলমই তো আমার জন্য যথেষ্ট; অথচ– এই ধারণাটি স্পষ্ট ভুল ।

মোটকথা কসদ বা ইচ্ছা, এত বড় জিনিস যার অনুবাদ করা হয় 'হিম্মত ' শব্দ দ্বারা। যদি কেউ কোনো কাজের হিম্মত করে তাহলে ঐ কাজ অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। কসদ বা ইচ্ছা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের মন থেকে উঠে গেছে এবং তা অর্জনের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার মোটেও খেয়াল নেই। যেমন অনুভাব করে, কিন্তু সে অনুযায়ী যে আমল করতে হয় তার ইচ্ছা বা অনুভূতি মোটেও নেই।[২৮২]

---

[২৭৯] । হুসনুল আজিজ খ ৩ . পৃ . ৪৫৮
[২৮০] । আদাবুত তাবলিগ পৃ . ৩০– ৩৪
[২৮১] । মাকতুবাত খ ৩ . পৃ . ১৪
[২৮২] । মাকতুবাত পৃ . ৩৮– ৩৯

২৮. অনেকে এমন আছে যারা মসজিদের পাখা বদনা টুপি ইত্যাদি বাড়িতে নিয়ে যায়। আর মনে মনে ধারণা করে যে, এটা তো একটা সাধারণ জিনিস, এর দ্বারা আর মসজিদের তেমন কি ক্ষতি হবে। অথচ এটা মারাত্মক অন্যায়। এই কাজ সবচেয়ে বেশি করে মাদরাসার তালিবে ইলমরা। এখন বলো এমন পড়ার দ্বারা কি লাভ হবে।[২৮৩]

মসজিদের জিনিসপত্র বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দ্বারা অন্তর থেকে দীনের ইজ্জত সম্মান চলে যায়, যা কুফুরির একটি শাখা।[২৮৪]

যখন দ্বীনী মাদরাসায় লেখাপড়া করে দ্বীনের আমল তোমাদের মাঝে নেই, তখন এরকম লেখাপড়া করার দ্বারা কি লাভ হলো। এর দ্বারা তো কেবল গোমরাহী-ই ছড়াবে, ভালো কোনো ফলাফল আসবে না।[২৮৫]

২৯. প্রতিটি তালিবে ইলমের জন্য উচিত সে সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, চাই কোনো শায়েখের কাছে বাইয়াত হোক চাই না হোক। যদি কোনো সময় গুনাহের আগ্রহ অন্তরে আসে সঙ্গে সঙ্গে আপন শায়েখকে জানাবে এবং প্রয়োজনীয় আমল করতে থাকবে।[২৮৬]

৩০. তালেবে ইলম মুরিদরা ছাত্রদের মতো লেখাপড়া অব্যাহত রাখবে। এমন যেন না হয় যে, কিতাবাদি বাদ দিয়ে খানকায় বসে গেল, ওয়াজ নসীহত শুনতে থাকল। যা বলছে তাই সঠিক এটা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ।[২৮৭]

৩১. ঐ ব্যক্তি মুরিদ বা তালিবে ইলম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যাকে ধমক দিয়ে বা কঠোরতা আরোপ করেও তার সংশোধন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে তার শায়েখের ধমক শুনতে প্রস্তুত নয়। কারণ যারা এরূপ করে তারা কখনোই সংশোধন হয় না।[২৮৮]

৩২. ছাত্ররা উস্তাদ এবং মুহতামিম সাহেবের কাছে এই পরিমাণ আবেদন জানাবে, যা পূর্ণ করা তাদের জন্য কষ্ট হয় না। কারণ সকল ছাত্রের সকল আবেদন পূর্ণ করা এবং সবকের আসবাবের ইন্তিজাম তাদের উপর ওয়াজিব নয়।[২৮৯]

---

[২৮৩] । হুসনুল আজিজ খ ৩ পৃ .৪৩৯-৪৩৩

[২৮৪] । আল ইযফাত খ ৫ পৃ. ৪৩৩

[২৮৫] । আল ইযাফাত খ ৬ . পৃ . ২১৭

[২৮৬] । হুসনুল আজিজ খ . পৃ . ৩৭৯

[২৮৭] । কামালাতে আশরাফিয়া খ. ২ .১৩৬

[২৮৮] । মাকতুবাত খ, .৩ পৃ . ৪

[২৮৯] । ইসলাহে ইনকিলাব পৃ . ২৯০

৩৩. বড় পরিতাপের বিষয়, এখন ছাত্ররা মুহতামিম সাহেবের ব্যক্তিগত বিষয়ে পর্যন্ত দখলদারিত্ব করে, এটা মূলত স্বাধীনতার ফলাফল। এখন ছাত্ররা তো স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী, তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর জনগণও এমন হয়ে গেছে যে, তারা অন্যের পিছনে পড়া বা অন্যের কাজে দখলদারিত্ব এবং অবৈধ হস্তক্ষেপ করাকে মনে করে জীবিত হওয়ার নিদর্শন। যদি কারো পিছনে না পড়ে বা অন্যের কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে তাহলে তাকে মৃত ভাবে। অর্থাৎ সে আবার কেমন জীবিত যে অন্যোর কাজে দখলদারিত্ব রাখে না। অথচ এই কাজ আর স্বভাবগুলো বড় জঘন্যতম। এ সমস্ত গর্হিত ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।[২৯০]

৩৪. আগের জামানায় ছাত্রদের মাঝে দুনিয়ার মোহ– ভালোবাসা ছিলো না। যারা দীনি মাদরাসায় ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে আসত তারা খোদাভীতি আল্লাহওয়ালা হতো। বাস্তব ও সত্য কথা তো এটাই যে, মৌলভী বা অনুসরণীয় হয়ে দ্বীন সকলের জন্য নয়। কেবল ঐ ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত যার মাঝে দুনিয়ার লোভ নেই, তবে দীনের মহব্বত আর ভালোবাসা আছে। আর যদি তা না হয় অর্থাৎ ইলম অর্জন অবস্থায় যদি দুনিয়ার অর্থ সম্পদের ভালোবাসা থাকে দীনের মহব্বত না থাকে তাহলে ঐ ইলম উল্টা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

৩৫. আমি কসম খেয়ে বলছি দুনিয়ার মোহ অর্থাৎ সম্পদ ও সম্মানের লোভ– লালসা একটা আড়াল বা পর্দা। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আশা– আকাঙ্খা কারো মাঝে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের হাকিকত তার সামনে আসবে না। একটু খেয়াল করে দেখ বনী ইসরাইলের আলেমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. এর নবী হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ইলম বা জ্ঞান রাখতো, কিন্তু দুনিয়ার লোভ–লালসার মোহ তাদের সামনে পর্দা হয়ে গেছে এবং ঈমান গ্রহণ করা হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তারা জানতো কিন্তু মানতে পারেনি। তারা যে রাসূল সা.– কে চিনত এবং তিনি যে শেষ নবী সেই জ্ঞান তাদের ছিলো। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ

অর্থ : তারা রাসূল (সা.) কে এমনভাবে চিনত জানত যেমনভাবে পিতা ছেলেকে চেনে। দেখা মাত্রই চিনে ফেলত অর্থাৎ মোটেও চিন্তা–ভাবনা করার প্রয়োজন হতো না। এমনভাবে পরিচয় পাওয়ার পরেও তারা মানতে পারেনি। এর মূল

---

[২৯০] । আর ওয়াসল ওয়াল ফসল পৃ, ২৯৬

কারণ হলো বাস্তবতা তাদের ভিতরের চোখে পর্দা এঁটে দিয়েছিলো, বাস্তবতা দেখছিলো না। বাস্তবতা না দেখার কারণে তাদের অন্তরের মাঝে রাসূলের মহব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি। যার কারণে ঈমান গ্রহণ করতে পারেনি।

যারা কুরআন হাদিস পড়ছে, আবার অর্থ সম্পদের লোভ লালসা রাখছে । মোটকথা, দুনিয়ার অর্থ সম্পদ ইজ্জত সম্মানের লোভ লালসা আহলে ইলমদের পরিপন্থী।[২৯১]

৩৬. কোনো এক তালিবে ইলমকে তার অপকর্মের কারণে পাকড়াও করে হযরত বললেন, তুমি তো এ কথা মেনে নিয়েই মাদরাসায় এসেছ যে, কোনো গুনাহের কাজ তো করবেই না, এমনকি তার নিয়তও অন্তরে রাখবে না। এরপরেও জেনেশুনে এমন কাজ কেন করলে? যার কারণে তুমি অভিযুক্ত হলে। আর জনগণ মৌলভীদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার এবং অভিযুক্ত করার সুযোগ পেল। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে-

لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّذُلَّ نَفْسَهُ

অর্থাৎ মু'মিন যেন নিজে নিজেকে অপদস্ত অসম্মানিত না করে।

আর তুমি যা করেছ সেটাতো সবচেয়ে বড় অপদস্ত এবং অসম্মানের কাজ। তোমাদের কি হলো? তোমাদের অন্তর হতে কি আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়েছে? নির্বোধ কোথাকার।

তোমাদের কি মোটেও বুঝবুদ্ধি নেই, অন্তরে কি একবারো এ কথা জাগ্রত হলো না যে, আমি যেই কাজ করছি তার দ্বারা গুনাহ হবে, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হবেন, আর জনগণ শুনলে তা সমাজে প্রকাশ করতে থাকবে। এর দ্বারা আমার এবং আমার মতো যারা আছে তারা লোক সমাজে অপমানিত ও লজ্জিত হবে? এরপর হযরত হাসতে হাসতে বললেন, অপরাধ তো করেছ-ই, আবার সেটা গোপন করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছ, শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশ পেয়েই গেল। আর যদি গোপন করেও ফেলতে তাহলে সর্বোচ্চ মানুষ থেকে তা গোপন করতে পারতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা থেকে তো গোপন করতে পারতে না, আল্লাহ সর্বাবস্থায় তোমাকে দেখছেন। তুমি কি করছো তাও দেখছেন, সেই খবরই তোমার নেই। নিজের আত্মমর্যাদা বা লজ্জাবোধ বলতে কোনো কিছুই নেই।

---

[২৯১]। আল ইযাফাত পৃ. ৩২৮

এখন থেকে যে সমস্ত তালিবে ইলম মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য আসবে, তাদেরকে বলতে হবে যে, তারা যেন বিয়ে করে স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে আসে। যে ছাত্ররা ছুটি নিতে এসে বলে যে, অমুক জায়গায় ঘুরাফিরা করার জন্য যাবো, তাদের মাঝে হতে অনেকে আছে, তারা সুন্দর জায়গা দেখে আনন্দিত হয়, আবার অনেক আছে তারা সুন্দর উদ্যান দেখে আনন্দিত হয়, আবার অনেকে আছে তারা ভালো উৎকৃষ্ট মানের কাপড় দেখে অনন্দিত হয়, আবার অনেক আছে তারা ছোট ছোট ছেলেদের দেখে আনন্দিত হয়। তবে এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। লজ্জা হয় না এ সমস্ত অপকর্ম করে থাকো? যাও এখান থেকে চলে যাও। আমি তোমার এই বিষয়টি আরো নিগুড়ভাবে তাহকিক করব, এরপর তোমার শাস্তি নির্ধারণ করব। তোমাদের থেকে কি আল্লাহর ভয় একেবারেই বিদায় নিয়েছে?[২৯২]

যারা প্রেম –প্রীতি ভালোবাসায় আনন্দ পায়, তাদের একদল আছে, যারা ছোট ছোট বালক বা ছেলেদের সাথে ভালোবাসা করে, মেয়েদের সাথে নয়, আবার আরেক দল আছে তারা মেয়েদেরকে ভালোবাসে, ছেলেদের নয়, আবার আরেক দল আছে উভয়ের সাথে প্রেম – প্রীতি ভালোবাসা করে। এই সবগুলোই ফাসিক। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এই ব্যাধিটিই সবচেয়ে মারাত্মক এবং জঘন্য। আল্লাহ তাআলা এদের উপর রাগাম্বিত হন। এগুলোর কারণে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন রোগ বালাই শাস্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এ সমস্ত বদ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ জঘন্যতম কাজ থেকে হিফাজত করুন।[২৯৩]

৩৭ . আমাদের মধ্য হতে অনেক তালিবে ইলম এমন আছে যারা মনে করে থাকে যে, এখন তো আমরা লেখাপড়া করছি, এখন আমল করার সময় কোথায় যখন লেখাপড়া শেষ করব তখন আমল করব। এই ধারণাটি নিতান্তই ভুল। এখন তোমরা একটা পরিবেশের মাঝে তোমাদের কিছু বাধ্যবাকতা রয়েছে, এই সময়ে যদি কোনো আমল করতে না পারো এবং গুনাহ ছাড়তে না পারো, তাহলে যখন লেখাপড়া করে ফারেগ হয়ে যাবে, আর তোমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা চলে আসবে। তখন কস্মিনকালেও ঐ গুনাহ ছাড়তে পারবে না। আমলও করতে পারবে না, বরং তোমাদের আমল আখলাক ঠিক করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এখনই সময়। যতদিন সময় অতিবাহিত হবে, খারাপ অভ্যাস, বদ স্বভাব অন্তরে আরো দৃঢ়ভাবে বসে যাবে।

২৯২। আল ইয়াফাত খ .৪ পৃ. ৫৩১

২৯৩। আল ইয়াফাত খ ৪ . পৃ . ৫১১–৫১২

সাধারণ জনগণ উলামায়ে কিরামদের যে ছোট নজরে দেখে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে এর মূল কারণ হলো তাদের বদ আমল। আমল দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো নামায রোযা বা নফলসমূহ নয়। সেগুলো মাশাআল্লা আপনারা যথাযথভাবেই করে থাকেন, সেগুলো নিয়ে আমার কোনো আলোচনাও নেই।

আমল দ্বারা আমার উদ্দেশ্য অহংকার দম্ভ হিংসা, পরনিন্দা, চোখের গুনাহ, এগুলো তোমরা ছেড়ে দাও এবং সংশোধনের ফিকির করো। আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি করো। দীনের মহব্বত অন্তরের ভিতর পয়দা করো। যাদেরে থেকে তোমরা উপকৃত হয়েছ, তাদের ভালো গুণগুলোর অনুসরণ করো এবং তাদের খেদমত করো। তাহলে দেখবে তোমাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াদারদের আর খারাপ ধারণা থাকবে না এবং কোনো প্রকার অভিযোগও থাকবে না। তখন তারা তোমাদের প্রশংশায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকবে।

আর একটা কথা তোমাদেরকে বিশেষভাবে বলছি। খুব ভালোভাবে শুনে রাখ, মাল সম্পদ এবং ক্ষমতার লোভ –লালসা ছেড়ে দাও। এর কারণে দুনিয়াদার লোকেরা তোমাদেরকে ছোট নজরে দেখে এবং হেয়প্রতিপন্ন করে। এই কারণে যেখানে সামান্যতম দুনিয়াবী জিনিসের লোভ-লালসা সম্ভাবনা রয়েছে সেখান থেকে দূরে থাকো, যদিও তোমাকে কষ্টে বা সংকটে সময় অতিবাহিত করতে হোক কেন?[২৯৪]

৩৮. হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রা. এর ঘটনা একবার এক তালিবে ইলম তার মেহমান হলো। রাতে ঘুমানোর সময় লোটা ভরে পানি তার নিকটে রেখে দিলেন। সকালে যখন তিনি সেখানে আসলেন, তখন লোটাভর্তি পানি যথাস্থানে দেখে তিনি তালিবে ইলমকে বললেন, অমি লোটাভর্তি পানি এজন্য রেখে ছিলাম, যে তুমি অবশ্যই তো তাহাজ্জুদের সময় উঠবে, তখন যেন উযুর পানি তালাশে তোমাকে অস্থির হতে না হয়। কিন্তু আমি যেখানে যে অবস্থায় পানি রেখে গেছি, সেই অবস্থায় পানি দেখতে পেলাম। এর অর্থ তুমি তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত নও। বড় আফসোসের কথা, তালিবে ইলমদের আরো বেশি স্বরণ রাখা দরকার যদি উলামায়ে কিরাম এবং তালিবে ইলমরা তাহাজ্জুদের অনুসারী না হয় তাহলে কে তার অনুসারী হবে?

৩৯. মৌলভী ও অনুসরণীয় হয়ে দ্বীন সকলের জন্য নয়। কেবল ওই ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত, যার মাঝে দুনিয়ার ভালোবাসা নেই তবে আল্লাহর ভয় এবং দ্বীনের মহব্বতে অন্তরটা পূর্ণ।[২৯৫]

---

[২৯৪] । আল ইয়াফাত খ ৩ পৃ .৫২–৫৩

[২৯৫] । ওয়াজে ইতাআতুর আহকাম পৃ. ১১

ভালো করে স্মরণ রাখবে, আমরা যারা লম্বা জামা ও টুপি পরেছি তারা কিন্তু পরিপূর্ণ আলেম হতে পারিনি। কারণ আলেম হওয়ার অর্থ হলো অনুসরণীয় হওয়া, আর অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা সকলের মাঝে নেই। বরং তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, সেগুলোর মাঝে হতে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হলো ধৈর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ। পাশাপাশি অমুখাপেক্ষিতার গুণ, এটা সব চেয়ে বেশি দরকার।

মুকতাদা বা অনুসরণীয় হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো, হকের ব্যাপারে কারো সাথে আপোস না করা এবং কোনো কিছুর ভয় না করা আমাদের মাঝে কি এই গুণগুলো আছে ? কখনোই কারো মাঝে পরিপূর্ণভাবে নেই।[২৯৬]

কতেক ভুল ধারণা ও প্রতিকার

১. কোনো কোনো তালিবে ইলমের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে য়ে, এখন ইলম অর্জন করার সময়, আমল করার নয়। যখন ইলম অর্জন হয়ে যাবে তখন আমল করব। এ ধারণা সুস্পষ্ট শয়তানি ধোকা। কুরআন হাদীসের কোথায়ও আমল করা এবং বিধি বিধান ওয়াজিব হওয়ার মাঝে ছাত্র শিক্ষকের কোনো পার্থক্য করেনি। তাহলে ওই সুযোগ কোথা থেকে আসে ?[২৯৭]

২. কিছু কিছু তালিবে ইলমের মাঝে একটি আরবি প্রবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে –

يَجُوْزُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَا لَا يَجُوْزُ لِغَيْرِهِ

বুযুর্গদের সংশ্রবের প্রয়োজনীয়তা

বুযুর্গ ও আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সর্ম্পক রাখা অত্যন্ত আবশ্যক এবং এটা নিজের জন্য বড় একটা নিয়ামত। এখন মানুষেরা বুযুর্গদের সম্মান করে না, যা আদৌ ঠিক নয়। আমি সর্বদা তাদেরকে শ্রদ্ধা করি এবং বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। কারণ আমার উপর বুযুর্গদের দোয়া ছাড়া আর কিছু নেই, না ইলম আছে না আমল। শুধু বুযুর্গদের দোয়া এই একটা জিনিসই আমার মাঝে আছে।[২৯৮]

১. যারা বর্তমানে উলামায়ে কিরাম এবং তালেবে ইলম, তারা এ বিষয়টির প্রতি মোটেও খেয়াল করে না, যে কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার খেদমত করা এবং দোয়া নেয়া দরকার। শুধু কিতাবাদি পড়ে নিয়ে নিজে নিজে ভাবতে

---

[২৯৬] । আত তাকওয়া পৃ. ১৭– ১৮
[২৯৭] । হুকুকুল ইলম পৃ .৩৩
[২৯৮] । আল ইফাযাত খ পৃ. ১০৫

শুরু করে আমি তো অনেক বড় কিছু হয়ে গেছি। শুধু তাই নয় এরকম অনেকে আছে যারা মনে করে আমি এখন সফলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।

২. যে আলেম মাদরাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ লেখাপড়া করল, কিন্তু খানকায় গিয়ে কোনো বুযুর্গের সংশ্রেবে থাকল না তার উধাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে উযু করার উপরই সন্তুষ্ট থাকল কিন্তু নামায আদায় করল না। সে ঐ কবিতার মিসদাক হয়ে গেছে যেই কবিতা আরবি কোনো কবি বলেছেন-

অর্থ : হে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকগণ ! আপনরা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মাদরাসায় লেখাপড়া করে ইলম অর্জন করলেন তা সংশয় সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেননি। কারণ শুধু কিতাবী এবং শাব্দিক কিছু জ্ঞান অর্জন করার দ্বারা ইলমের বাস্তবিক জিনিস অর্জন হয় না।[২৯৯]

৩. শুধু শেখা এবং শেখানোর দ্বারা কোনো কিছুই অর্জন হয় না, বাস্তবিক অর্থে কিছু অর্জন করতে হলে, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সংশ্রবে যেতে হয়।[৩০০]

৪. আমি এমন কোনো লোক দেখিনি যে কোনো বুযুর্গদের সংশ্রব ছাড়াই শুধু লেখাপড়া করে সত্যিকার অর্থে আলেম হয়ে গেছে। আর জনসাধারণও তার থেকে উপকৃত হচ্ছে? তবে হ্যাঁ, এরূপ আমি অনেককে দেখেছি যারা সঠিকভাবে সীন এবং ক্বাফ উচ্চারণ করতে পারে না অর্থাৎ কিতাবের এবং পাঠ্যগত কোনো জ্ঞানই নেই, কিন্তু বুযুর্গদের সংশ্রবের বরকতে দীনের অনেক বড় বড় খিদমতে তারা নিয়োজিত। মোটকথা, কোনো বুযুর্গের সংশ্রব ছাড়া যেই ইলম অর্জন হয়, তা হলো শয়তান এবং বাল'আম বাউরের ইলম।[৩০১]

৫. এমনিভাবে যারা শুধু কিবাতাবের ইলম অর্জন করেছে কিন্তু তরবিয়াতপ্রাপ্ত হয়নি তাদের মাঝেও চালাকি এবং ধোকার সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে যারা কিতাবী ইলমও শিখেনি আবার তরবিয়াতপ্রাপ্ত হয়নি তাদের অবস্থাও একই ধরনের। মোটকথা, তরবিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত দীক্ষা ছাড়া ইলম উপকারী নয়, বরং ক্ষতিকর।[৩০২]

৬. যে সমস্ত গাছ জঙ্গলে এমনি হয় সেগুলো ভালো হয় না এবং সে সমস্ত গাছ থেকে মজাদার ফলের আশাও করা যায় না। তবে হ্যাঁ, যদি বাগানের মাঝে এসে ভালো কোনো জায়গায় রোপণ করে কেটে ছেটে তার যথাযথ পরিচর্যা করা হয়,

---

২৯৯ । আল লাতায়িফ পৃ. ১৩৪৪
৩০০ । আল ইফাযাত খ ৪ পৃ. ৫১৫
৩০১ । তরিকুন নাজাত পৃ. ৯৬– ৯৭
৩০২ । তরিকুন নাজাত ৯৬–৯৭

তাহলে তার থেকে আবার উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ঠিক এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো বুযুর্গের দরবারে দীর্ঘ সময় তার সংশ্রব গ্রহণ না করে নিজের সংশোধন করে না শুধু কিতাবাদি পড়ে নেয়াকেই সংশোধনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, তাদের উদাহরণ হলো ঐ জংলী গাছের মতো। পরবর্তীতে এমন ব্যক্তি থেকে দীনের কোনো কাজ তো হয় না, উল্টা, বদদীনি, খারাপ আকাইদ এবং অন্যান্য অনিষ্টতা প্রসার হতে থাকে।[৩০৩]

৭. বুযুর্গদের সংশ্রবেই দ্বীন অর্জন হয়। আমি কসম খেয়ে বলছি কিতাব থেকে দ্বীন অর্জন হয় না। নিয়ম – কানুন ও বাহ্যিক যেই দ্বীন তা কিতাব থেকে অর্জন হতে পারে, তবে বাস্তব দ্বীন বুযুর্গদের জুতা সোজা করা ছাড়া কখনোই অর্জন হয় না। দ্বীন কাউকে তোষামোদ করে না, বরং দ্বীনকেই তোষামোদ করতে হয়।

৮. যে ব্যক্তি শুধু লেখাপড়া করেছে, কিন্তু কোনো বুযুর্গের সংশ্রবে সময় ব্যয় করেনি, সেও আওয়ামের অন্তর্ভুক্ত।[৩০৪]

দ্বীনের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক বুযুর্গদের সংশ্রবেই হয়, কিতাব থেকে নয়।[৩০৫]

কিতাবী যোগ্যতা যত বেশিই হোক না কেন কোনো শায়েখের সংশ্রব ছাড়া বিচক্ষণতা এবং পরিপূর্ণতা অর্জন হয় না।[৩০৬]

৯. প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা সকলেই কোনো বুযুর্গের সংশ্রবে নিজের জীবন কাটাবেন। এর কারণে, ইসলাম ও দীনের আকর্ষণ অন্তরে বসে যাবে, আর এই আকর্ষণই হলো দীনের রুহ। দীনের আকর্ষণ দিলের মাঝে বসানো খুবই জরুরি। এ আকর্ষণ ছাড়া নামায রোজা কোনো কাজে আসবে না। কারণ এই অবস্থা ছাড়া সবকিছু ব্যর্থ। তার অবস্থা হবে তোতা পাখির মতো, তাকে যা শিখানো হয় সে শব্দটাই সে জবানে আওড়াতে থাকে, অন্য কিছু বলার প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকলেও বলতে পারে না। কোনো এক কবি তার তোতাপাখির মৃত্যুর স্মরণ করে বলছেন –

যদিও কবি কাল্পনিক তোতাপাখির ব্যাপারে যা কিছু বলছেন, সেগুলো কোনো বাস্তব ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু তারপরেও এটুকু গভীরভাবে লক্ষ করলে বুঝে আসে তিনি বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন অর্থাৎ তিনি একথা বলেছিলেন যে, যে শিক্ষার আকর্ষণ আর প্রভাব দিলের মাঝে পড়ে না, বিপদের সময় তার সেই শিক্ষা কোনোই কাজে আসে না।

---

[৩০৩] । মাকালাত পৃ. ৪০৭
[৩০৪] । হুসনুল আজিজ পৃ, ৪৫
[৩০৫] । আলকামুল হাসান পৃ. ২৫
[৩০৬] । আল ইযফাত খ. পৃ. ৩৬৯

এমনিভাবে দীনের প্রকৃত আকর্ষণ আর ভালোবাসা যদি অন্তরে না থাকে, তাহলে আলেম হোক বা হাফেজ হোক সেই ইলম ও হিফজ তার কোনো কাজেই আসবে না। একপর্যায়ে তাকে বে-দ্বীন হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। প্রিয় ভাইয়েরা! মানুষের অবস্থা দেখে আমি বলছি মুসলমানদের অন্তর থেকে দিন দিন ইসলাম ও দীনের মহব্বত, ভালোবাসা ও আর্কষণ বিদায় নিচ্ছে। এখন সতর্ক করছি আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের সোজা পথে চলে নিজের উপর এবং নিজ সন্তান- সন্ততিদের উপর রহম করুন।[৩০৭]

১০. বর্তমানে উলামায়ে কিরাম ও তালিবে ইলমদের জন্য কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির সংশ্রবে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা খুবই জরুরি। এই সংশ্রবকে বর্তমান সময়ের জন্য আমি ফরজে আইন মনে করি। বড় মারাত্মক সময় অতিবাহিত হচ্ছে। যেই কাজ প্রত্যক্ষভাবে ঈমান হিফাজতের কারণ, সেই কাজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? শুরু থেকেই সমস্ত কাজের গুরুত্ব দেয়া খুবই জরুরি।

উলামায়ে কিরাম এবং তলিবে ইলমরা নেক বুযুর্গের সংস্পর্শে না থাকার কারণেই উস্তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাদের সাথে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করছে। এই সংশ্রব আর সংস্পর্শের অভাবেই উলামায়ে কিরামগণ বিভিন্ন বক্তৃতা সেমিনারে কুরআন হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে। শুধু তাই নয় অবস্থা তো এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, যারা বয়সে, ইলমে, আমলে সর্বদিক বিবেচনায় কম তারা নিজেদেরকে বুযুর্গ ও উস্তাদদের সমকক্ষ মনে করতে শুরু করছে।[৩০৮]

১১. বর্তমানে সকল উলামায়ে কিরামগণ কিছু না কিছু বদ আখলাকের শিকার, এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, তাদের বুযুর্গ আল্লাহওয়ালার সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। বড়দের সংশ্রব খুবই প্রয়োজনীয় একটি কাজ, তা থেকে ঐ ব্যক্তিই দূরে থাকে যার মাঝে আখিরাতের ফিকির নেই। যার মাঝে আখিরাতের ফিকির আছে সে কখনোই তা থেকে দূরে থাকতে পারে না। আমি তো বলে থাকি যে, উলামায়ে কিরামদের জন্য কোনো বুযুর্গ আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে থাকা ফরজে আইন।[৩০৯]

শরীআতের ইজ্জত ও সম্মান হিফাজত করা

১. যারা বাস্তবিক অর্থে আলেম তারা শরীআতের ইজ্জত-সম্মান হিফাজতের সামনে কারো বদনাম বা ভর্ৎসনার প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।[৩১০]

---

[৩০৭] । তরিকুন নাজাত ১০৯- ১১০

[৩০৮] । আল ইযাফাত খ . পৃ. ৭০১

[৩০৯] । আল ইযাফাত খ ৪. পৃ. ৬৭৩

[৩১০] । আনফাসে ঈসা খ পৃ . ৩২৭

২. আমরা যারা আলেম তাদের প্রতি জনগণের যে ভালোবাসা-মহব্বত, তা শুধু দীনের বদৌলতে। সুতরাং দীনের ইজ্জত, সম্মান নিজের মাঝে রাখা খুবই আবশ্যক। যদি আমাদের আলেমদের মাঝেই দীনের কোনো ইজ্জত-হইতিরাম না থাকে তাহলে আমাদের দিকে কেউই ফিরেও তাকাবে না। এজন্য এমন কোনো কাজ বা কথা যাতে আমাদের থেকে প্রকাশ না পায় যার দ্বারা দীনের বদনাম হয়।[৩১১]

৩. উলামায়ে কিরাম, তালেবানে ইলম ভালো করে শুনে রাখুন; আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যেখানে দীনের সামান্যতম অসম্মানের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পয়সা অর্জন হতে পারে, এমন টাকা পয়সার উপর হাজার বার লা'নত।[৩১২]

৪. মাদরাসাওয়ালারা আপনারা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবেন, দীনের ইজ্জত সম্মান এবং তা হিফাজতের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের উপর। আপনার দ্বারা যেন দীনের সামান্যতম অসম্মান না হয় সে দিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।[৩১৩]

৫. যদি বাহ্যিকভাবে কোনো কাজ জায়েয মনে হয় কিন্তু তা করার কারণে দীনের উপর সামান্যতম কোনো কথা বলার সুযোগ থাকে তাহলে সে কাজ থেকে বিরত থাকুন।[৩১৪]

৬. যেখানে দাওয়াত কবুল করার দ্বারা ইলমের অসম্মান, সেখানের দাওয়াত কখনো কবুল করা যাবে না।[৩১৫]

৭. যারা নামের আলেম তাদের অবস্থা বড় ভয়াবহ। আমি এক মৌলভী সাহেব কে দেখলাম, সে টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া–বিবাদে লিপ্ত। সে কাউকে বলছে আমাকে এত টাকা ভাড়া বাবদ দিতে হবে, আর তাকে যে ডেকেছে সে হিসাব নিকাশ শোনাচ্ছে।

৮. যেই মুবাহ কাজ আলেম ব্যক্তি করার কারণে জনসাধারণের মাঝে ফিৎনা ফাসাদের ভয় আছে, সে মুবাহ কাজও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। বিশেষ করে এমন মুবাহ কাজ যা করার কারণে দীনের উপর কোনো কথা ওঠে।[৩১৬]

---

[৩১১] । কামালাতে আশরাফিয়া পৃ. ৭৯
[৩১২] । আনফাসে ঈসা খ পৃ. ৩১৩
[৩১৩] । আনফাসে ঈসা পৃ . ৩১৩
[৩১৪] । আরজাউল হক খ ২ পৃ. ২৪১
[৩১৫] । হুসনুল আজিজ খ ১. পৃ. ২৮৪
[৩১৬] । হুসণুল আজিজ খ ১. পৃ. ২৮৪

৯. কিছু আলেম এমন আছে যারা জাহেল এবং আওয়ামদেরকে তোষামোদ করে। এরকম আলেমগণ কোনো ধনী লোক অসুস্থ হলে, তাকে দেখার জন্য দশবার যায়, কিন্তু কোনো দরিদ্র এবং অভাবী লোক অসুস্থ হলে একবার তার হাল পুরুচি পর্যন্ত করে না।[৩১৭]

আমার আত্মমর্যাদায় লাগে এবং নিজেকে ছোট মনে হয়, দুনিয়াদারদের সাথে এমনভাবে মিলিত হওয়া যার দ্বারা উলামায়ে কিরাম এবং দীনের অপমান হয়। আওয়ামদের স্পর্ধা বেড়ে গেছে, তারা আলেমদের যা ইচ্ছা তাই বলে থাকে, এটা শুধু উলামায়ে কিরামগণ দুনিয়াদারদের তোষামোদ করার কারণে। প্রতিটি জিনিসেরই একটা সীমারেখা আছে। দুনিয়াদারদের সাথে মেলেমেশারও একটা সীমারেখা আছে, আর তা হলো এ যে, এতটুকু মিশতে পারে যার দ্বারা দীনের অপমান না হয়, এই পর্যায়ের মেলামেশা আবার মন্দও নয়। এর থেকে অতিরিক্ত আবার খারাপ। আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা! আমাদের বুযুর্গরা এ বিষয়গুলোর প্রতি সর্বদা খেয়াল রেখেছেন।[৩১৮]

আবার তাওয়াক্কুলের উপরও আমল হওয়া চাই। দীনের ইজ্জত সম্মান মাদরাসার কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে। মাদরাসাগুলো দ্বীন সংরক্ষণের মারকাজ। তাই বলে নিজের অস্থিত্ব আর আত্মমর্যাদা মিটিয়ে দিয়ে নয়।[৩১৯]

১০. আত্মমর্যাদা এমন একটি জিনিস যার কারণে মানুষ হাজারো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আত্মমর্যাদার কারণে মানুষ গুনাহের সন্নিকটে গিয়েও আবার তা থেকে ফিরে আসে। অনেক এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুনাহ রয়েছে যেগুলো বিবেকবুদ্ধিতে বুঝে আসে না কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সেগুলোকে ঠিকই বুঝে। মোটকথা, একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, লজ্জা এবং আত্মমর্যাদা ঈমানের বড় একটি অংশ। যার কারণে বিশেষভাবে সেটাকে উল্লেখ করা হলো।[৩২০]

---

৩১৭ । আল ইতমাম খ ২. পৃ. ৪৮
৩১৮ । আল ইফফাত খ ১ পৃ ৯৭
৩১৯ । আল ইয়াফাত খ ২ পৃ ৩৮
৩২০ । হুসনুল আজিজ খ ১ পৃ . ৬০২

অধ্যায়-২৪

বড়দের প্রতি পালনীয় আদবসমূহ

আদব: তুমি যখন কোনো বড় ব্যক্তির সাথে অবস্থান করবে, তখন তার অনুমতি ছাড়াই কোনো কাজ করবে না।

আদব: যদি কোনো বুযুর্গের জুতা হিফাজত করতে চাও, তাহলে জুতা খোলা মাত্রই উঠাবে না, কারণ এরকম করতে গিয়ে অনেক সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

আদব: আনেকে এমন আছে যারা কখনো কখনো অন্যের কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করা পছন্দ করে না। যখন এ অবস্থা সামনে আসবে, তখন খেদমত করার জন্য পিড়াপিড়ি করবে না, কারণ এরকম অবস্থায় খেদমত করলে, যার খেদমত করা হচ্ছে, তার কষ্ট হয়। তিনি খেদমত কামনা করেন না তার স্পষ্ট কথার মাধ্যমে অথবা আলামতের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে।

আদব: যদি কেউ তোমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে সে কাজ সম্পাদন করে তাকে অবহিত করবে। কারণ অনেক সময় কাজটি হলো কি না তা জানার জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

আদব: প্রথম সাক্ষাতেই কেনো মুরুব্বীর শারিরীক খেদমত করা কষ্টকর, তাই যদি শারিরীক কোনো খেদমত করার অগ্রহ থাকে, তাহলে প্রথমে ভালোভাবে তার সাথে পরিচয় হয়ে নিবে।

আদব: যদি কেউ তোমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে তা সম্পাদন করে তাকে অবহিত করবে, তাহলে সে অপেক্ষায় থেকে অধৈর্য হবে না।

আদব: অপ্রয়োজনে বড়দের কাছে কাউকে মাধ্যম বানিয়ে সংবাদ দিবে না। কোনো ধরনের লৌকিকতার আশ্রয় না নিয়ে যা বলার নির্দ্ধিধায় বলে দিবে।

আদব: যদি কোনো মুরুব্বীর সাথে তার কোনো সাথীকেও দাওয়াত করো, তাহলে তাকে এ কথা বলবে না যে, হজরত আসার সময় তাকেও সাথে নিয়ে আসবেন। কারণ ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় তার স্মরণ থাকবে না। আর তাছাড়া নিজের কোনো কাজ বড় ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা একধরনের বে-আদবি। এজন্য কখনোই এরূপ করবে না, বরং এক্ষেত্রে আদব হলো

মুরুব্বীর অনুমতি নিয়ে সঙ্গীকে বলবে যে, যথাসময়ে তার সাথে যোগাযোগ করে চলে আসবে।

আদবঃ এক ব্যক্তি মাঝে মাঝেই গ্লাসে করে পানি এনে কখনো নিজের জন্য পড়িয়ে নেয়, আবার কখনো অন্যের জন্য পড়িয়ে নেয়। তবে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কখনোই বলে না যে, কখন কার জন্য পানি পড়ে নিচ্ছে। তাই হজরত তাকে বললেন, তুমি কখন কার জন্য পানি পড়ে নেও, আমি গায়েবও জানি না যে, দেখেই বুঝে নিব কখন কার জন্য পানি পড়ে নিতে আসো। তাই এখন থেকে যখনই পানি পড়ে নিতে আসবে তখনই জিজ্ঞাসা ছাড়াই গ্লাস রেখে বলে দিবে। কোনো বিষয়ে কাউকে বারবার জিজ্ঞাসা করা বে-আদবি মনে করি।

আদবঃ জনৈক গ্রাম্য লোক মজলিসে বসে কথা-বার্তা বলছিলো। এক পর্যায়ে সে কিছু অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করলে তখন মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে ইশারায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো। থানভী রহ. তাকে কঠোরভাবে সাবধান করে বললেন, তাকে কথা থেকে থামানোর ব্যাপারে তোমাকে কে অধিকার দিলো। তুমি এভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করলে কেন? আমার এ মজলিস কোনো ফেরআউনী মজলিস নয়। যদি তুমি বলো যে, সে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছে, হ্যাঁ তা থেকে বারণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে জীবন দান করেছেন। এতে তুমি কেন নাক গলালে? এরপর ওই গ্রাম্য লোকটিকে শায়খ বললেন, তুমি যা বলার বলো।

আদবঃ যদি তোমাকে লক্ষ্য করে কেউ কিছু বলে তাহলে তুমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবে। বিশেষ করে যখন কেউ তোমার কল্যাণকর বিষয়ে কথা বলে, অথবা তোমাকে ভালো উপদেশ দান করে, অথবা তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়। এমনিভাবে যার সাথে তোমার ইসলাহী সম্পর্ক আছে, তার কথা খুব গুরুত্বের সাথে শুনবে। এমন ক্ষেত্রে অন্য মনস্ক হয়ে থাকা খুবই অপরাধমূলক কাজ।

বড়দের প্রতি পালনীয় আরো কতিপয় আদব

১. হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হাদিসে যারা বড়দের সম্মান করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা) কঠোর হুমকি দিয়েছেন। এ কারণে যে, এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া খুবই আবশ্যক।[৩২১]

বর্তমানে আমরা দেখি যে, ছোটরা বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না। আদব ও ইহতেরামের প্রতি কোনো খেয়াল করে না। তাই দিন দিন কল্যাণ ও মঙ্গল আমাদের থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে।[৩২২]

৩২১। ইসলাহে ইনকিলাব

২. আদবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত নেয়ামত পাওয়া যায়। আর তিনিও বান্দার প্রতি রাজি ও খুশি হন। আর বে-আবদির কারণে অনেক নেয়ামত থেকে মাহরুম হতে হয় এবং তিনিও বান্দার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্ট হন।[৩২৩]

৩. আমি বে-আদবিকে গুনাহ থেকেও বড় মারাত্মক মনে করি।

৪. কাউকে ইজ্জত ও সম্মান করার নামই শুধু আদব নয়; বরং সে সাথে শ্রদ্ধার প্রতিও খেয়াল রাখতে হয়। ইজ্জত ও সম্মান হলো আদবের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মাত্র। তাই সে দিকেও খুব খেয়াল রাখা চাই।[৩২৪]

প্রকৃত আদব হলো যাতে ভালোবাসা ও অনুসরণ থাকে। সুতরাং যে যাকে সম্মান করে তার প্রতি ভালোবাসা ও তার অনুস্মরণের প্রতি অনেক খেয়াল রাখে। শুধু মাত্র লৌকিকতার জন্য কাউকে সম্মান করা, তোষামোদ করা প্রকৃতপক্ষে কোনো আদবই নয়। এমন আদবকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। প্রচলিত ও প্রথাগত আদব ইহতিরামকে তারা ঘৃণা করতেন। তাই আমি বলে থাকি যে, যদি কাউকে ইজ্জত, সম্মান করো তাহলে মনে প্রাণেই করো। এমন আদব ও ইজ্জত-সম্মান থেকে বেঁচে থাকো যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়।[৩২৫]

৫. বড়দের সামনে নিজের সবকিছু মিটিয়ে দেয়াই হলো প্রকৃত আদব। এতে কল্যাণ নিহিত। তথা- নিজের মত, চিন্তা-বুদ্ধি, কাজ-কর্ম মোটকথা সবকিছু বড়দের খেয়াল অনুযায়ীই হবে, নিজের মত বলতে কিছুই থাকবে না। নিজের স্বাধীনতা পুরো বিলিয়ে দেবে, এর নাম-ই হলো প্রকৃত আদব। যারা নিজেদেরকে এভাবে বাড়িয়ে তুলেছে তারাই কেবল সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[৩২৬]

৬. বে-আদবির মূল হাতিয়ার হলো অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করা, যখন কেউ নিজেকে বড় মনে করতে আরম্ভ করে, তখন তার থেকে বে-আদবি প্রকাশ পেতে শুরু করে। এর থেকে বাঁচা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ এর কারণেই আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়।[৩২৭]

ছোটরা সর্বদা বড়দের আদব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। নিজেকে একেবারেই বড় মনে করে না। নিজেকে বড় মনে করার অর্থ হলো- সে নিজের

---

[৩২২] । আল ইফাযাত: খ. ৬ পৃ: ১৮৬
[৩২৩] । ওয়াজে আকবারুল আমাল: পৃ: ৪
[৩২৪] । আল ইফাযাত: পৃ: ৬০৭
[৩২৫] । আল ইফাযাত: খ. ২ পৃ: ৩৮৯
[৩২৬] । আল ইফাযাত: খ. ২ পৃ: ৩৮৯
[৩২৭] । আল ইফাযাত: খ. ২ পৃ: ২৭৯

মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা অনেক বড় অপরাধ।[৩২৮]

৭. কখনো-ই নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করবে না। তবে হ্যাঁ, ছোট মনে করতে গিয়ে আবার নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দেবে না। যখন ছোটরা নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করতে শুরু করে তখন তার অধপতন শুরু হয়ে যায়। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কখনোই যেন নিজের মাঝে অহংকার ও বড়ত্ব না আসে সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজেকে ছোট মনে করার মাঝেই সফলতা, আর বড় মনে করার মাঝেই ব্যর্থতা।[৩২৯]

৮. সারকথা হলো, সদা-সর্বদা নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট মনে করবে। যখন নিজেকে ছোট মনে করবে তখন অন্তরে বড়দের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরী হবে। কেননা সে অন্তরে বড়দের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকে না সে অন্তরে বড়ত্ব, অহংকার ও অহমিকা স্থান করে নেয়। কারো অন্তরে সামান্যতম আমিত্বের অনুপ্রবেশের অর্থই হলো, বড়দের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তার অন্তরে নেই। যার মাঝে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই, সে তার প্রতিটি কাজ-কর্ম ও পদক্ষেপ খুব চিন্তা ফিকির করে করবে, তাহলে তার অন্তরে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। না হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৩০]

৯. মান সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি যদি আমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে সে কাজ অবশ্যই করতে হবে, চাই তা আমার বুঝে আসুক বা না আসুক, তাতে কল্যাণ হোক কি-বা অকল্যাণ। তথা- কোনো বড় বুজুর্গের বৈধ আদেশ পাওয়ার সেখানে নিজের বুঝ বুদ্ধি না খাটিয়ে সে আদেশ পালন করা উত্তম। এটা তো এমনই যেমন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আদেশের বিপরীতে কোনো বুঝ বুদ্ধি ও বিবেকের দখলদারিত্ব নেই। ঠিক তেমনিভাবে বড় বুজুর্গদের নির্দেশের বিপরীতে আমার যুক্তির কোনো দখলদারিত্ব নেই। যে ব্যক্তি এভাবে মেনে চলবে তার দ্বীনের পাশাপাশি দুনিয়ার সবকিছুও ঠিক হয়ে যাবে।

১০. যখন বড়দের নাম নিবে, তখন তার উপনাম ও উপাধি খুব সম্মানের সাথে নিবে। আর বড়রা ছোটদের নাম খুব সাধাসিধেভাবে নিবে। এটাই পূর্ববর্তীদের নিয়ম ছিলো। এজন্য ইয়াকুব নানুতুবী (রহ) ছাত্রদেরকে নাম ধরে ডাকতেন। কাউকে একথা বলে বোঝানো সম্ভব নয় যে, হযরতের এমন ডাকের কারণে

---

৩২৮ । আল ইফাযাত: খ. ৭ পৃ: ৩১৩
৩২৯ । আনফাসে ঈসা: খ. ১ পৃ: ৭৭
৩৩০ । হুসনুল আজিজ: খ. ৩ পৃ: ৫৬

অন্তরে কি যে প্রশান্তি সৃষ্টি হতো? কিন্তু অন্যদের মাওলানা ডাকেও সে প্রশান্তি অনুভব হয় না।[৩৩১]

১১. অনেক লোক এমন আছে, যারা বড়দের আদব ও সম্মানের ক্ষেত্রে কার অধিকার আগে, আর কার অধিকার পরে, সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখে না। যার অধিকার আগে তাকে পরে আর যার অধিকার পরে তাকে আগে সম্মান প্রদর্শন করে। এমন করা ঠিক নয়; বরং আগে পরে লক্ষ রেখেই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

১২. বর্তমানের মানুষের অবস্থা দেখলে খুব ক্রোশ সৃষ্টি হয় যে, তারা পীরের আদব ও ইহতেরামের প্রতি যে পরিমাণ খেয়াল রাখে, মাতা- পিতার আদব ও ইহতেরামের প্রতি তার সামান্যতমও রাখে না। অথচ মাতা-পিতার আদবের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে নির্দেশ এসেছে। যদি মাতা- পিতা কোনো আদেশ দেয় তাহলে তা করা ওয়াজিব।

যদি পিতা-মাতার অমান্য করে কেউ নফল নামায আদায় করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। কারণ পীরের তুলনায় মাতা-পিতার হক অধিক। এ কারণে পীর যদি কোনো অবৈধ জিনিসের আদেশ দেয় তাহলে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জায়েজ নেই। বিপরীতে মাতা-পিতার সম্পর্ক সর্বদা থাকে যদিও কাফের হোক না কেন?[৩৩২]

১৩. আমি ইসলাহে ইনকিলাব নামক গ্রন্থে বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ সাব্যস্ত করেছি যে, মাতা-পিতার অধিকার হলো সবার আগে, এরপর উস্তাদের, তারপর পীরের। অথচ মানুষরা এটাকে একেবারেই উল্টে ফেলেছে। পীরের অধিকার সবার আগে, এরপর উস্তাদের, এরপর মাতা-পিতার। তাদের অবস্থা থেকে মনে হয়, পিতা-মাতার কোনো অধিকার-ই নেই।[৩৩৩]

ഇ ❦ ന്ദ

---

[৩৩১] । আত তাহযীব: খ. ৬ পৃ: ২২
[৩৩২] । ওয়াহদাতুল হুব: পৃ: ৩৩
[৩৩৩] । আল কালামুল হাসান

অধ্যায়-২৫

বিবিধ কিছু অদব

আল্লাহ তাআলার পরে পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও সম্মানিত ব্যক্তি হলেন পিতা মাতা, তাদের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা মহব্বত ভালোবাসা ও অনুসরণ-অনুকরণ করা চাই। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যার কারণে তারা কষ্ট পায়, ব্যথিত হয়। যখন তাদের সাথে কথা বলবে, তখন খুব নম্র ভাষায় ভদ্রভাবে বিনয়ের সাথে কথা বলবে, যখনই তাদের কথা স্মরণ আসবে তখনই তাদের জন্য অন্তর থেকে এ বলে দোয়া করবে -

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

অর্থ: হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের [মাতা-পিতা] প্রতি আপনি এরূপ অনুগ্রহ করুন, যেরূপ তারা শৈশবকালে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। শুধু বাহ্যিক সম্মান ও ইহতিরামকে যথেষ্ট মরে করবে না বরং অন্তর দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক তার অনুসরণ অনুকরণ করবে, তাকে মহব্বত করবে। কারণ অন্তরের অবস্থা তো আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো জানেন। বাস্তবিক অর্থেই তুমি অন্তর থেকে তাদেরকে ভালোবাসো, মহব্বত করো, কিন্তু ভুলক্রমে, অথবা মেজাজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে তোমার থেকে যদি কখনও বে-আদবি প্রকাশ পায়, তাহলে তাৎক্ষণিক তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করবে, আল্লাহ ভুল ক্ষমা করে দিবেন।[৩৩৪]

১. পিতা-মাতাকে কখনো কষ্ট দিবে না, যদিও তাদের থেকে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি হোক কেন?

২. মৌখিকভাবে এবং চলাফেরায় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

৩. জায়েয কাজে তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণ অনুকরণ করবে। তাদের নির্দেশ অমান্য করা গুনাহের কাজ।

৪. যদি একান্ত অপারগ না হও তাহলে টাকা পয়সা অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবেও তাদের সহযোগিতা করবে, যদিও তোমার কষ্ট হোক না কেন? এরূপ করা মুস্তাহাব।[৩৩৫]

---

৩৩৪ । বায়নুল কুরআন

৩৩৫ । বেহেস্তী জিওর

৫. অনেক লোকজন এমন আছে যারা বলে থাকে যে, আমার অন্তরে মা-বাবার ভালোবাসা-হৃদ্যতা আসে না, এটা নিজের কমজুরী এবং অন্তরের ব্যাধি, এর চিকিৎসা হলো তাদের বেশি বেশি খেদমত করো এবং ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হও।[৩৩৬]

৬. পিতা-মাতা তোমাকে এলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে তোমার উপর যে অনুগ্রহ করেছে, সর্বদা এ অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে। হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বলেন, আমার মাতা পিতা আমাকে দীনের শিক্ষা দিয়ে আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন; তার বিপরীতে অন্যান্য সকল নিয়ামত তুচ্ছ।[৩৩৭]

৭. পিতা- মাতা কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা বাস্তবায়ন না করা এবং তাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া জঘন্যতম অপরাধ।[৩৩৮]

৮. এমনিভাবে তারা আহ্বান করলে, দেরিতে সাড়া দেয়াও বে-আদবি।[৩৩৯]

৯. যদি কোনো কাজে বা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাদের জন্য তোমাকে কিছু কষ্ট করতে হয়, অথবা ত্যাগ শিকার করতে হয়, তাহলে সেই কষ্ট এবং ত্যাগ আনন্দচিত্তে মেনে নাও। আর মনে মনে চিন্তা করো, তারা তোমার জন্য কিরূপ কষ্ট করেছে এবং এগুলোকে তোমার সফলতার সোপন মনে করো।[৩৪০]

১০. পিতা- মাতার কোন ভূল কাজ অথবা ভুল কথার উপর সতর্ক করার প্রয়োযন দেখা দিলে, আদব ইহতিরামের প্রতি লক্ষ রেখে নরম ভাষায় বলবে। ক্রোধ আক্রোশ ও অভিযোগের স্বরে বলা ঠিক না।[৩৪১]

১১. কখনো যেন আমার কোনো কথা বা কাজের দ্বারা তাদের অন্তর ব্যথিত না হয় সে বিষয়টির প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। চিন্তা ফিকির এবং সতর্কতার সাথে চললেই তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমানে উদাসীনতা এই পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কোনো কাজেই চিন্তা ফিকির নেই। যার কারণে অহরহ ভুল প্রকাশ পাচ্ছে। যদি সতর্কতার সাথে চিন্তা ফিকির করে কাজ করা হয় তাহলেও ভুল প্রকাশ

---

[৩৩৬] । মালফুজাত পৃ.৩৬
[৩৩৭] । হুসনুল আজিজ পৃ. ১৪৯
[৩৩৮] । কামালাত খ. ১ পৃ . ১২৪
[৩৩৯] । কামালাত খ. ১ পৃ. ১২৪
[৩৪০] । হুসনুল আজিজ খ. ৩. পৃ . ২০৫
[৩৪১] । হুসনুল আজিজ খ . ৩ পৃ. ২০৫

পাবে। তবে সেক্ষেত্রে ভুল কম হবে, অথবা ভুল হলেও তার খারাফ প্রভাব থেকে বেঁচে থাকবে। এজন্য প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ফিকির করে তা সম্পাদন করা চাই।[৩৪২]

১২. যখন তাদের খেদমতের জন্য যাবে, তখন ছালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। হাদিসে বর্ণিত আছে

إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهِ

অর্থ : যখন তোমরা ঘরে যাও, তখন ছালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করো, কারণ এর দ্বারা পরস্পরের মাঝে মহব্বত ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়।

১৩. যখন পিতা মাতার কাছে যাবে, তখন তাদের অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে, আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কেউ রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি মা-বাবার ঘরে অনুমতি প্রবেশ করব? রাসূল সা. উত্তরে বলেন, হ্যাঁ তাদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। যদিও তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে একই ঘরে অবস্থান করো না কেন।[৩৪৩]

১৪. সবর্দা তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলবে।

১৫. তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে।

১৬. তাদের সাথে কথা বার্তা বলার সময় তোমার দৃষ্টি নিচে রাখবে।

১৭. কথা বলার সময় তোমার আওয়াজ যেন তাদের আওয়াজের থেকে উঁচু না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

১৮. কখনোই তাদেরকে নাম নিয়ে ডাকবে না।

১৯. তাদের সামনে খুব আদব ইহতিরামের সাথে বসে থাকবে। যখন এক সাথে চলবে, তখন তাদের পিছনে পিছনে চলবে। সামনে বা ডানে চলবে না।

২০. তাদের অগোচরে তাদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করবে না বরং সব সময় তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে।

২১. তাদের বিপরীতে কখনোই স্ত্রীকে প্রাধান্য দেবে না।

২২. তাদেরকে সর্বদা খুশি রাখার চেষ্টা করবে।

২৩. তাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও সফর করবে না।

---

[৩৪২] । আল ইজাফাত খ. ৫ পৃ. ১৩০

[৩৪৩] । মুয়ত্তা ইমাম মালিক

২৪. পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে এবং সন্তানের জন্য অনুগ্রহশীল হয়, যদিও তাকে মন্দ বলুক না কেন, অথবা মারুক না কেন। এটা কখনোই তারা শত্রু বা রাগের বশবর্তী হয়ে করে না; বরং সন্তানের মঙ্গল কামনায় করে থাকে।

২৫. উস্তাদ এবং পীরদের অনেক হক রয়েছে। সর্বদা তাদের আনুগত্য করবে এবং তাদেরকে খুশি রাখবে। কারণ তারা তোমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে গেছে এবং প্রকৃত মাশুক অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত দিয়েছে।[৩৪৪]

২৬. কোনো কাজেই স্বনির্ভর হবে না, যে স্বনির্ভর হয় এবং বড়দের সাথে পরামর্শ করে না, সে কখনোই সফলতা অর্জন করতে পারে না। বড়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং নিজের সকল বিষয়ে তাদের সাথে পরমর্শ করাার মাঝেই সফলতা। যখন নিজের কাজ বড়দের সাথে পরামর্শক্রমে করা হবে, তখন এর দ্বারা কাজের মাঝে বরকত হবে এবং নিজে আনুগত্যশীলদের মাঝে গণ্য হবে।

২৭. প্রথমে নিজের মাঝে তলব সৃষ্টি করো, এরপর বড়দের সামনে নিজেকে পেশ করো। আত্তারায়, আত্মতুষ্টি এবং স্বাধীন মনোভাব ছেড়ে দাও। এরই নাম হলো فناء تفويض .বড়দের সামনে নিজেকে মিটিয়ে দেয়া এবং নিজের সকল বিষয় তার উপর হাওলা করার মাঝেই সফলতা। অর্থাৎ নিজেন রায় বলতে কোনো রায় নাই, নিজের খিয়াল বলতে কোনো খেয়াল নেই।[৩৪৫]

২৮. যে কোনো কাজ করার পূর্বে তোমার উস্তাদ বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে নাও। এর দ্বারা কাজের মাঝে বরকত হয় বর্তমানে সকলের মাঝে আত্মরায়ের ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে মানুষেরা বেশি থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই আত্মরায়, স্বাধীন মনোভাব হলো কিছু বিনষ্ট করার মূল। এগুলো থেকে কঠিনভাবে বেঁচে থাকা জরুরি।[৩৪৬]

৯০ ৩৪৫ ০৫

[৩৪৪] । আল ইফাযাত খ . ১ পৃ ৮৪
[৩৪৫] । আল ইফাযাত খ ২ পৃ. ৩৮৯
[৩৪৬] । আল ইফাযাত খ . ২ পৃ . ৩৮৯

অধ্যায়-২৬

পিতা- মাতার অধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস

১. পিতা -মাতার খিদমত করার দ্বারা রিযিক এবং বয়স বৃদ্ধি পায়।

২. পিতা -মাতার দিকে ভালোবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজ্বের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. পিতা– মাতার খিতমত করা জিহাদের থেকেও উত্তম।

৪. পিতা– মাতার খেদমত করার দ্বারা হজ্ব, উমরা এবং জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

৫. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত।

৬. যে ব্যক্তি মাতা-পিতার অবাধ্যতা করে, রাসূল সা. তার জন্য তিনবার লা'নত করেছেন।

৭. পিতা – মাতার দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকানো অবাধ্যতা।

৮. পিতা – মাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ।

৯. পিতা – মাতাকে গালি দেয়া গুনাহে কবিরা, আর তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা বে-আদবি।

১০. যে মাতা-পিতাকে কে গালি দেয় আল্লাহ তাআলা তার উপর লা'নত করেন।

১১. যারা মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেন।

১২. যারা মা বাবাকে কষ্ট দেয় অথবা তাদের অবাধ্যতা করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নআত থেকে মাহরূম করবেন।

১৩. যারা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য জাহান্নামের দরজা সর্বদা খোলা থাকে।

১৪. যারা পিতা মাতাকে হত্যা করবে, তারা সবচেয়ে বড় শাস্তির উপযোগী।[৩৪৭]

১৫. মায়ের সাথে সুন্দর ও নম্র আচরণের ব্যাপারে হাদীসে বার বার তাকিদ এসেছে।

১৬. পিতা – মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি।

১৭. পিতা – মাতার খেদমত আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্যান্য সকল নফল ইবাদত থেকে বেশি পছন্দনীয়।

ꕥ ꕥ ꕥ

---

[৩৪৭] । বুখারী মুসালম

অধ্যায়-২৭

শিক্ষকের আদবসমূহ

১. বর্তমানের ছাত্রদের অবস্থা বড় করুন, তাদের থেকে শিক্ষকের আদব ইহতিরাম একেবারেই বিদায় নিয়েছে, যার ফলে ইলমের মাঝেও ওই রকম বরকত হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার নীতি হলো যদি উস্তাদ কোনো ছাত্রের উপর অসন্তষ্ট থাকে, তাহলে ঐ ছাত্র কখনোই বাস্তব ইলম পাবে না। অনেক সময় এর বিপরীতে দেখা যায়। আমি তাদের ব্যাপারে বলব, বাহ্যিক কিছু আরবির অনুবাদ করতে পারার নাম ইলম নয়, ইলম হলো অন্য এক জিনিসের নাম।

আবার যাদের মাঝে কিছুটা আদব আছে, তাদের আদব হলো লৌকিকতা ও প্রথাগত আদব, হাকীকি আদবের ন্যূনতম নাম নিশানাও তাদের মাঝে অবশিষ্ট নেই। ভাল করে স্মরণ রাখবে, বাহ্যিক সম্মানের নাম অদব নয়। আদব বলা হয় অন্যকে আরাম দেয়া।[৩৪৮]

২. পীর মুরিদের সম্পর্কের চেয়েও ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্ক আরো অনেক গুণে বেশি, স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের চেয়ে পীর–মুরিদের সম্পর্ক আরো বেশি।[৩৪৯]

৩. (ক) পূর্ববর্তী জামানায়, উস্তাদ–ছাত্রের সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ছাত্ররা উস্তাদের আদব, ইহতিরাম, ইজ্জত সম্মানের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখত। যার ফলে ইলমের মাঝে বরকত হতো, অল্পতেই অনেক কিছু শিখে ফেলত। আর বর্তমানে ছাত্ররা শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করে, উস্তাদের আদব ইহতিরামের প্রতি মোটেও খেয়াল করে না, যার কারণে দিন দিন ইলম বিদায় নিতে শুরু করছে। অনেক ছাত্রকে এমনও দেখা যায়, তারা উস্তাদের সাথে মারাত্মকভাবে বে–আদবি করে বসে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি এমন ছাত্ররা কখনোই ভালো থাকতে পারেনি, তারা নামতে নামতে একপর্যায়ে সর্ব নিম্নস্তরে এসেছে।[৩৫০]

(খ) আমাদের সময়ে ছাত্ররা উস্তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, মহব্বত ভালোবাসার সম্পর্ক রাখত, যার কারণে ছাত্ররা উস্তাদের রঙে রঙিন হতো। তাদের প্রতি খারাপ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না এবং উস্তাদগণ ছাত্রদের প্রতি অনুগ্রশীল

---

৩৪৮ । আল ইফাযাত খ ২ পৃ. ৩৮৯

৩৪৯ । হুসনুল আজিজ খ . পৃ . ৪৩৫

৩৫০ । আল ইফাযাত খ .পৃ .৩১৬

হতো। কিন্তু বর্তমানে উস্তাদের প্রতি ছাত্রদের ভক্তি-শ্রদ্ধা মহব্বত ভালোসাবা নেই। যার ফলে ছাত্রদের উপর ইলম ও আমলের রং প্রকাশ পায় না।[৩৫১]

(গ) ছাত্ররা যখন উস্তাদদেরকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, তখন উস্তাদের অন্তরে ছাত্রদের মায়া, মমতা, আদব ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।[৩৫২]

৪. মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহ. ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা এটাই যে, যেই ছাত্র উস্তাদের সাথে বে-আদবি করবে, সে ইলম থেকে মাহরুম হবে।[৩৫৩]

৫. হযরত বলেন, আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামত এবং ইলম থেকে যা কিছু আমাকে দান করছেন তা উস্তাদ এবং বুযুর্গদের সাথে ভক্তি শ্রদ্ধা, মহব্বত ভালোবাসার কারণে।[৩৫৪]

৬. হাদীস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, তুমি যার কাছেই ইলম শিখবে তার কাছে নম্র ভদ্র হয়ে অবস্থান করো। সুতরং উস্তাদের সাথে কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার আচরণে আদবের প্রতি খুব খেয়াল রাখা চাই, যাতে করে তোমার দ্বারা ন্যূন্যতম কষ্টও না পান।

৭. সর্বদা নিজেকে তার খেদমতের জন্য প্রস্তত রাখবে।[৩৫৫]

৮. যদি কখনো উস্তাদ ছাত্রের উপর ক্রোধান্বিত হয়, তাহলে ছাত্র তাৎক্ষণিক তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে এবং তাকে সন্তুষ্টি করবে। কিন্তু বড় আফসোসের কথা হলো, বর্তমানে ছাত্ররা উস্তাদের সামনেই বে-আদবি করে বসে, আবার উস্তাদের ন্যূনতম কঠোরতা বরদাশত করে না। উস্তাদের সাথে বে-আদবি, তার আদব ইহতিরামের প্রতি খেয়াল না রাখার ফলাফল ইলম থেকে মাহরূমী।

৯. যদি কোনো ছাত্রের আজে বাজে প্রশ্ন এবং অশুভ আচারণে উস্তাদ কষ্ট পান তাহলে ছাত্রের জন্য জরুরি হলো, দ্রুত উস্তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

১০. উস্তাদ যদি কোনো সময়ে বিশেষ কারণে কিতাব পড়া অথবা মুতাআলা থেকে বারণ করেন, তাহলে তা ছাত্রের জন্য মানা আবশ্যক।

১১. উস্তাদ যখন তাকরীর করেন, তখন খুব গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনবে, এদিক সেদিক তাকাবে না বা অন্যমনস্ক হবে না।

---

৩৫১ । মাজলিসে হাকিমুল উম্মত পৃ. ২৩৬

৩৫২ । আল ফসল ওয়াল ওয়াসল

৩৫৩ । মালফুজাত খণ্ড ৩. পৃ. ৫০

৩৫৪ । আশরাফুল সাওয়ায়েনেহ খ. পৃ. ৬৩

৩৫৫ । ইসলাহে ইনকিলাব

১২. যে কাজ থেকে উস্তাদ বারণ করবেন, সে কাজ থেকে বিরত থাকবে, তার কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না এবং তাকে কখনো অসম্মানিত করবে না।

মোটকথা, যে ছাত্র উস্তাদের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল করে না, তার ব্যাপারে হজরত থানভী রহ. বলেন যেই তালেবে ইলম দিন রাত কঠোর মেহনত করে, কিন্তু উস্তাদের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির প্রতি তার খেয়াল নেই। এরূপ ছাত্রের ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, সে কখনোই বাস্তবিক ইলম পাবে না। তিনি আরো বলেন, হাকীকি ইলম এবং তাফাক্কুহ ফী-দ্বীন তারই অর্জন হবে, যে মেহনত পরিশ্রম করার পাশাপাশি উস্তাদের রাজি খুশির প্রতি খেয়াল রাখে।[৩৫৬]

১৭.উস্তাদের সামনে বসে হাসাহাসি করবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথাবর্তা বলবে না। অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক তাকাবে না; বরং খুব ধ্যান খেয়ালের সাথে উস্তাদের দিকে মনোনিবেশ করবে।

১৮. যদি কোনো কথা বুঝে না আসে, তাহলে নিজের ত্রুটি মনে করবে, উস্তাদের প্রতি খারাপ ধারণা করবে না।

১৯. তার সামনে অন্যের বিরোধপূর্ণ কথার আলোচনা করবে না।

২০. উস্তাদের কথা বা কাজের ব্যাপারে সর্বদা সাদাসিধে এবং ভালো ধারনা পোষন করবে, যখন সুযোগ হবে, তখন তার সাথে সাক্ষাত করবে। তার কোনো কথা বা কাজকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের করে খারাপ দিকে নিবে না।

২১.যদি কখনো কোনো ভুল ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহলে নিজের ভুল মনে করে নিবে, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করা হলো অহংকারের আলামত।

২২. যখন উস্তাদ থেকে দূরে থাকবে, তখনো তার আদবের প্রতি খিয়াল রাখবে, তার অনুপস্থিতিতে এমন কোনো কাজ করবে না, যা জানতে পারলে তিনি কষ্ট পান।

২৩. যখনই সুযোগ হয় উস্তাদের সাথে যে কোনভাবে যোগাযোগ রাখবে এবং তার জন্য হাদিয়া পাঠিয়ে দিবে।[৩৫৭]

২৪. যদি নিজের দ্বারা উস্তাদের কোনো কিছু ক্ষতি হয় অবাথা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে খুব আদবের সাথে বলে দিবে যে, অসতর্কতাবসত আমার থেকে এ ক্ষতি

---

৩৫৬ । কামালাতে আশরাফিয়া খ ৩ পৃ. ৬৩
৩৫৭ । ফুরুউল ঈমান

সাধিত হয়েছে। না বলে চুপ থাকা অথবা গোপন করার চেষ্টা করার অর্থ হলো, তাকে কষ্ট দেয়া এটা ইখলাস পরিপন্থী, আর হজরত রাসূলুল্লাহ সা. তা থেকে বারণ করছেন। সাহাবায়ে কিরামের জীবনী যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই, যদি কোনো কাজে ভুলবশত অথবা অসতর্কতার কারণে ক্ষতি হয়, তাহলে তারা রাসূল সা. কে জানিয়ে দিতেন। এছাড়াও আরো অনেক আদব এরকম রয়েছে। তবে যারা প্রতিভাবান তাদের জন্য এটুকু লেখাই যথেষ্ট।[৩৫৮]

১. যারা শিক্ষক তারা ছাত্রদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক নিয়ামত। ছাত্রদের জন্য এ মহামূল্যবান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং তার আদব ইহতিরামের প্রতি লক্ষ রাখা খুবই জরুরি, এখারে শিক্ষক দ্বারা তারা সকলেই উদ্দেশ্য যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের পড়ান অথবা মাসআলা মাসায়েল বলে দেন অথবা উম্মাদের ফিকির নিয়ে কিতাবাদি রচনা করেন। এ তিন শ্রেনির লোক থেকে যারাই উপকৃত হবে, তাদের জন্য আদব ইহতিরামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

২. যারা উস্তাদের হক বিনষ্ট করে তারা কয়েক শ্রেণির :

কিছু আছে এমন যারা শিক্ষা অর্জনের সময়ে উস্তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করে না, এরা আবার দুই শ্রেণির -এক. উস্তাদের বাহ্যিক হকলোগুই সে আদায় করে না, যেমন – উস্তাদের সাথে সাক্ষাত হলে তাকে ছালাম দেয় না, তার দিকে পিট দিয়ে বসে থাকে, অথবা উস্তাদের দিকে পা ছড়িয়ে বসে থাকে, অথবা উস্তাদকে দেখে সাইকেল রিকশা থেকে অবতরণ করে না, অথবা তার সামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলে, আওয়াজ করে হাসে।

উস্তাদের অভ্যন্তরীণ হকগুলো আদায় করে না, যেমন – উস্তাদ যে কাজের নির্দেশ দেন, তা উস্তাদের অগোচরে অমান্য করে অথবা তাকে ধোকা দেয়, অথবা তার সামনে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার অগোচরে তার যথাযথ আদব ইহতিরাম না করা ইত্যাদি।

এই দুই ধরনের অপরাধই মারাত্মক, এগুলো থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি। অন্যথায় ইলম আমল উভয় দিক থেকে এমন ছাত্ররা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৫৯]

৩৫৮। হুসনুল আজিজ খ. ৩. পৃ. ৪৮৩

৩৫৯। ইসলাহে ইনকিলাব

৩. আরেক শ্রেণির ছাত্র আছে তারা মোটেও উস্তাদকে আদব ইহতিরাম করে না। যেমন বর্তমান স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাদের মাঝে উস্তাদের মহব্বত-ভালোবাসা বলতে কোনো কিছুই নেই।[৩৬০]

কিছু দুষ্ট প্রকৃতির শিক্ষার্থী আছে তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উস্তাদের আদব ইহতিরাম করে; কিন্তু তা অন্তর থেকে নয়।[৩৬১]

৪. এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, আদব হলো মহব্বত ভালোবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধার নাম। অন্যভাবে বললে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, অন্যকে আরাম পৌঁছানোর নাম হলো আদব, অর্থাৎ যাতে করে আমার দ্বারা মানুষের কষ্ট না হয় সেই দিকে খুব খেয়াল করা, শরীয়ত বাহ্যিক এবং লৌকিকতার ভালোবাসা থেকে বারণ করেছে, তবে মহব্বত ভালোবাসার তা'লিম দিয়েছে, যা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল দিক থেকে সমপর্যায়ে হবে।[৩৬২]

ঞ ঞঞ ঞ

[৩৬০] । ওয়াজে আহকামুলজাহ

[৩৬১] । ওয়াজে আহকামুল জাহ

[৩৬২] । কামালাত পৃ. ১৫৯

অধ্যায়-২৮

শায়েখের আদবসমূহ

১. ইসলাম এবং ইসলামের সকল বিধি-বিধানের উপর আমল করো এবং সেগুলোকে নিজের পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণ হিসাবে জানো, বিশেষভাবে ইসলামের এই বিধান (অর্থাৎ নিজের জন্য এক জন মুরুব্বী বা শায়েখ বানিয়ে নাও) এর উপর খুব গুরুত্বের সাথে আমল করো, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, মোট কথা সকল বিষয়ে তাকে অনুসরণীয় হিসাবে দেখবে। অনুসরণীয় বানানোর অর্থ এই নয় যে, কাজগ কলমে লম্বা লম্বা উপাধি লেখা, নাম নেয়ার সময় বড় বড় কিছু গুণের নাম উচ্চারণ করা। বরং অনুসরণীয় বানানোর অর্থ সকল বিষয়ে তাকে মানা। তিনি যে কাজের নির্দেশ দিবেন তা বাস্তবায়ন করা। আর যা থেকে বারণ করবেন তা থেকে বিরত থাকা।[৩৬৩]

২. প্রতিটি লোকের জন্য জরুরি হলো তারা কাউকে না কাউকে মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করবে।[৩৬৪]

৩. সকল ক্ষেত্রে সফলতার জন্য শর্ত হলো, নিজেকে কোন বুযুর্গ আল্লাহওয়ালার কাছে সমর্পণ করা। সকল ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণীয় বানিয়ে নেয়া। নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনুকরণ ছেড়ে দেয়া। আর নিজেকে শায়েখ বা মুরুব্বীর কাছে সমর্পণ করে তিনি যে কাজের নির্দেশ দিবেন তা করবে আর যেই কাজ থেকে বারণ করবেন তা থেকে বেঁচে থাকবে।

৪. অন্তর পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে একজন শায়েখ ও মুরুব্বীর ভুমিকা হলো এমন, যেমন শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা। বরং আমি মনে করি ডাক্তার থেকে শায়েখের ভুমিকা অনেকগুণে বেশি। কারণ রুহানী বা আধ্যাতিক মুরুব্বী যা করেন ডাক্তার তা করেন না। এজন্য যে, মুরুব্বী মানুষের সম্পর্ক করে দেয় আল্লাহর সাথে, আর এটাই জীবনের মূল লক্ষ্যও উদ্দেশ্য।

৫. শায়েখের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া সামনে এক কদম বাড়াও বড় ভয়াবহ। একজন শায়েখের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা খুবই জরুরি। নিজের

---

৩৬৩ । আল ইফাযাত খ.২ পৃ.১২

৩৬৪ । মালফুজাত

সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা শায়েখের কাছে সোপর্দ করা এবং তার নির্দেশ মতো সকল কাজ বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী।[৩৬৫]

৬. মুরুব্বী যেই কাজের নির্দেশ দিবেন সেই কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে, তার নির্দেশের উপর কোন আপত্তি জানাবে না। অন্যথায় বাস্তব জিনিস অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকবে। মুরুব্বী কোন কাজের নির্দেশ দেয়ার পর অন্য কোন নির্দেশকে কল্যাণ মনে করা খুবই ক্ষতিকর। তবে হ্যাঁ সকল মুরুব্বীর প্রতি আদব ইহতিরাম এবং তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি।[৩৬৬]

৭. শায়েখের যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা, মহব্বত- ভালবাসা থাকবে তার থেকে ঐ পরিমাণ উপকৃত হওয়া যাবে।[৩৬৭]

৯.তুমি যাকে মুরুব্বী হিসাবে নির্বাচন করবে তার সাথে কখনো মতবিরোধে লিপ্ত হবে না। এটা আদব পরিপন্থী।[৩৬৮]

১০. মানুষেরা যাকে বড় মনে করে, সে যদি বাস্তবে বড় নাও হয়, তারপরেও তার লিখিত কাগজের টুকরার উপর কোন কিছু লেখা আদবের পরিপন্থী।[৩৬৯]

১১. বড়দের কাছে যে সমস্ত চিঠি-পত্র লেখা হয়, সেগুলোতে কবিতা লেখা আমি আদব পরিপন্থী বলে মনে করে থাকি। তবে হ্যাঁ আবেগের বশবর্তী হয়ে যদি দু-একটা লেখার মাঝে চলে আসে তাহলে তা ভিন্ন কথা। ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, তার মূল উদ্দেশ্য ছুটে যায়। অথবা নিজের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। যা নিজ শায়েখের কাছে করা আদব পরিপন্থী।[৩৭০]

১২. যাকে লোকজন বড় মনে করে এবং তুমি তাকে নিজের জন্য মুরুব্বীও বানাতে চাও, তার সামনে তাসবীহ নিয়ে কখনও বসবে না। কারণ এটা বাস্তবতায় আদব পরিপন্থী।[৩৭১]

১৩. শায়েখের সামনে নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করা এবং যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো আদব পরিপন্থী, যদিও তা ইলমী বিষয়ে হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ বললো আমি ইফতা পড়েছি, ইত্যাদি।[৩৭২]

---

[৩৬৫] । আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ ৬৬৮
[৩৬৬] । আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ . ৩১৪
[৩৬৭] । হুসনুল আজিজ খ. ৮ পৃ . ২৮১
[৩৬৮] । আনফাসে ঈসা খ. ২ পৃ . ১৮৮
[৩৬৯] । আনফাসে ঈসা খ. ২ পৃ . ৫৫
[৩৭০] । আল ইফাযাত খ. ১ পৃ . ১৭৮
[৩৭১] । হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ . ১৭৪

১৪. জনগণ বড় মনে করে তাই জায়গা বেজায়গায় জনসম্মুখে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো বড় মন্দ স্বভাব। এ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।[৩৭৩]

১৫. উলামায়ে কিরামদের বলছি, দ্বীনের উপর আমল করার সুযোগ হয় বুযুর্গদের ইজ্জত-ইহতিরাম করার কারণে, অর্থাৎ তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালবাসা অন্তরে থাকলে দ্বীনের উপর আমল করতে অন্তরে আগ্রহ জন্মে। এজন্য যথা সম্ভব বুযুর্গদের ইজ্জত-সম্মান করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠানো এবং তাদের ছোট করা থেকে বেঁচে থাকবেন।[৩৭৪]

১৬. বুযুর্গদের সম্মান করার কারণে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। ঈমান মজবুত হয় এবং আমলে আগ্রহ জন্ম নেয়।[৩৭৫]

১৭. আমি আমার জীবনে কোন বুযুর্গকে এক মিনিটের জন্যও অসন্তুষ্ট করিনি। বুযুর্গানে দ্বীনের মহব্বত-ভালবাসা আদব, ইহতিরাম যে পরিমাণ আমার অন্তরে আছে এ পরিমাণ মহব্বত-ভালবাসা ও আদব-ইহতিরাম ওয়ালা লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য।[৩৭৬]

১৮. যে জায়গায় বুজুর্গদের নাম নেয়ার কারণে কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় সে জায়গায় কখনও আমি বুযুর্গদের নাম উল্লেখ করি না। বরং তার সম্পর্ক নিজের সাথে করে দেই। সর্বদা এই খেয়াল রাখি যে, যাতে করে বুযুর্গদের উপর যেন কোন দোষ-ক্রটি না আসে,যা আসার তা আমান উপর আসুক। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা পরিপুর্ণ তার ইল্টা। নিজে পুত-পবিত্র হয়ে দোষ-ক্রটির সম্পর্ক করে বুযুর্গদের সাথে, যা মূলত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা ও আন্তরিকতা না থাকার প্রমাণ।[৩৭৭]

১৯ .যদি কেউ তোমার সামনে কোনো বুযুর্গের দোষ-ক্রটির কথা আরম্ভ করে, তাহলে খুব নরম ভাষায় তাকে বলে দাও যে, ভাই এগুলো আলোচনার কারণে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। এগুলো নিয়ে আমার সামনে আলোচনা করবেন না। এ পথ অবলম্বন করার মাঝেই মঙ্গল।[৩৭৮]

---

[৩৭২] । আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ . ৭
[৩৭৩] । আল ইফাযাত খ. ৪ পৃ . ৭
[৩৭৪] । আল ইফাযাত খ. ১ পৃ . ২৫৫
[৩৭৫] । আল ইফাযাত খ. ৪৩পৃ . ২৮৬
[৩৭৬] । আশরাফুস সাওয়ানেহ পৃ.৬৩
[৩৭৭] । আল ইফাযাত খ. ৫পৃ . ৩
[৩৭৮] । হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ . ৩৬৯

২০. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নামই হলো তাকওয়া, তবে এর পাশা-পাশি আমি আরও একটি বিষয়ে যোগ করি তা হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে বুযুর্গদের আদব ইজ্জত-ইহতিরামও সম্মান করা।

২১. এক ব্যক্তি প্রবাহমান পানি থেকে অযূ করা অবস্থায় জানতে পারল যে, তার বাম পাশে বসে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. অযূ করেছেন, আর তার ব্যবহৃত পানি তার দিকে যাচ্ছে। তিনি এই কাজ কে বেয়াদবি মনে করে তার আদবের খাতিরে ইমাম সাহেবের বাম পাশে এসে বসলেন। এতটুকু আদবের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আদব বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তার প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

২২. রশিদ আহমদ গাংগুহী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামকে অপমানিত করে অথবা তাদের উপর অনর্থক আজে-বাঝে অভিযোগ করে আল্লাহ তায়ালা কবরের মাঝে তার চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, যদি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে যে ব্যক্তি এরূপ করেছে, তার কবর খুলে তোমরা দেখ।[৩৭৯]

ജ ❁ ഇ

[৩৭৯]। কামালাত পৃ ৭০

অধ্যায়-২৯

বড়দের পালনীয় আরো কিছু আদব

আদবঃ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বড় করে, তাদের স্বভাব এমন খিটখিটে না হওয়া চাই যে, কথায় কথায় মানুষের উপর চড়াও হয় অথবা রেগে যায়। একথা তো সুনিশ্চিত যে, যেরূপভাবে মানুষেরা আপনার স্বভাব পরিপন্থী কাজ করছে, এমনিভাবে আপনি যদি আপনার মুরুব্বীর সাথে অবস্থান করেন এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আপনার কাছ থেকেও তার মেজাজ পরিপন্থী কোন কাজ প্রকাশ পেত একথা মনে করে আপনি জনগণের উপর সদয় হোন। তাদের থেকে যদি অনাকাঙ্খিত বা ইচ্ছাপূর্বক আপনার মেজাজের পরিপন্থী কোন কাজ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে নম্র ভাষায় একবার দু'বার বুঝান। এরপরেও যদি কাজ না হয় এখন তার সংশোধনের জন্য কিছুটা কঠোরতা করার সুযোগ আছে। তবে এক্ষেত্রে কঠোরতা না করে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। কারণ যদি মোটেও ধৈর্য না ধরেন তাহলে ধৈর্য ধারণের যেই ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। আরও খুব ভালো করে স্মরণ রাখবেন, যাদের কে আল্লাহ তাআলা বড় বানিয়েছেন তাদের কাছে বিভিন্ন শ্রেনি-পেশার লোকজন যাওয়া-আসা করবে। তাদের স্বভাব-বুঝ-বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন হবে, যখন তারা আপনার কাছে আসবে তখন তাদের সাথে নম্র-ভদ্রভাবে মিলিত হবে এবং রূঢ় আচরণ থেকে বেঁচে থাকবেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে –

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ خَالَطَ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ

অর্থ ঃ যে মুমিন জনসাধারণের সাথে মিশে এবং তাদের ভুল-ক্রটির উপর ধৈর্য ধারণ করে সে উত্তম ঐ মোমিন থেকে, যে জনসাধারণের সাথে মিশে না এবং তাদের ভুল-ক্রটিগুলোকে মার্জনার দৃষ্টিতে দেখে না।

আদবঃ যদি কারও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হও অথবা তার অবস্থা দেখে তোমার প্রবল ধারণা হয় যে, তুমি কোন কিছুর আবেদন করলে সে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করবে, তাহলে তার কাছে কখনোই এমন কোন কাজের আবেদন করবে না, যে কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে তার উপর ওয়াজিব নয়।

আদব: যদি কারো কাছে আবেদন ছাড়াই আপনার কাছে আর্থিক বা শারীরিক বিষয়ে খিদমতের জন্য আসে, তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেদমত গ্রহণ করবেন না। যদি সে আপনাকে খাবারের জন্য দাওয়াত করে তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার রান্না করা থেকে বারণ করবেন। অথবা আপনার সাথে আরো অনেক লোক-জনকে দাওয়াত না দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

আদব: যদি ইচ্ছাপূর্বক অথবা ঘটনাক্রমে কারো উপর অসন্তুষ্ট হও তাহলে পরবর্তীতে অন্য কোন সময়ে সন্তুষ্টচিত্তে তার সাথে মিলিত হও। যদি বাস্তবতায় তোমার থেকে বাড়া-বাড়ি হয়ে যায় তাহলে নিঃসংকোচে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। এতে কোন লজ্জা শরম করবে না।

আদব: যদি কারও কথায় তোমার রাগের উদ্রেক হয়, তাহলে তার সাথে কথা বন্ধ করে দাও এবং অন্য আরেক জনের সাথে ভিন্ন কোন আলাপ শুরু করে দাও। তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

আদব: নিজ খাদেম বা নিকট আত্মীয়কে এত ঘনিষ্ট বানাবে না যে, মানুষেরা তার কাছে তোষামোদ শুরু করে দেয়, অথবা সে তোষামোদের বস্তুতে পরিণত হয়। এমনি ভাবে সে যদি কারো ব্যাপারে তোমার নিকট কোন কিছু বলে অথবা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, তাহলে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিবেন। তা নাহলে মানুষ তাকে ভয় করবে এবং তোমার ব্যাপারে মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। এমনি ভাবে সে যদি কারো ব্যাপারে তোমার নিকট সুপারিশ করে, তাহলে কঠিনভাবে বারণ করবে। যাতে করে মানুষ তাকে তোমার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম মনে করে তোষামোদ এবং হাদিয়া দিতে আরম্ভ না করে।

মোট কথা : সকল মানুষের সম্পর্ক হবে তোমার সাথে। যোগাযোগ বা সাক্ষাতের জন্য কাউকেও মাধ্যম বানাবে না। তবে হ্যাঁ নিজের খেদমতেন জন্য দু-একজনকে নির্ধারণ করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে মানুষের সাথে লেন-দেনের ব্যাপারে তাকে কোন ধরনের হস্তক্ষেপের সুযোগ দিবে না। এমনিভাবে মেহমানদের মেহমানদারীও নিজেই করবে, নিজেই তার দেখাশুনা করবে, এতে করে তোমার কিছুটা কষ্ট হলেও মেহমান তো আরাম পাবে। এ ব্যাপারে কবি বলেছেন:-

ان روز که مه شدی نمی دانستی * کانگشت نمائے عالمے خواهی شد

অর্থ:- যে দিন আল্লাহ তাআরা তোমাকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন সে দিন তোমার এ কথাও জেনে নেয়া উচিৎ ছিলো যে, এখন থেকে তুমি মানুষের আসা-যাওয়ার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে।

বড়দের আরো কতিপয় আদব

১. অনেক লোক এমন আছে যারা নিজেদের বড় মনে করে অন্যদের প্রতি মোটেও খেয়াল রাখে না। যার কারণে তার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। এতে অনেক অনেক বড় বড় লোকেরাও আক্রান্ত। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।[৩৮০]

২. যদি বড়রা ছোটদের উপর সদয় না হয়ে বড় হওয়ার কারণে অহংকার-অহমিকা করতে আরম্ভ করে এবং সর্বত্র তার বড় হওয়ার ভাব প্রকাশ করতে শুরু করে তাহলে সে দিন দিন নিচে নেমে আসে।[৩৮১]

৩. অন্যের খাদেমকে কখনোই আমি নিজ থেকে কোনো কাজের নির্দেশ দেই না। যদি একান্ত কোন কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে খাদেমকে কাজের নির্দেশ দেই। যদিও সেই খাদেমের মালিক আমার অধীনেই থাকুক না কেন? এতে কাজের মাঝে সুশৃঙ্খলতা ঠিক থাকবে।[৩৮২]

৪. যদি দুই জন ব্যক্তিকে আমি কোন কাজের জন্য পাঠাই তাহলে দুজনকে পৃথক পৃথকভাবে রাস্তার খরচা দিয়ে দেয়, যাতে একে অপরের মুখাপেক্ষী না হয়।[৩৮৩]

৫. যেমনিভাবে ছোটরা বড়দের মুখাপেক্ষী এমনিভাবে অনেক সময় বড়রাও ছোটদের মুখাপেক্ষী হয়। আর তা এভাবে যে, অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, যেই বিষয়ে ছোটরা পারদর্শী ঐ বিষয়ে বড়রা অজ্ঞ, অথবা ছোটকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করানো সম্ভব হয় যা বড়দের দ্বারা সম্ভব হয় না। এজন্য বড়রা খুব খেয়াল রাখবে, কখনোই ছোটদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না।[৩৮৪]

৬. تَوَاصَوا এটি বাবে تَفَاعُل থেকে। বাবে তাফাউলের বৈশিষ্ট হলো مُشَارَكَت মুশারাকাত বা পরস্পরের কোনো কাজে শরীক হওয়া। এর অর্থ হলো একজন আরেকজনকে শরীয়তের কথা বলবে। বড়রা ছোটদের আর ছোটরা বড়দের। কুরআনও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দ ব্যবহার করে বড়দের সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের কে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমনিভাবে তোমরা ছোটদের উপদেশ দাও, হেদায়েতের বাণী শোনাও, তেমনিভাবে ছোটদেরও অধিকার আছে, তোমাদেরকে ভাল কথা বলার। এখন ছোটরা বড়দেরকে কোনো

---

[৩৮০]। আল ইফাযাত খ. ৩পৃ. ৩১৫
[৩৮১]। আনফাসে ঈসা খ. ১ পৃ. ৫৭৭
[৩৮২]। আল ইফাযাত খ. ৩পৃ. ১৪
[৩৮৩]। আল ইফাযাত খ. ৪পৃ. ৫৮৪
[৩৮৪]। আল ইফাযাত পৃ. ৫৮৪

ভালো কথা বললে সেটাকে বে-আদবি মনে করার কোন সুযোগ নেই; বরং বাস্তবতাকে মেনে নেয়া চাই।[৩৮৫]

৭. নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ ছোটদের সাথেও করা অন্যায়। এমনিভাবে যারা ছোট তারাও লক্ষ্য রাখবে,তাদের থেকে যেন এমন কোন আবেদন প্রকাশ না পায়, যার কারণে বড়দের অন্তর ব্যথিত হয়। বড়রাও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবে যাতে করেতার কোন কাজের কারণে ছোটরা কষ্ট না পায়। এ বিষয়ের প্রতি বড়-ছোট কেউই খেয়াল করে না যে, আমার দ্বারা অন্যের কষ্ট হচ্ছে না তো? নিজের হীন ইচ্ছা পূরণের জন্য যা ইচ্ছা তাই করছে, কারো ক্ষতি হলো নাকি লাভ হলো সেদিকে তাকানোর সময় কোথায়। যদিও সেই কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় হোক না কেন।[৩৮৬]

৮. একজন কামেল শায়েখ তো সেই যে তার নিকট আগমনকারীকে শান্তনার বাণী শোনাবে, তার নৈরাশ্যের কথা দূর করে, তাকে আত্মপ্রশান্তি দান করবে,আমি আমার শায়েখ ও মুর্শিদ হযরত গাংগুহী রহ.-কে দেখেছি মানুষেরা ব্যথিত অন্তরে ক্রন্দনরত অবস্থায় তার কাছে যেতেন, আর হাসতে হাসতে ফিরতেন।[৩৮৭]

৯. বর্তমান দায়িত্বশীল লোকেরা পরিবার-পরিজনের দায়িত্বের ব্যাপারে এক বারেই উদাসীন। যারা দায়িত্বশীল তারা কেবল শাসন করতে জানে। কিন্তু তাদের উপর আল্লাহ তাআলা কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা জানে না। মুআমালাত-মুআশারাত তথা লেন-দেন, সামাজিকতাকে দীনের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়েছে, সমাজের দায়িত্বশীলগণ একেবারে সবচেয়ে বেশি উদাসীন।

এই উদাসীনতার মূল কারণ হলো তারা দ্বীন থেকেই বে-পরোয়া হয়ে গতানুগতিক চলছে। তারা এসমস্ত বিষয়ে মোটেও ফিকির করে না। আমি ফতওয়া দিচ্ছি না। তবে আমার জরুরি পরামর্শ হলো যে, ঘর পরিচালনার দায়িত্ব হয়তোবা স্ত্রীর হাতে রাখবে, অথবা নিজের হাতে রাখবে। পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে ঘরের দায়িত্ব দিবে না। চাই সে মা-বাবা, ভাই-বোন, যেই হোক না কেন। কারণ এর ব্যত্যয় ঘটলে অনেক সময় স্ত্রীরা নির্যাতিতা হন। আর যদি কোন কারণে স্ত্রীকে ঘরের দায়িত্ব দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে নিজের

---

[৩৮৫] । ওয়াজুল ওয়াক্ত পৃ.১১
[৩৮৬] । আল ইফাযাত খ. ১ পৃ. ১০৩১
[৩৮৭] । আল ইফাযাত খ. ২ পৃ. ৬৮

হাতেই পূর্ণ দায়িত্ব রাখবে। এটাই সবচেয়ে ভালো, স্ত্রীর হক শুধু ভাত-কাপড় দেয়াই নয়। বরং তাকে খুশি রাখা সান্ত্বনা দেয়াও একজন আদর্শ স্বামীর দায়িত্ব। একটু লক্ষ্য করুন ফুকাহায়ে কেরামগণ স্ত্রীকে খুশি রাখার ব্যাপারে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা এ কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য কৌশলের সাথে অবাস্তব কিছু কথা ও বলা জায়েজ আছে। এর দ্বারা বুঝে আসে যে কি পরিমান গুরুত্ব দিয়েছেন স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে খুব সহজেই অনুমেয় হয় যে, স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ হক ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৮৮]

১০. যে সমস্ত লোকজন নিজেকে দ্বীনদার মনে করে, কিন্তু নিজের অধিনস্তদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে না তারা বাস্তবতায় তো দ্বীনদার নয়, বরং দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, মূর্খ যদিও সে নিজেকে দ্বীনদার দাবি করুক না কেন?।[৩৮৯]

আমি এই আদবের কিতাবটি অনিয়মতান্ত্রিক কিছু আদবের মাধ্যমে সমাপ্ত করলাম, তবে এটি খুব ভালো করে স্মরণে রাখা দরকার যে, এ কিতাবে যে আদবগুলোর আলোচনা এসেছে, তা দুভাগে বিভক্ত–

এক. কিছু আদব আছে এমন যেগুলো ব্যাপক অর্থাৎ যে গুলো সকল শ্রেণির লোকদের জন্য সর্ববস্থায় জরুরি।

দুই. কিছু আদব এমন আছে, যে গুলো সকল শ্রেণির লোকদের জন্য সর্ববস্থায় জরুরি নয়। কখনো প্রয়োজন হয় আবার কখনো প্রয়োজন হয় না।তবে সে গুলো নির্বাচন এবং নির্ধারণ করার দায়িত্বভার আমার এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে এমন একটি কবিতা উল্লেখ করলাম যার সম্পর্ক ব্যাপক এবং বিশেষ উভয় ধরনের আদবের সাথে।

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اَدَابٌ * اَدِّبُو النَّفْسَ اَيُّهَا الأَصْحَابُ

অর্থ ঃ ভালোবাসার সকল পন্থা অর্জন করার নামই হলো আদব। অতএব হে ভালোবাসার অনুসন্ধানকারী, তুমি তোমার অন্তরকে বাহ্যিক আদবের দ্বারা সুসজ্জিত করো।

ഇ ❦ ര

---

[৩৮৮] । হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ২৬৪

[৩৮৯] । হুসনুল আজিজ খ. পৃ. ১২৯

অধ্যায়-৩০

থানভী রহ. এর মাওয়ায়েজ ও মালফুজাত থেকে সংযোজিত

শরীয়তের মৌলিক বিষয় পাঁচটিঃ

১. আক্বীদাসমূহ, যেমন- আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

২. ইবাদতসমূহ, যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি।

৩. মু'আমালাত (লেনদেন) যেমন- ক্রয়, বিক্রয়, নিয়ম, শৃঙ্খলা ইত্যাদি।

৪. আখলাক (আচার-আচরণ) যেমন, নম্রতা, দানশীলতা ইত্যাদি।

৫. হুসনে মু'আশারাত (সুন্দর সামাজিকতা) অর্থাৎ অভ্যাস, চাল-চলন, উদাহরণস্বরূপ কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট এমন কোনো কাজ বা আচরণ না করা, যার দ্বারা তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে, আর ঘুম থকে জাগ্রত হয়ে তার কষ্ট হয়।

এ পাঁচটি জিনিসের সমষ্টি হলো শরীয়ত। পৃথক-পৃথকভাবে কোনো একটির নাম শরীয়ত নয়। যে পরিপূর্ণ মুসলমান হবে, তার জন্য আবশ্যক হলো, এই পাঁচটির প্রত্যেকটিকে সমভাবে গুরুত্বারোপ করবে, কোনো একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিবে না।

বর্তমানে মুসলমানগণ শরীয়তকে আরো সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং শরীয়তের মৌলিখ বিষয়কে পাঁচের কোটায় সীমাবদ্ধ রাখেনি। কেউ তো শুধু আকায়েদকে শরীয়তের মূল বিষয় মনে করছে, আর তারা বলছে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়বে সে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও সে শাস্তির সম্মুখীন হোক না কেন? এরপর নামায, রোযার বা অন্য কোনো ইবাদতের আর কি প্রয়োজন আছে?

এদলের বিশ্বাস হলো, আক্বীদা ছাড়া শরীয়তের অন্য যে মৌলিক বিষয় রয়েছে, সেগুলো ফরজ ও অত্যাবশ্যকীয়। তবে আমলের সুযোগ হয় না। দুনিয়ার বিভন্ন ব্যস্ততা ও পেরেশানির মাঝে আক্বীদা ছাড়া অন্যান্য অংশের উপর পরিপূর্ণভাবে

আমল করা এবং তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব নয়। আরেকদল আছে তারা আক্বীদার পাশাপাশি নামায, রোযাসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমলের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখে। তবে মুআমালাত তথা লেনদেনের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। এসবের প্রতি তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না, তা কি বৈধ পন্থায় সংঘটিত হচ্ছে, নাকি অবৈধ পন্থায়। আয়-রোজগার ও কামায়ের মাঝে মোটেও হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না।

আবার অনেকে আছে তারা নিজেদের মুআমালাত তো ঠিক করে নিয়েছে, কিন্তু তাদের আচার-আচরণ, চলা-ফেরার প্রতি মোটেও খেয়াল নেই। কখনোই এদিকে খেয়াল করে না যে, আমার আচার-ব্যবহারের দ্বারা অন্য মানুষ কষ্ট পাচ্ছে কিনা? আমার রূঢ় স্বভাবের কারণে অন্যের মন ব্যথিত হচ্ছে কিনা? যা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ।

স্বল্প সংখ্যক লোকই এমন আছে, যারা এ বিষয়টির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং এ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি নিজের দৃষ্টি নিবন্ধ করে। বরং তো এমন লোক অনেক আছে যারা অন্যের সংশোধনে ব্যস্ত, অন্যের সংশোধনের পিছনে বছরকে বছর ব্যয় করছে, অথচ তার নিজের মাঝেই সেই দোষ-ত্রুটিগুলো বিদ্যমান, আর তার সেই আচরণে মানুষ সর্বদা কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথিত হচ্ছে।

নিজের অবস্থার উপর সে মোটেও বা-খবর নয় এবং সামান্যতম তার নিজের প্রতি পরিতাপও নেই যে, আমার দ্বারা অন্যের কষ্ট হচ্ছে, আমার আচার-আচরণ চলাফেরার কারণে তারা ব্যথিত হচ্ছে। এরকম তো অনেক আছে যে, তারা রাস্তায় যদি কোনো গরিব মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে নিজে তো সালাম দেয় না, বরং তার সালামের অপেক্ষায় থাকে।

আরেক দল লোক এমন আছে, যারা আকায়েদ ও আমালের পাশাপাশি নিজেদের আচার-আচরণের প্রতিও সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে এবং সেগুলোকে তারা খুব গুরুত্বের সাথে সংশোধন করে। কিন্তু সামাজিকতার প্রতি তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না। শুধু তাই নয়, তারা দীনের এই মৌলিক বিষয়কে শরীআতের অন্তর্ভুক্তই মনে করেন না। তারা বলে এবং মনে মনে ধারণাও করে এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক বিষয়। এর সাথে শরীআতের কি সম্পর্ক, আমাদের পারস্পরিক কাজে যেটাকে ইচ্ছা সেটাকে আমরা সামাজিকতা বলে বিবেচনা করব, আর যেটাকে ইচ্ছা সেটাকে অসামাজিকতা বলে বিবেচনা করব। এতে শরীআতের কোনো কিছু বলার সুযোগ নেই।

আমাদের সমাজে এরূপ লোকও আছে, যারা দ্বীনদারী ও ধার্মিকতার বিষয়ে অনেক অগ্রগামী এবং আচার-ব্যবহারসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে অনেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, কিন্তু সামাজিকতার ব্যাপারে মারাত্মক উদাসীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছোট ছোট কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার মাঝে মোটেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে না যে, তার সে ছোট কাজ বা কথার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়। অনেক সময় ছোট ছোট কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যের্ এই পরিমাণ কষ্ট হয়, সাধারণত তার থকে বড় কাজের মাধ্যমেও ঐ পরিমাণ কষ্ট হয় না। কিন্তু তার ঐ দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই।

অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সা. এমন সকল ছোট ছোট কারজ বা কথা, যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয় সেগুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন।

তাই একজন সঠিক এবং পরিপূর্ণ মুসলমানের দায়িত্ব হলো সে যেমনিভাবে দ্বীন বা ধর্মের অন্য বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, ঠিক তেমনিভাব নিজের শুভ পরিণামের জন্য মুআশারাত বা সামাজিকতার প্রতিও খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।[৩৯০]

মু'আশারত বা সামাজিকতা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা সাব্যস্ড় হলো যে, মুআশারাত তথা সামাজিকতা দীনের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্য থেকে অন্যতম একটি বিষয়, দ্বীন বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। এজন্য স্মরণ রাখা দরকার পরিপূর্ণ মুসলমান তো সেই, যে দীনের এই মৌলিক পাঁচটি বিষয়কে সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করবেন, একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিবেন না এবং কোনোটাকে ছেড়ে দিবেন না।

একজন মুসলমান হিসেবে সব অংশের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করবেন, কোনো কাজেই অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না।[৩৯১]

মু'আশারাত বা সামাজিকতা দীনের অন্তর্গত বিষয়

সাধারণ মানুষেরা মুআমালাত-মুআশারাতকে দীনের বহিরাগত বিষয় বলে মনে করে থাকে, অথচ বাস্তবতায় সেগুলো দীনের বাইরের কোনো কিছু নয়, বরং দীনেরই অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে তারা মুআমলাত মুআশারাতকে দ্বীন থেকে পৃথক করে থাকে শুধু আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে, সরকারি বা পার্থিব বিধানের ক্ষেত্রে সেগুলোকে আলাদা বা পৃথক করে না।

---

[৩৯০] । তাসহীলুল মাওয়ায়েজ খণ্ড ৪ পৃ. ১৬৪

[৩৯১] । হুসনুল আজিজ খণ্ড ৪ পৃ. ৪৬৯

কখনোই তারা সরকারকে এ কথা বলে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আপনারা মাথা ঘামান কেন? এগুলো তো আপনাদের বিষয় নয়, আমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করব, আপনারা আমাদের রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরোধী কিছু করলে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এবং রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কাজে জড়িত হলে, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন। বাকি যা কিছু রয়েছে সেগুলো আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়, এজন্য ব্যবসা এরকম কথা সরকারকে বলেছে, কখনোই বলিনি। শুধু দীনের ক্ষেত্রে তাদের যতসব ওজর-আপত্তি।[৩৯২]

সুন্দর মু'আশারাত সুন্দর মু'আমালাত থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ

সামাজিকতার গুরুত্ব লেনদেনের তুলনায় অনেক বেশি এবং তার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপক। কারণ সুন্দর লেনদেনের দ্বারা বেশি থেকে বেশি মানুষের মালের সংরক্ষণ হয়, আর সুন্দর সামাজিকতার দ্বারা মুসলমানের কৃলবের সংরক্ষণ হয়। আর এ কথা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মাল থেকে অন্তরের সম্মান অনেক অনেকগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এমনিভাবে পরিশুদ্ধ সামাজিকতার কারণে দিলের পাশাপাশি অন্যের ইজ্জত-সম্মানেরও হিফাজত হয়, আর মানুষের ইজ্জতের হিফাজত করা অত্যন্ত জরুরি এবং ঈমানের পরই তার স্থান। কেননা প্রত্যেক মানুষই তার ইজ্জতের হিফাজতের জন্য সকল কিছু কুরবানি করে থাকে। হাদীসের মাঝেও মানুষের তিনটি জিনিসের হিফাজতের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তাই তো রাসূল সা. বিদায় হজ্বে সমবেত সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের ইজ্জত, কিয়ামত পর্যন্ত হারাম।[৩৯৩]

ইসলামী সামাজিকতা অতুলনীয়

ইসলাম মানুষকে যে সামাজিতা শিক্ষা দিয়েছে এবং মুসলামনদের জন্য যে আচার-আচরণ প্রণয়ন করেছে, তার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যাবে না। এরপরেও আবার ইহুদী-খ্রিস্টানদের সামাজিকতা তালাশের আমাদের আর কি প্রয়োজন? মুআশারাত তো ঐ কাজকে বলে না, যার মাঝে লৌকিকতা থাকে এবং তাকাব্বুর ও অহংকারের আসবাব একত্রিত হয়।

---

৩৯২ । ইসলাহুল মুসলিমীন পৃ.৫৫
৩৯৩ । ইসলাহুল মুসলিমীন

কেননা লৌকিকতা আর অহংকার সামাজিকতার মূলকে নষ্ট করে দেয়, এজন্য যে, অহংকারী সে তো নিজেকে সর্বদা অন্যের থেকে বড় মনে করে থাকে, সে সর্বদা নিজেকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়, আর মনে মনে ভাবতে থাকে আমিই তো সবচেয়ে বড়, আমার থেকে বড় আর কে আছে? তার এ মনোভাব কখনোই অন্যের সাথে সমতা সৃষ্টি করতে দেয় না। নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্যও দিতে দেয় না।

ইসলাম মানুষদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং মানবজাতিকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছে যে, তুমি নিজের মাঝে সহশীল ও নমনীয়তার গুণ পয়দা কর। আর এ কথা পরীক্ষিত যে সহনশীল ও নমনীয়তা ছাড়া মানবজাতির মাঝে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না, যা মুআশারাত বা সামাজিকতার মূল বিষয়। প্রকৃত মুআশারাত তো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা গোষ্ঠীর মাঝে অবর্তমান। উদাহরণস্বরূপ খাবারের ব্যাপারে ইসলাম এই সামাজিকতা শিক্ষা দেয় যে, রাসূল সা. হাদীসে বর্ণনা করেছেন এব বাস্তব আমল করেও দেখিয়েছেন, ইরশাদ হয়েছে-

أَنَا أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ

"আমি সেভাবে খাবার ভক্ষণ করি যেভাবে একজন গোলাম তার মনিবের সামনে খাবার ভক্ষণ করে।"

এই তো ইসলামের সামাজিকতা, খাবার খেতে একজন মানুষের অবস্থা কেমন হতে হবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত রাসূলে আকদাস সা.-এর সারা জীবনের অভ্যাস ছিল, তিনি খাবারের সময় নিজেকে খাবারের দিকে অনবত করে, আগ্রহ ভরে দ্রুত খাবার খেতেন, আর আমাদের অবস্থা তার বিপরীত। আমরা খাবারের সময় অত্যন্ত শান-শওকতে টেবিলে চেয়ারে বসে দীর্ঘ সময় ধরে খাবার খেতে থাকি। এই অহমিকা আর দাম্ভিকতা তো কেবল বাস্তবতা প্রকাশ পাওয়া অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত।

যখন আমার আপনার সামনে বাস্তবতা প্রকাশিত হবে, তখন বোঝা যাবে যে, এই খাবার তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য অনেক বড় এক নিয়ামত। সে রাব্বুল আলামীন এ নিয়ামত আমাকে দান করেছেন এবং তিনি আমাকে দেখছেন। সুতরাং তার এই নিয়ামত ভক্ষণ করার সময় তার ও তার প্রিয় রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

রাসূলের বাতলানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করা বড় ধরনের অন্যায়। সারকথা হলো, সবকিছু করা তখনই সম্ভব হয় যখন ঐ জিনিসের মহব্বত আর আজমত আমার আপনার অন্তরে পয়দা হয়।

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই নির্দেশের পিছনে কি হিকমত লুক্কায়িত তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও তার রাসূরই ভালো জানেন। আমাদের চোখে সেই বাস্তবতা ও হিকমত অবলোকন করার শক্তি নেই, যদি বাস্তবতা অবলোকনের শক্তি আমাদের চোখে থাকত, তাহলে আমি আপনিও সেই নির্দেশই প্রদান করতাম, যেই নির্দেশ রাসূল দিয়েছেন। যখন ইসলামই সামাজিকতা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তখন অন্যের কাছ থেকে সামাজিকতা ধার করার আর কি প্রয়োজন বাকি থাকে? একজন আত্মমর্যাদা সুস্থরুচিসম্পন্ন বিবেকবান মুসলমানের চাহিদা তো এই হওয়া দরকার যে, ইসলামী সামাজিকতা যদি অসম্পূর্ণও হতো, তাহলেও তো অন্যের সামাজিকতা ধার করার পিছে না পড়া। জনৈক কবি বলেন-

کہن خرقہ خویش پیراستن * بہ از جامہ عاریت خواستن

অর্থঃ নিজের পুরনো কম্বল অন্যের দামি চাদর থেকে বেশি মূল্যবান। এটা কখনোই উচিত নয় যে তোমার পুরনো জামাটি রেখে অন্যের ভালো জামা ধার নিবে।[৩৯৪]

ইসলাম ও অনৈসলামিক সামাজিকতার পার্থক্য

পোশাক-পরিচ্ছেদের মাঝেও মুসলমান বিজাতিদের সামাজিকতা অবলম্বন করছে। অথচ পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও ইসলাম মুসলমানদেরকে যে সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে অনৈসলামিক সামাজিকতায় তা অনুপুস্থিত। একথা সর্বজনবিধিত যে, পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলাম যেগুলোর নির্দেশ প্রদান করে, সেগুলোর তালিকা দীর্ঘ। পক্ষান্তরে যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করে সেগুলোর তালিকা ছোট।

আর বিজাতিদের সামাজিকতায় পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে যেগুলোর নির্দেশ প্রদান করে, সেগুলোর তালিকা ছোট পক্ষান্তরে, যেগুলোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেগুলোর তালিকা দীর্ঘ। বড় আফসোসের কথা যে, তারা দিবা-নিশি এ কথা বলে বেড়ায় যে, ইসলামে সামাজিকতায় সংকীর্ণতা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা তার

[৩৯৪]। ইসলাহুল মুসলিনীন পৃ. ৬৭-৬৮

বিপরীত। বাস্তব ক্ষেত্রে তারা এমন সামাজিকতার উপর আমল করে থাকে, যার মাঝে সংকীর্ণতা বিদ্যমান। কেননা যে বিষয়ের করণীয়/পালনীয়র তালিকা কম হয়, আর বর্জনীয়র বিষয়ের তালিকা দীর্ঘ হয়, তার মাঝে কখনোই সংকীর্ণতা বৈ প্রশস্ততা থাকতে পারে না।

তারা নিজেরা নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা প্রয়োজন, আর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজেরাই সে নিয়ম ভঙ্গ করেছে। এর দ্বারা এ কথাই বুঝে আসে যে, বাস্তবিকভাবে ব্যাপকতা বা প্রশস্ততা ইসলামী সামাজিকতায় রয়েছে, অনৈসলামিক সামাজিকতায় নয়। কেননা ইসলামী সামাজিকতায় নির্দেশিত বিষয়ের তালিকা বড়, আর যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তার তালিকা ছোট। আধুনিক সামাজিকতা এর বিপরীত, কেননা তাতে শুধু সংকীর্ণতায় রয়েছে; প্রশস্ততা নেই।

যারা আধুনিক সামাজিকতায় বিশ্বাসী তারা ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার খেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থাপনা না হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যারা ইসলামের সামাজিকতায় বিশ্বাসী আমাদের খাবারের জন্য চেয়ার টেবিলের অপেক্ষা করতে হয় না, প্রতিটি অবস্থাই আমাদের জন্য অনুকূল। চেয়ার টেবিলে বসেও খেলে সমস্যা হয় না, আবার বিছানা বিছিয়ে খেতেও সমস্যা হয় না। আমাদের জন্য কোনো একটির বাধ্যবাধকতা নেই।

একটু ভেবে দেখুন যে, কোনটার মাঝে স্বাধীনতা, আর ব্যাপকতা।

আল্লাহু আকবার! ঐ পোশাক জেলখানা ছাড়া আর কি হতে পারে, যে পোশাক পরিধানের পর অপরাধীর মতো চেয়ার-টেবিলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, স্বাভাবিকভাবে বসারও সৌভাগ্য হয় না।[৩৯৫]

সাদাসিধে জীবন যাপনেই বরকত

চলা-ফেরা, লেনদেন, আচার-আচরণ সামাজিকতার ক্ষেত্রেও যখন সাদামাঠা স্বাভাবিক হবে, তখন জীবন যাপন করা সহজ হয়ে যাবে। পাশাপাশি অনেক ঝুট ঝামেলা এবং কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর লৌকিকতা এবং অহংকারে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা রয়েছে ।[৩৯৬]

---

[৩৯৫] । ইসলাহুল মুসলিমীন ৭৩

[৩৯৬] । ইফাযাত পৃ.৯৯

সাধাসিধে চলাফেরায় একধরনের মধুরতা রয়েছে, এটা কেবল তারাই অনুভব করে যারা সাধাসিধে চলাফেরা করে অভ্যস্ত। সকলেরই মন চায় স্বাভাবিক ও সাধাসিধে চলাফেরা করতে। তবে অহংকার ও দাম্ভিকতার কারণে অনেকের জন্যই তা সম্ভব হয় না।[৩৯৭]

আচার-আচরণ পরিশুদ্ধ করা নামায রোযার ন্যায় ফরজ

মুআশরাত পরিশুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।[৩৯৮]

যেমনিভাবে শরীয়তের বিবি-বিধানের মাঝে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি ফরজ ঠিক তেমনিভাবে মু'আশরাত পরিশুদ্ধ করাও একটি ফরজ।[৩৯৯]

সামাজিকতা শিক্ষায় অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে

সামাজিকতা বা আদাবে মুআশারাতকে দ্বীনের অংশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সেটা যে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা কেউ মনেই করে না। অথচ হাজারো হাদীসের মাঝে রাসূল সা. উম্মতকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা আমরা কেউই এ ব্যাপারে ফিকির করি না, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ বিষয়ে দু-চার কলম লেখার তাওফীক দান করেছেন।[৪০০]

সামাজিকতা গ্রহণ না করার কারণ সুচিন্তাশীল না হওয়া

আদাবুল মুআশারাত তথা ইসলামী সামাজিকতা ও আচার-আচরণ প্রায় বিলুপ্তির পথে, অথচ এটা স্বভাবগত বিষয়। আর বাস্তবতা হলো যে, মানুষের স্বভাবের মাঝে যে মধ্যমপন্থা রয়েছে তা এখন তারা ধীরে ধীরে হারাতে বসেছে।[৪০১]

সামাজিক আচার-আচরণ গ্রহণ না করার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, সুচিন্তাশীল না হওয়া। যদি সুচিন্তার অধিকারী হতো তাহলে ইসলামের সামাজিকতা গ্রহণ করলে কি লাভ, আর ছেড়ে দেয়ার দ্বারা কি ক্ষতি, তা তাদের দৃষ্টিতে আসত এবং তা গ্রহণ করত। তবে এটা সংকীর্ণ মনোভাব থেকে সম্ভব নয়। প্রশস্ত হৃদয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝে আসবে। কেননা

---

[৩৯৭] । হুসনুল আজিজ খ. ১ পৃ. ৩৭১
[৩৯৮] । ইফাযাত খ. ৭ পৃ. ৬৭
[৩৯৯] । ইফাযাত খ. ৪ পৃ. ৫৭১
[৪০০] । ইফাযাত খ.৬ পৃ. ৩২৩
[৪০১] । হুসনুল আজিজ খ. ২ পৃ. ২৭৮-২৭৯

গভীরভাবে নিজের মস্তিস্ক নিবন্ধ করে চিন্তা করলে এপর্যায়ে আবশ্যকীয় বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করা সম্ভব হয়।[৪০২]

শরীয়তের সারমর্ম এবং সংশয়ের চিকিৎসা

শরীয়তের সারমর্ম তো এ যে, বান্দা কোনো অবস্থায় হতাশ হবে না, চাই আরাম-আয়েশে থাকুক অথবা চিন্তা-পেরেশানিতে থাকুক। কেননা শরীয়ত হতাশা দূর করার পদ্ধতি বলে দিয়েছে, আর আরাম-আয়েশের ব্যাপারে এমন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, যা গ্রহণ করার দ্বারা দিন দিন আরাম আয়েশ বৃদ্ধি পাবে বৈ কমবে না।[৪০৩]

যদি দ্বীনের সঠিক নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করা হয়, তাহলে তাতে কোনো প্রকার পেরেশানী বা সংশয় থাকে না। দ্বীন ও পেরেশানি দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, দ্বীন ও তার বিধি-বিধানের মাঝে পেরেশানি বা সংশয়ের কোনো অবকাশ-ই নেই, চাই ঐ দ্বীনি বিধি-বিধানগুলো বাহ্যিক হোক, অথবা আভ্যন্তরীণ হোক।[৪০৪]

সমাপ্ত

---

[৪০২] । ইফাযাত খ:৭ পৃ:৩৬৭

[৪০৩] । আলজাবরুস সবুর পৃ. ৩৬

[৪০৪] । আল ইফাযাত খ. ৫ পৃ. ৪৪৬